অপরাজিতা

শারদ সংকলন, অষ্টম সংখ্যা
১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ
Tejgaon Sanatan Samaj Unnayan Parishad

BBS
...excel your expectation

Bangladesh Building Systems PLC
(Pre-Engineered Steel Building Manufacturer)

ISO 9001 CERTIFIED · ISO 14001 CERTIFIED · ISO 45001 CERTIFIED

Pre-Engineered Steel Building Manufacturer

Looking forward to providing service for your next Steel building

Our Specialities

- Factories
- Warehouses
- Hall rooms
- Workshops
- Aircraft Hangers
- Office Buildings
- Showrooms
- Pharmaceutical Industry
- Distribution Centers
- Supermarkets
- Restaurants
- Residential Buildings
- Filling Station
- Light Rooftop Sheds
- Textile Industry

We Provide

- After sales service
- Wide range of design & color
- Architectural support
- Trouble free construction
- Accurate Structure

We Provide

- Wide span
- Low cost
- High quality
- Expandability
- Relocatable
- Quick delivery
- Flexibility in design
- Low maintenance
- Long building life

Head Office:
Advanced Noorani Tower, (8th Floor), 01, Amtoli, Mohakhali C/A, Dhaka 1212
Tel: +88 02 222298917, 222288916 **Fax:** +88 02 222260772 **Email:** info@bbspeb.com **Web:** www.bbspeb.com

Sales Office:
Configure Bepari Tower (3rd Floor), Ga-64, Middle Badda, Progati Swarani, Dhaka 1212
Tel: +88 02 222294771, 222295915, **Fax:** +88 02 222260772 **E-mail:** info@bbspeb.com **Web:** www.bbspeb.com

Chittagong Office:
Kader Tower (4th Floor), 128 Jubilee Road, Chittagong, **Tel:** +88 031 2864648

Factory: Jaina Bazar, Telehate, Sreepur, Gazipur, Bangladesh.

www.bbspeb.com

অপরাজিতা

শারদ সংকলন, অষ্টম সংখ্যা, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ
Tejgaon Sanatan Samaj Unnaayan Parishad

শারদীয় দুর্গাপূজা
২০২৪

সম্পাদক
ড. নিখিল চন্দ্র সরকার

সম্পাদনা পর্ষদ
প্রকাশ আদিত্য
অসীম কুমার দাশ
কেশব সেন
প্রদীপ কুমার সাহা

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
প্রদীপ কুমার সাহা, সভাপতি
সুখলাল নন্দী, সাধারণ সম্পাদক
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ

সার্বিক সহযোগিতায়
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও ডিজাইন
প্রদীপ কুমার সাহা

প্রকাশনায়
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ
তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

মুদ্রণে
শব্দকলি প্রিন্টার্স
৭০, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা-১০০০
Mob: 01715-596421, E-mail: shabdakoli70@gmail.com

অপরাজিতা

শারদ সংকলন ♦ অষ্টম সংখ্যা ♦ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

সূচিপত্র

শুভেচ্ছা বাণী ৪-১৭
সম্পাদকীয় ১৮
জয় মা দুর্গা দুর্গতি নাশিনী ১৯
শারদীয়া দুর্গাপূজা : সর্বজনীন উৎসব ২০
মহাভারতেও ছিলেন দেবী দুর্গা ২৭
দেবী দুর্গার আগমনী বার্তা ২৮
শারদীয়া দুর্গাপূজা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চিরন্তন উৎসব ৩০
শ্রী শ্রী দুর্গাপূজা ৩২
দশভুজা দেবী দুর্গা ৩৪
শ্রী শ্রী দুর্গা ৩৬
সনাতনীদের প্রতিমা পূজা : স্বমীজীর ব্যাখ্যা ৩৭
সনাতন ধর্ম এবং নারীর অধিকার ৩৯
জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা ৪৩
৪৯ শ্রী শ্রী রামঠাকুরের পত্রাবলী
৫১ দেবী সন্তোষী মাতা
৫৩ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ
৬১ হিন্দুদের তেত্রিশ কোটি দেবতা ও দেবদেবীর তালিকা
৬৭ জ্যোতির্ময়ী আলোয় শুদ্ধ
৬৭ শুভাগত ভালো আছে
৬৮ সৃষ্টি
৬৮ নারী শক্তি
৬৯ মঙ্গল চিহ্ন তথা শিব লিঙ্গম
৭৩ রাখীবন্ধন
৭৫ মানুষ, মানবতা ও অধিকার
৭৮ জাতীয় পতাকার রূপকার : শিব নারায়ণ দাশ
৮১ Hinduism in Bangladesh

রাষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

২৮ আশ্বিন ১৪৩১
১৩ অক্টোবর ২০২৪

বাণী

শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে আমি হিন্দু ধর্মাবলম্বী সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। সারা দেশে যথাযথ উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদির মধ্য দিয়ে দুর্গাপূজা উদযাপন আমাদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটি অনন্য উদাহরণ।

হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজার সাথে মিশে আছে চিরায়ত বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। এ দেশের হিন্দু সম্প্রদায় আবহমানকাল ধরে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও উৎসবমুখর পরিবেশে নানান আয়োজনের মাধ্যমে দুর্গাপূজা উদযাপন করে আসছে। দুর্গাপূজা ধর্মীয় উৎসবের পাশাপাশি সামাজিক উৎসবও। দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে সমাজের সকল স্তরের মানুষ একত্রিত হন, মিলিত হন আনন্দ-উৎসবে। সকলের সম্মিলিত অংশগ্রহণ এ উৎসবকে সর্বজনীন রূপ দিয়েছে। ধর্মীয় উৎসবের পাশাপাশি দুর্গাপূজা দেশের জনগণের মাঝে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও ঐক্য সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। শারদীয় দুর্গোৎসব সত্য-সুন্দরের আলোকে ভাস্বর হয়ে উঠুক; ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দের বন্ধন আরো সুসংহত হোক-এ কামনা করি।

শান্তি ও মানবতা সকল ধর্মের শাশ্বত বাণী। ধর্ম মানুষকে ন্যায় ও কল্যাণের পথে আহ্বান করে, অন্যায় ও অসত্য থেকে দূরে রাখে, দেখায় মুক্তির পথ। তাই ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার পাশাপাশি আমাদেরকে মানবতার কল্যাণে এগিয়ে আসতে হবে। সম্প্রতি ভয়াবহ বন্যায় দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের বেশ কয়েকটি জেলায় জান-মাল, অবকাঠামো, কৃষি ও প্রাণিসম্পদসহ সার্বিক জীবনযাত্রা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বানভাসী মানুষের সহায়তায় সরকারের পাশাপাশি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ মানব কল্যাণের জয়গানকে তুলে ধরেছে। জীবনধারণের জন্য নিরাপদ আশ্রয়, খাদ্য, ওষুধ ও নিরাপদ পানির পাশাপাশি বন্যার্তদের পুনর্বাসন ও দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আমি সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বাঙালির চিরকালীন ঐতিহ্য। সম্মিলিতভাবে এ ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিতে আমাদের আরো বেশি উদ্যোগী হতে হবে। আবহমান বাঙালি সংস্কৃতিতে ঋদ্ধ অসাম্প্রদায়িক চেতনা, পারস্পরিক ঐক্য, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি একটি সুন্দর আগামী ও আধুনিক বাংলাদেশ গঠনে কার্যকর অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। বিশ্বে মানুষ ও মানবতার জয় হোক-এ প্রত্যাশা করি।

শারদীয় দুর্গোৎসব সফল হোক।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

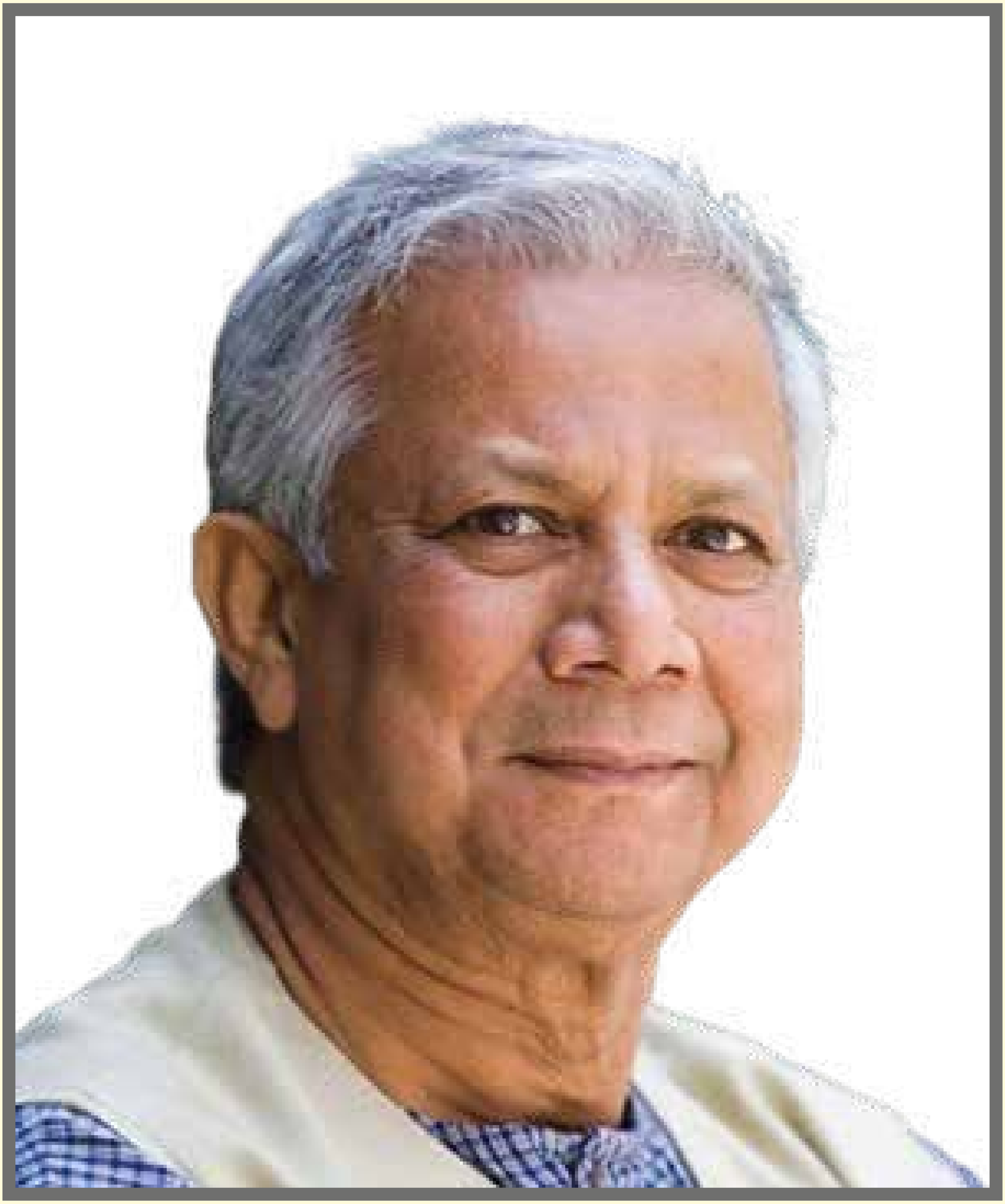

প্রধান উপদেষ্টা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৪ আশ্বিন ১৪৩১
৯ অক্টোবর ২০২৪

বাণী

হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা উপলক্ষে আমি দেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বী সকল নাগরিককে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

দুর্গাপূজা শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের উৎসবই নয়, এটি এখন সার্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। অশুভ শক্তির বিনাশ এবং সত্য ও সুন্দরের আরাধনা শারদীয় দূর্গোৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। আমাদের সংবিধানে সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষের সমান অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে। এই দেশ আমাদের সকলের। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এদেশ সকল মানুষের নিরাপদ আবাসভূমি। গত ৫ আগস্ট ছাত্র-শ্রমিক-জনতার অভূতপূর্ব অভ্যুত্থানের মাধ্যমে গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকলের ভাগ্য উন্নয়ন এবং সমান অধিকার সুনিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছে।

বৈষম্যবিরোধী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন অটুট রেখে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ে তোলার আহ্বান জানাই।

আমি বাংলাদেশের সকল নাগরিকের শান্তি, কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করি।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

উপদেষ্টা
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শ্রী শ্রী শারদীয় দুর্গাপূজা বাংলাদেশে যুগ যুগ ধরে পালিত হয়ে আসছে। দুর্গোৎসব মানুষে মানুষে সামাজিক বন্ধন সৃষ্টি করে, সৃষ্টি করে মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রীতিময় ও কল্যাণময় সম্পর্ক। দুর্গাপূজা সর্বস্তরের জনগণের মাঝে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও ঐক্য সৃষ্টি করে। এ উৎসবকে কেন্দ্র করে সবার মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বন্ধন আরো সুসংহত হউক, এ প্রত্যাশা করি।

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের অষ্টমবারের মত শ্রী শ্রী শারদীয় দুর্গাপূজার আয়োজন করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে "অপরাজিতা" শীর্ষক স্মরণিকাটি যাঁদের শ্রম ও প্রচেষ্ঠায় প্রকাশিত হতে যাচ্ছে তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। এ মহৎ উদ্যোগের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। হিন্দু সম্প্রদায়সহ বাংলাদেশের সকল নাগরিককে জানাই শারদীয় দুর্গাপূজার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার

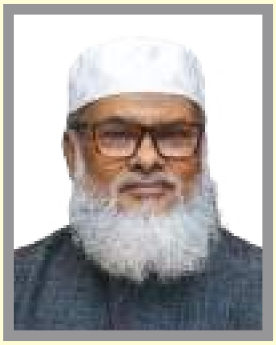

بسم الله الرحمن الرحيم

উপদেষ্টা
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শ্রী শ্রী শারদীয় দুর্গাপূজা-২০২৪ উপলক্ষ্যে তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ, ঢাকা কর্তৃক 'অপরাজিতা' শিরোনামে স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

শারদীয় দুর্গোৎসব হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। সনাতন ধর্মীয় রীতিনীতি ও আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে এই উৎসব উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। এই উৎসবকে ঘিরে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আনন্দমুখর পরিবেশ বিরাজ করে। তারা নতুন পোশাকে সজ্জিত হয়ে প্রফুল্ল মনে ধর্মীয় উপাচার ও অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। আবহমানকাল থেকে এদেশে বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ মিলেমিশে বসবাস করে আসছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহান সংবিধানে ধর্মচর্চার স্বাধীনতা সংযোজনের মধ্য দিয়ে সকল ধর্মের মানুষের সমঅধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আমি আশা করি, আগামী দিনগুলোতে এদেশের মানুষের মাঝে সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এবং আমরা সকলে মিলে একটি বৈষম্যহীন, উদার গণতান্ত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন রাষ্ট্র গড়ে তুলতে সক্ষম হব।

আমি 'অপরাজিতা' শারদ সংকলনের সাফল্য কামনা করি।

07.10.24
ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন

সচিব
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

বাণী

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ অষ্টমবারের মত "শ্রী শ্রী শারদীয় দুর্গাপূজা" আয়োজন করায় পরিষদের সকল নেতৃবৃন্দকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এ দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে "অপরাজিতা" শিরোনামে স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

শ্রী শ্রী শারদীয় দুর্গোপূজা বাঙালি হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। পুরাণ মতে, অসুরের অত্যাচারে দেবকুল যখন প্রকম্পিত, তখন সব দেবতারা নিজ নিজ অস্ত্র তুলে দিলেন মা দুর্গাকে। দেবতাদের প্রার্থনায় ও সম্মিলিত তেজে মা দুর্গা আবির্ভূত হয়ে মহিষাসুরকে বধ করে। দেবকুল হয় অসুর মুক্ত। জয় হয় দেবকুলের। দেবী দুর্গা দুর্গতিনাশিনী। দেবী দুর্গা মানবজাতির সকল অন্যায়, অত্যাচার ও অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করার জন্য মনুষ্যকুলে আবির্ভূত হয়ে থাকেন। প্রতি বছর শরৎকালে আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে দেবী দুর্গার পূজা-অর্চনা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশে যুগের পর যুগ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকজন আনন্দঘন ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করে আসছে। সারা বিশ্বের কাছে বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মের লোকজন নিজ নিজ ধর্মীয় উৎসব স্বাধীনভাবে উদ্‌যাপন করে আসছে।

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আজ মহিষাসুর নামক দানবদের বিচরণ বিদ্যমান। তাই মা দুর্গার কাছে আরাধনা, এ অশুভ শক্তির বিনাশ করে মঙ্গল বয়ে আসুক। আরো প্রার্থনা দেশ, বিশ্ব, সমাজ থেকে ধর্মান্ধতা ও বর্বরতা দূর হোক। মানুষের মন থেকে দূর হোক লোভ, লালসা ও প্রতিহিংসা।

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে হিন্দু ধর্মাবলম্বীসহ সকলের শান্তি ও কল্যাণ কামনা করি।

সবাইকে শারদ শুভেচ্ছা।

ড. কৃষ্ণেন্দু কুমার পাল

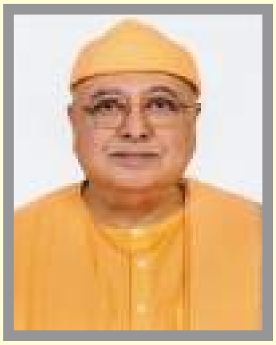

অধ্যক্ষ ও সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪

আশীর্বাণী

'তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ' শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে স্মরণিকা 'অপরাজিতা'র অষ্টম সংখ্যা প্রকাশ করবে জেনে আমরা আনন্দিত হয়েছি।

সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ ঈশ্বর। এক অনন্ত সত্তা। জীবন মুক্তির স্বাদ আস্বাদনের উদ্দেশ্যে নিজেকে বহুধা বিভক্ত করছেন। নিজেকে বন্ধনে আবদ্ধ করলেন। সৃষ্টি হলো তাঁর বহু নাম, রূপ ও ক্রিয়া। সেসকল নাম, রূপ এবং ক্রিয়ায় নিজেকে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়ালেন। শুরু হলো লীলাতীর্থের জগৎলীলা। এবার সেই লীলা তিনি যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণরূপে করে দেখালেন। তিনি সাধারণের সুবিধার জন্য গুরু ও শাস্ত্রের আশ্রয় নিয়ে কীভাবে আমরা অন্তর্নিহিত দেবত্ব উপলব্ধি করতে পারি তা নিজে করে দেখালেন। স্বামী বিবেকানন্দ সেজন্য বলেছিলেন : "আমরা মানুষ নই, স্বরূপত আমরা ঈশ্বর, শুধু মনুষ্য-অভিজ্ঞতা অর্জন করছি মাত্র।" বস্তুত জীববুদ্ধি নাশ করে অনন্তস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করাই সকল শাস্ত্র, গুরু এবং উপাসনার মূল উদ্দেশ্য। শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার তাৎপর্যও সেখানে নিহিত।

আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজায় শক্তিদায়িনী জগজ্জননী মায়ের নিকট আন্তরিক প্রার্থনা জানাই, তিনি যেন জগতের সকলের দুঃখ দূর করেন এবং আমাদের অন্তরে অনন্ত শক্তি ও সাহস প্রদান করেন।

স্মরণিকা প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত সকলকে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

সতত শুভানুধ্যায়ী,

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ
অধ্যক্ষ ও সম্পাদক

সভাপতি
বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ
কেন্দ্রীয় কমিটি

শারদ শুভেচ্ছা

দুর্গাপূজা বাংলার হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব। হিন্দুদের বারো মাসে তেরো পার্বন, কিন্তু শারদীয় দুর্গাপূজা এমন এক ধর্মীয় আয়োজন যাতে সমাজের প্রতিটি মানুষ সম্পৃক্ত হন। ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটে এই উৎসবে। দুর্গতিনাশিনী, অসুরদলনী দুর্গা মর্ত্যে আসেন। এ এক পরিপূর্ণ পারিবারিক চিত্র। দেবতাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যে দেবী অসুরবধ করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁকেই আমরা পরিবারের মেয়ের পিতৃগৃহে আসার আনন্দের চিত্রে সাজাই। ষষ্ঠী থেকে নবমীতে উৎসবশেষে দশমীতে যখন বিদায় নেন, তার আগে আবেগের চিত্র অত্যন্ত মধুর বেদনাদায়ক। প্রতিমার মুখে পান গুঁজে দেওয়া, সিঁদুরে রাঙানো এবং বারবার প্রতিমার কাঠামোর কাছে আনা আর দূরে নিয়ে যাওয়া যেন এই বার্তাটিই ঘোষণা করে, মেয়ে ফিরে যাচ্ছে কিন্তু মা-বাবা, পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কাছে কত কী বলার আছে! আমরা বাড়ির মেয়ে ফিরে যাওয়ার সময় বলি, আবার এসো মা। ও হ্যাঁ ওই কথাটি তো বলা হয়নি। মেয়ে আবার কাছে আসে। দশমীর চিত্রটিও তা-ই। পারিবারিক পূজার বাইরে মণ্ডপে মণ্ডপে সার্বজনীন পূজায় একই চিত্র। একই আবেগ। এখানে বাঙালিয়ানাই প্রধান হয়ে ওঠে। আমরা মায়ের আগমনীকে পারিবারিক ও সামাজিক আবহে বাঁধতে চাই। এখানেই দুর্গাপূজা সমাজঘনিষ্ঠ উৎসব। আঙ্গিক ধর্মীয়, কিন্তু উৎসব সামাজিক, সর্বজনীন।

বাংলার প্রকৃতির সঙ্গে শারদীয় দুর্গাপূজার চমৎকার মিল রয়েছে। মনে হয় শরৎকালেই এই পুজো মানায়। দুর্গাপূজা বসন্তেও হয়, যা বাসন্তী পূজা নামে পরিচিত। কিন্তু বাঙালি সমাজে বাসন্তী পূজা অতোটা জনভিত্তি পায়নি। বর্ষাস্নাত প্রকৃতিতে নবজাগরণ, শরৎকালে মাঠে মাঠে ফসলের ঘ্রাণ, শীতের মৃদু পদধ্বনি যেন শারদোৎসবকে বরণ করার জন্যেই উন্মুখ হয়ে থাকে। সে কারণে শারদীয় দুর্গাপূজা বাঙালি সমাজ ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছে। তবে ভাগবত-পুরাণ অনুসারে, বাসন্তীপূজাই প্রকৃত দেবী পূজা। এই পূজায় বোধন নেই। কারণ দেবী জাগ্রত থাকেন। কিন্তু রামচন্দ্র শরৎকালে দেবীর অকাল বোধন করে পূজা করেন রাবন বধের জন্য। শ্রীশ্রীচণ্ডীর মতে শরৎকালেই রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি দেবী পূজা করেন। দেবী ভাগবতের মতে শরৎকালেই দুর্গাপূজার উৎপত্তি। কথিত আছে, রামচন্দ্র ১০৮ পদ্ম দ্বারা দেবীপূজার সংকল্প করেন। এই কাহিনিতে বলা হয়েছে, আবশ্যকীয় সংখ্যক পদ্ম সংগৃহীত হয়। কিন্তু দেবী ভক্তের ভক্তি পরীক্ষার জন্য ছলনা করে একটি পদ্ম লুকিয়ে রাখেন। পূজার সময় একটি পদ্মের অভাব হওয়ায় রামচন্দ্র বিপদে পড়েন। পূজা পূর্ণাঙ্গ না হলে দেবী সন্তুষ্ট হবেন না, সংকল্পও সিদ্ধ হবে না। রাম পদ্মলোচন নামে খ্যাত। সেজন্যে তিনি নিজের একটি চোখ উৎপাটন করে পদ্মরূপে মায়ের চরণে অঞ্জলি দেওয়ার সংকল্প করেন। তিনি ধনুর্বান নিয়ে চোখ উৎপাটনের উপক্রম করতেই দেবী আবির্ভূত হয়ে তাঁকে বর প্রদান করেন।

বাংলাদেশে নতুন পরিবর্তনে এবং এই ঐতিহ্যবাহী শারদোৎসবে এবার আসুরিক শক্তি হিংস্র থাবা বসাচ্ছে। অস্তিত্ব বিনাশে উদ্যত হয়েছে। যে আসুরিক শক্তি দলনে দুর্গতিনাশিনী দুর্গা আবির্ভূত হন তাঁরই আরাধনার মধ্য দিয়ে আমরা শুভ শক্তির অভিষেক কামনা করি। দুর্গতি, বৈষম্য ও ধ্বংসের শক্তি নিশ্চয়ই পরাভূত হবে, কারণ আমরা এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে এক হয়ে লড়াই করছি। আমরা সরকার, রাজনৈতিক দল ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র সমাজকে পাশে পেয়েছি, আলোর পথে এই ঐক্যের বিকল্প নেই। দেবী আরাধনা নিশ্চয়ই আমাদের শক্তি যোগাবে।

সমতা, শান্তি ও সম্প্রীতির চেতনা বিকশিত হোক, মাতৃ আরাধনায় এই হোক আমাদের প্রার্থনা।

(স্বা:)

বাসুদেব ধর

সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ
কেন্দ্রীয় কমিটি

সাধারণ সম্পাদকের শুভেচ্ছা

শারদীয় দুর্গোৎসব সনাতন ধর্মীয় বাঙালির উৎসব হলেও আজ এটা সর্বজনীন ধারায় এক নতুন মাত্রা লাভ করেছে।

এ উৎসবের মাধ্যমে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে চেতনাকে সমৃদ্ধ করেছে। চিরায়ত দেবী বন্দনার প্রেক্ষাপট হলো অন্তরের অসুরীয় শক্তির বিনাশ। এই চেতনাকে ধারণ করে বাঙালি তার ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

অসুরের আস্ফালনে দেবকুল যখন প্রকম্পিত, দেবতারা যার যার অস্ত্র তুলে দেন মা দুর্গাকে। মা দুর্গা হলেন দশভুজা। এই দশভুজা দুর্গার হাতে বধ হলো অসুর, জয় হলো দেবকুলের। অশুভ শক্তি পরাজিত হলো। কালের বিবর্তনে সময়ের পরিবর্তনে তার রূপ এখন ভিন্নতর। কোনো অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে দেবকুলের মতো মানুষকে একত্রিত হয়ে অপতৎপরতাকে বিনাশ করতে হবে।

মানুষে মানুষে সামাজিক সম্পর্ক, ধর্মের ঊর্ধ্বে ভ্রাতৃত্ববোধ, কল্যাণ চিন্তা, অধিকারবোধের চেতনাকে বিকশিত করা এখনও মানুষের মধ্যে প্রবল। তথাপি কখনো কখানো অসুরীয় শক্তির উত্থান বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আতংকগ্রস্ত করে তোলে; ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। পবিত্র ধর্মকে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করে সাধারণ মানুষকে সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যে নিক্ষিপ্ত করে। আবারও এই দেশে সাম্প্রদায়িক ও ধর্মান্ধতার অসুররা বুঝি ঐক্যবদ্ধ হবার চেষ্টা করছে। এই ধর্মান্ধ কায়েমি স্বার্থবাদীগোষ্ঠীকে যেকোনো মূল্যে রুখে দিতে হবে, প্রতিহত করতে হবে।

ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ দেখতে চাই।

সবধর্মের মূল বাণী মানবকল্যাণ। আবহমান বাংলার ঐহিত্য ও সংস্কৃতি, ধর্মের মূল বাণী আমাদের সত্য সুন্দরের পথ দেখাক। প্রত্যেক পুজো সত্যসুন্দরের আলোতে আলোকময় হয়ে উঠুক। সকল বৈষম্য বঞ্চনার অবসান ঘটুক। গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার জয় হোক। বিশ্বমানবতার জয় হোক।

সবাইকে শারদ শুভেচ্ছা।

সন্তোষ শর্মা

সভাপতি
মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি

সভাপতির শুভেচ্ছা

এক ক্রান্তিকালে নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে মাতৃবন্দনায় আজ আমরা শামিল হয়েছি।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যে বিজয় আমরা ছিনিয়ে এনেছিলাম, সেই বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক চেতনা আমাদের মধ্যে আবার ধ্বনিত হোক। আমাদের প্রশ্ন একটাই– বারবার কেন আমাদের মধ্যে হতাশার করুণ রাগিণী বাজবে। ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ধারা কেন বারবার রুদ্ধ করার চেষ্টা হবে? আবারও বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতার অসুররা ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে, অন্ধকার গাঢ় করার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। এই অবস্থা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাম্য হতে পারে না। অন্ধকারের এই অপশক্তি চিরতরে নিশ্চিহ্ন করতে হবে। একটি মহল পবিত্র ধর্মকে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করে মানুষকে এক গভীর সংকটের অনিশ্চিত অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত করতে চাইছে। এই অবস্থার জন্য দায়ী গোড়া রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা, অতীতমুখিন রাজনীতি। এখন যুক্তি ও প্রযুক্তির যুগ। আমরা সবাই অসাম্প্রদায়িক ও আলোকিত ঐতিহ্যের অংশীদার। এই ঐতিহ্য আমাদের মনে আলোরবর্তিকা হয়ে কাজ করবে।

শারদীয় দুর্গোৎসব শুধু একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্মচর্চার অংশ নয়; বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মূল চেতনাকে ধারণ করেই এ উৎসবের বিকাশ। 'ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার'। সার্বজনীনতা এই উৎসবের প্রাণ। হাজার বছরের ঐক্যবোধ এই উৎসবের শক্তি। সমাজের প্রত্যেক মানুষই পুজোর অংশ। আমরা দেবীর আরাধনার মধ্যদিয়ে অসুর শক্তির বিনাশ চাই; অসুন্দর ও অসত্যের ধ্বংস চাই। আত্মশক্তির উদ্বোধন চাই।

সম্প্রতি এক ধর্মান্ধ শক্তি বিভিন্ন অজুহাতের ধুয়ো তুলে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, নির্যাতন, হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। পবিত্র মন্দিরে ঢুকে লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও ধ্বংস করেছে। এই হামলার উদ্দেশ্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি করা। আতঙ্ক তৈরি করা। সংখ্যালঘুদের জায়গা জমি সম্পদ দখল করা। এই অশুভ শক্তি সামনে আরও ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। ক্ষমতাসীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও দেশপ্রেমিক নাগরিকদের এ ব্যাপারে আরো বেশি সজাগ থাকতে হবে।

আমরা আশা করি, আগামীতে আমাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। সকল বৈষম্য, বঞ্চনার পরিসমাপ্তি ঘটবে। শারদীয় দুর্গোৎসব সবার জীবনে কল্যাণ বয়ে আনুক। ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক চেতনার বিজয় ঘোষিত হোক।

সবাইকে শারদ শুভেচ্ছা।

জয়ন্ত কুমার দেব

সাধারণ সম্পাদক
মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি

সাধারণ সম্পাদকের নিবেদন

প্রকৃতির সঙ্গে প্রাণের সেতুবন্ধন গড়ে উঠুক–এই আকাঙ্ক্ষা ও আশাবাদ আবহমান বাঙালির। বাঙালি সংস্কৃতিরও। কৃষিকেন্দ্রিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্নতা দূরীকরণ, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আত্মার সংযোগ স্থাপন এবং সকল অশুভ রাহুগ্রাস থেকে মুক্তিলাভ–বাঙালি সনাতনধর্মী যাবতীয় পূজাপার্বণের মুখ্য উদ্দেশ্য।

কেবলমাত্র উৎসবের পথ ধরে এ পুজো উদযাপিত হয় না। প্রতিদিন মানুষ জীবনবিকাশের জন্য প্রতিজ্ঞা করবে; স্বাধীনতা, মুক্ত ও বৈষম্যহীন ইতিবাচক চিন্তা, মানবিকতা, গণতন্ত্রের রক্তসূর্যকে নবীনভোরে প্রণাম জানাবে। শুধু বাংলাদেশ নয়, পৃথিবীর সকল প্রান্তের, সকল অঞ্চলের দুশ্চিন্তাহীন মানুষেরা উর্বর মাটি ও মানুষের সঙ্গীত গাইবে। তাদের ভেতরকার পুরনো শুদ্ধ ও নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সারাবিশ্বের বিষ-অন্ধকার তাড়িয়ে দেবে।

বাঙালির সব পুজোপার্বণ অসাম্প্রদায়িক চেতনায় পরিপূর্ণ। এ উৎসবে ফসল উৎপাদনের যোগসূত্র রয়েছে। এখানে উর্বরতার কামনা আছে। শস্য-শ্যামলা ফসলের প্রার্থনা আছে। তারা আছে উৎকৃষ্ট উৎপাদনে, শ্রম ও ঘামে; তাদের কাছে পূজোপার্বণ সারাবিশ্বের সংস্কৃতির ধারাকে বহন করে। সংকটে, সংঘর্ষে, মানবিক বিপর্যয়ে মানুষের কান্না তারা শুনতে পায়। সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেয়। আজ এই সময়ে সারা পৃথিবীতে যখন কর্তৃত্ববাদ, 'ফ্যাসিজম' নামে এক নতুন শাসন ব্যবস্থা চালু করার আয়োজন চলছে, তখন বিশ্ব-ব্যবস্থাপনা নিয়ে নতুন চিন্তাভাবনার প্রয়োজন আছে বৈকি! গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে, সমগ্র সমাজ ও রাষ্ট্রে পচন শুরু হয়েছে। একমাত্র 'মানবতাবাদ'ই পারে সবধরনের সমস্যা উত্তরণে সঠিক ভূমিকা রাখতে।

সব অশুভ শক্তিকে রুখে দিয়ে এক বৈষম্যবিরোধী কল্যাণ সমাজ ও রাষ্ট্র আমরা বিনির্মাণ করতে চাই।

নিজের কালের জ্ঞান ও অনুভবের সঙ্গে মিলিয়ে শাশ্বত সুন্দরকে প্রতিষ্ঠার জন্য সঠিক সত্যকে আবিষ্কার করে নিতে চাই। এই চাওয়া ও পাওয়ার সঙ্গে মেলবন্ধ ঘটাতে আমরা পূজার মাধ্যমে বিভিন্ন দেবদেবীর আবাহন করি। তাঁদের কাছে শক্তি চাই, শান্তি চাই। এ শক্তি ধ্বংসাত্মক নয়, সৃষ্টিশীল; নব-নব অভিযোজনার।

শারদপ্রাতের এ শুভ মুহূর্তে বিশ্বের সকল মানুষের জীবনে শান্তি, সমৃদ্ধি বয়ে আসুক, পৃথিবী বাসযোগ্য বয়ে উঠুক। দূর হোক ক্লান্তি, সব অন্ধকার, অশুভ চেতনা ভেঙেচুরে নির্মূল হোক, নির্মল হোক।

ড. তাপস চন্দ্র পাল

সভাপতি
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

শুভেচ্ছা

আসছে প্রকৃতির সেই শরৎকাল। এ শরতেই শুরু শারদীয় দুর্গাপূজা। শারদীয় দুর্গোৎসব বাঙালি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি আনন্দঘন ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে উদ্‌যাপন মাধ্যমে বাংলাদেশকে করেছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বাংলাদেশ একটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। এ দেশে সকল সম্প্রদায়ের লোকজন আবহমানকাল থেকে মিলেমিশে মনোরম পরিবেশে বসবাস করে আসছে। প্রতিটি ধর্মের মূলবাণী হচ্ছে সৃষ্টির কল্যাণ সাধন করা। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সুখ-শান্তি কামনায় এবং সকল জীবের মঙ্গলার্থে বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায় বিপুল উৎসাহ, উদ্দীপনায় ও উৎসবমুখর পরিবেশে পালন করে থাকে শারদীয় দুর্গোৎসব। সকল প্রকার হীনতা, সংকীর্ণতা ও ধর্মান্ধতার উর্ধ্বে উঠে সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে "ধর্ম যার যার, উৎসব সবার" এ চেতনাকে ধারণ করে সর্বস্তরের জনগণ দুর্গোৎসব পালন করে থাকে।

দুর্গতিনাশিনী মা দুর্গার কাছে প্রার্থনা, এ অদৃশ্য অশুভ শক্তির বিনাশ করে দেশ ও পৃথিবীর মঙ্গল বয়ে আনুন। মা দুর্গার কাছে আরো প্রার্থনা দেশ, বিশ্ব, সমাজ থেকে ধর্মান্ধতা ও বর্বরতা দূর হোক। মানুষের মন থেকে দূর হোক লালসা, লোভ আর হিংসা। দেশ ও জাতির সংহতি ও উন্নয়নের প্রতীক দুর্গাপূজার কাঠামোতে পরিলক্ষিত হয়। গণেশ সাফল্যের প্রতীক, কার্তিক বীরত্বের, লক্ষ্মী ধন-সম্পদের এবং সরস্বতী জ্ঞানের। আর দুর্গার দশটি হাতে দশটি প্রহরণ (অস্ত্র) অপরিমেয় বলবীর্যের প্রতীক। সিংহ বশ্যতার প্রতীক এবং মহিষাসুর সমস্ত অসুরের প্রতীক হিসেবে দুর্গাপূজার কাঠামোতে বিদ্যমান। একটি জাতি সকল অশুভ শক্তিকে পদদলিত করে পরিপূর্ণতা লাভ করে। দেবী দুর্গার পূজা-অর্চনাকে কেন্দ্র করে আমাদের মনেও এই ধারণাই জাগরিত হয়।

ঢাকার তেজগাঁও এলাকায় কয়েক হাজার সনাতন ধর্মের লোকজন বসবাস করেন। এ এলাকায় নিয়মিতভাবে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করার জন্য কোন স্থায়ী মন্দির ছিল না। অত্র এলাকায় বসবাসরত সনাতন ধর্মের লোকজন নিয়মিতভাবে পূজা-পার্বন পালন করতে পারছিলেন না। এ বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে অত্র এলাকার ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলের সার্বিক সহযোগিতায় একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা লাভ করে 'তেজগাঁও সর্বজনীন পূজা মন্দির'। স্থায়ীভাবে নির্মিত মন্দিরে নিয়মিতভাবে পূজা-অর্চনার কাজ পরিচালিত হচ্ছে। এ মন্দিরে প্রতিদিন শ্রীশ্রী দুর্গা মায়ের পূজা-অর্চনাসহ প্রতি শুক্রবার সকালে গীতাপাঠ, প্রতি শনিবার শনিপূজা, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ও লোকনাথ বাবার জন্মতিথিসহ অপরাপর পূজা-পার্বন যথাযোগ্য মর্যাদায় উৎসবমূখর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে।

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ বিগত সাত বছরের ন্যায় এ বছরও 'তেজগাঁও সর্বজনীন পূজা মন্দির'-এ শারদীয় দুর্গাপূজা উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে। এ পূজায় সার্বিক সহযোগিতার জন্য প্রশাসন, স্থানীয় সকল নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের সম্মানিত উপদেষ্টামণ্ডলী, কার্যকরী পরিষদ ও সকল সদস্য ও ভক্তবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরলস প্রচেষ্টায় শারদীয় দুর্গাপূজা উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে বলে আমি তাঁদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে "অপরাজিতা" শীর্ষক শিরোনামে স্মরণিকা। এ স্মরণিকা প্রকাশে গঠিত 'সংকলন পর্ষদের' সম্পাদকসহ সকল সদস্য রাত-দিন নিরলস সফল প্রচেষ্টার ফলে স্মরণিকাটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। আমি তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। সর্বোপরি পূজানুষ্ঠানে যাঁরা মূল্যবান উপদেশ ও আর্থিকভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি রইলো গভীর কৃতজ্ঞতা। শারদীয় দুর্গাপূজা সফল হোক-এ কামনা করি।

সবাইকে শারদীয় শুভেচ্ছা।

প্রদীপ কুমার সাহা

সাধারণ সম্পাদক
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ

শুভেচ্ছা

মানবতাই ধর্মের শাশ্বত বাণী। ধর্ম মানুষকে ন্যায় ও কল্যাণের পথে আহ্বান করে, অন্যায় ও অসত্য থেকে দূরে রাখে, দেখায় মুক্তির পথ। তাই ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার পাশাপাশি আমাদেরকে মানবতার কল্যাণে এগিয়ে আসতে হবে। দুস্থ ও অসহায়দের পাশে দাঁড়াতে হবে। আবহমান বাঙালি সংস্কৃতিতে ঋদ্ধ অসাম্প্রদায়িক চেতনা, পারস্পরিক ঐক্য, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি গড়ে উঠুক, বিশ্ব মানবতার জয় হোক-এ প্রত্যাশা করি।

পুরাণ মতে, অসুরের অত্যাচারে দেবকুল যখন প্রকম্পিত, তখন সব দেবতারা নিজ নিজ অস্ত্র তুলে দিলেন মা দুর্গাকে। দেবতাদের প্রার্থনায় ও সম্মিলিত তেজে মা দুর্গা আবির্ভূত হয়ে মহিষাসুরকে বধ করে। দেবকুল হয় অসুর মুক্ত। জয় হয় দেবকুলের। দেবী দুর্গা দুর্গতিনাশিনী। দেবী দুর্গা মানবজাতির সকল অন্যায়, অত্যাচার ও অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করার জন্য মনুষ্যকুলে আবির্ভূত হয়ে থাকেন। প্রতি বছর শরৎকালে আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে দেবী দুর্গার পূজা-অর্চনা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আজ মহিষাসুর নামক দানবদের বিচরণ বিদ্যমান। তাই মা দুর্গার কাছে আরাধনা, এ অশুভ শক্তির বিনাশ করে মঙ্গল বয়ে আসুক। আরো প্রার্থনা দেশ, বিশ্ব, সমাজ থেকে ধর্মান্ধতা ও বর্বরতা দূর হোক। মানুষের মন থেকে দূর হোক লোভ, লালসা ও প্রতিহিংসা।

তেজগাঁও এলাকায় কোন মন্দির না থাকায় এলাকায় বসবাসরত সনাতন ধর্মের লোকজন নিয়মিতভাবে পূজা-অর্চনা করার জন্য একটি মন্দির প্রতিষ্ঠার দাবী বহুদিনের। এ দাবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এলাকার সকলের সার্বিক সহযোগিতায় বিকে আফতাব মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিকটে 'তেজগাঁও সর্বজনীন পূজা মন্দির' স্থাপিত হয়েছে। এ মন্দিরে প্রতিদিন শ্রী শ্রী দুর্গা মায়ের অর্চনাসহ অপরাপর পূজা-পার্বন পালিত হচ্ছে। মন্দির প্রতিষ্ঠার সহযোগিতার জন্য সকল স্তরের লোকজনের প্রতি রইলো আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ বিগত বছরের ন্যায় এ বছরও 'তেজগাঁও সর্বজনীন পূজা মন্দির'-এ শারদীয় দুর্গাপূজা উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে। এ পরিষদের সম্মানিত উপদেষ্টামণ্ডলী ও নির্বাহী পরিষদের সকল সদস্যসহ সাধারণ সদস্য এবং যুব পরিষদের সদস্যবৃন্দের নিরলস প্রচেষ্ঠায় শারদীয় দুর্গাপূজা উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে বলে আমি তাঁদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে অপরাজিতা শিরোনামে একটি স্মরণিকা। এ স্মরণিকা প্রকাশে গঠিত 'সংকলন পর্ষদের' সম্পাদকসহ সকল সদস্য আন্তরিকতার সাথে কাজ করার ফলে স্মরণিকাটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। দুর্গাপূজায় যাঁরা মূল্যবান উপদেশ, বিজ্ঞাপন ও অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি রইলো গভীর কৃতজ্ঞতা।

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে আমি হিন্দু ধর্মাবলম্বীসহ সকলের শান্তি, কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

সবাইকে শারদ শুভেচ্ছা।

সুখলাল নন্দী

সম্পাদক
অপরাজিতা সংকলন পর্ষদ
ও
উপদেষ্টা
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ

সম্পাদকীয়

শরতের স্নিগ্ধ ছোঁয়া, প্রকৃতির অভিনব রূপ, শরতের হিমেল হাওয়া, কাশবনের দোলা আর শিশির ভেজা ঘাসে থাকা শিউলি ফুলে পাওয়া যায়। প্রতিটি গাছে প্রকৃতির সবুজের সমারোহ। বিলে-ঝিলে লাল-সাদা শাপলা, নদীর কিনারের কাশবন পুরো প্রকৃতিকে সাজিয়ে তোলে আপন মহিমায়। প্রকৃতির এ সৌন্দর্য্যের মাঝেই শারদীয় দুর্গাপূজার আগমনী সুর বেজে ওঠে। বাঙালি জাতি উৎসবের আমেজ ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ফলে শারদীয় দুর্গাপূজা হয়ে উঠে দুর্গোৎসব। ফলে এ দেশে সকলের অংশগ্রহণে শারদীয় দুর্গোৎসব পালিত হয়ে থাকে। দুর্গাপূজা মানেই সর্বজনীন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পূজার শুরু থেকে বিসর্জন পর্যন্ত সকল আয়োজনে দুর্গোৎসবকে ঘিরে আনন্দঘন পরিবেশ এবং মিলন খুবই বিরল। এ পূজা বাঙালি জাতিকে অসহিষ্ণুতা, হিংসা, বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অশুভ প্রভাব থেকে মুক্ত করে মানুষের মধ্যে ঐক্য, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠা করে। ঐক্যবদ্ধ করে এক মায়াবী বন্ধনে জড়িয়ে রাখে সকল বাঙালিকে।

বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের শারদীয় দুর্গাপূজা একটি প্রধান পূজা ও উৎসব। চিরায়ত দেবী বন্দনার প্রেক্ষাপট হলো অন্তরের আসুরিক শক্তির বিনাশ। এই চেতনাকে ধারণ করে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে। দেবী দুর্গার আগমনী বার্তায় সকলের প্রাণে ধ্বনিত হচ্ছে মঙ্গলবার্তা। শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে হিন্দু ধর্মাবলম্বীসহ দেশের সকল নাগরিককে জানাই আমার অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা। বাংলাদেশে সকলের মুখে ধ্বনিত হচ্ছে একই উচ্চারণ "ধর্ম যার যার, উৎসব সবার"। স্বাধীনতার অপশক্তি যুগে যুগে এ দেশে ক্ষমতায় আরোহন, দখলদারিত্ব, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার ইত্যাদি কারণে সাম্প্রদায়িকভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েও বাংলাদেশের হিন্দুরা অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ধারার বিকাশে সচেষ্ঠ রয়েছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বাঙালির চিরকালীন ঐতিহ্য। সম্মিলিতভাবে এ ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিতে হবে আমাদের সামগ্রিক অগ্রযাত্রায়।

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ অষ্টমবারের মত শারদীয় দুর্গাপূজা উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে। এ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে স্মরণিকা 'অপরাজিতা'র শারদীয় সংকলনের অষ্টম সংখ্যা। এ সংকলনটি মূল্যবান বাণী,অতীতের স্মৃতিচারণ ও প্রথীতযশা লেখকের লেখা নিয়ে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। শারদীয় সংকলন প্রকাশ করা একটি দীর্ঘ সময়ের বিশাল কর্মযজ্ঞ। সম্পাদনার দায়িত্ব আমার হলেও সম্পাদনা পর্ষদ, তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের উপদেষ্টা পরিষদ এবং সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ কার্যকরী পরিষদের সদস্যবৃন্দের একান্ত সহযোগিতা ব্যতীত এ প্রকাশনাটি প্রকাশ করা কোনক্রমেই সম্ভব হতনা। তাঁদের সকলের প্রতি রইলো অশেষ কৃতজ্ঞতা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা এ শারদ সংকলনে মূল্যবান বাণী প্রদান করায় সংকলনের মান বিশেষভাবে গৌরবান্বিত করেছে। আমি তাঁদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। মাননীয় উপদেষ্টাবৃন্দ ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ বাণী প্রদান করে আমাদেরকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। যাঁরা লেখা দিয়ে স্মরণিকা প্রকাশের সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি রইলো আমার অসীম কৃতজ্ঞতা। যেসকল প্রতিষ্ঠান সংকলনে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন তাঁদের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। মুদ্রিত সকল লেখা, লেখকদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী এবং অনুভূতিতে লেখা, এখানে সম্পাদনা পর্ষদের কোন প্রভাব এবং দায়িত্ব নেই। এ শারদীয় সংকলনে দেবী দুর্গার বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক দিক নিয়ে গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতাসহ অন্যান্য ধর্মীয় তথ্যসমৃদ্ধ লেখা নিয়ে সহজতর ও নির্ভুল উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে পরিষদের মুখপাত্র হিসেবে স্মরণিকাটি প্রকাশের জন্য আপ্রাণ চেষ্ঠা করেছি। স্মরণিকা প্রকাশে অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য নিবেদন করছি।

সবাইকে শারদীয় শুভেচ্ছা।

ড. নিখিল চন্দ্র সরকার

জয় মা দুর্গা দুর্গতি নাশিনী

দুর্গাপূজা আজ সাবা বিশ্বেও সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে প্রাণময় এবং একই সঙ্গে ভক্তিভরে উদ্‌যাপিত উৎসব। শারদপ্রাতে এবারও শুভ্র কাঁশফুল আর শিউলি ফোটে তবে সৌরভহীন, নিস্পব, উৎফুল্লহীন।

বাংলাদেশসহ প্রায় অধিকাংশ বিশ্ব বড়ই অশান্ত আর নিরাপদহীন হয়ে পড়েছে। এ সময়ে তোমার মর্তে আগমন সাধারণ মানুষকে চিত্ত চাঞ্চল্য কও তুলতে পারছে না। সমস্ত আসুরিক শক্তির বিনাশ করো মা।

আমাদের সমাজে, রাষ্ট্রের বেশিরভাগ মানুষই ধার্মিক কিন্তু তারা সাম্প্রদায়িক নয়। আমাদের জীবনের সাথে মিশে যাওয়া এ পূজা এবারও যেন নিবিঘ্নে সম্পন্ন হয়।

অভূতপূর্ব জাগরণ আর উল্লাসে যাবতীয় অনাচার ভেসে যাবে বলে যে জনআকঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটেছে, তার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন চায় সাধারণ মানুষ।

সকলের মঙ্গল করো মা দুর্গা, শান্তির পরশ বুলিয়ে দাও এ ধরিত্রীর মাঝে।

শারদীয়া দুর্গাপূজা : সর্বজনীন উৎসব

ড. নিখিল চন্দ্র সরকার

হিন্দু শাস্ত্রমতে দেবী দুর্গা হলেন পরব্রহ্মা তিনিই শক্তির রূপ। তিনি দুর্গতনাশিনী বা সব দুঃখ-দুর্দশার বিনাশকারিণী। শাস্ত্রমতে দৈত, বিঘ্ন, রোগ, পাপ ও শত্রুর হাত থেকে যিনি রক্ষা করেন তিনিই দুর্গা। সারাবিশ্বে শুভ-অশুভ শক্তির যুদ্ধ চলছে প্রতিনিয়ত। মানুষ মহাযুদ্ধে জয়ী হতে পারলেই মহাশক্তি দুর্গার সন্ধান পায়। মা দুর্গার দশ হাতে দশ অস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত। দশ হাত দশ দিকে রক্ষা করার প্রতীক। মূলত তিনি এক পরমবিদ্যা স্বরূপণী, যিনি জগৎ মঙ্গলময়ী দুর্গা। দুর্গম অশুরের কাজ ছিল জীবকে দুর্গতিতে ফেলা। দুর্গমকে বধ করে যিনি স্বর্গ বিতাড়িত দেবগণকে নিজ রাজ্যে ফিরিয়ে দেন ও জীবজগৎকে দুর্গতির হাত থেকে রক্ষা করেন তিহি মা দুর্গা।

হিন্দু শাস্ত্রমতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এবং ইন্দ্রাদি সব দেবতাদের শরীর থেকে আগুনের মতো তেজরশ্মি একত্রিত হয়ে বিশাল এক আলোকপুঞ্জে পরিণত হয়। এই আলোকপুঞ্জ থেকে আবির্ভূত হন এক দেবীমূর্তি। শিবের তেজে মুখ, বিষ্ণুর তেজে বাহুসমূহ, যমের তেজে কেশপাশ, ইন্দ্রের তেজে শরীরের মধ্যভাগ, ব্রহ্মার তেজে পদযুগল, সূর্যের তেজে পদাঙ্গুলি, অগ্নির তেজে ত্রিনেত্র প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। দেবী দুর্গা একে একে অসুরকুলকে বিনাশ করে স্বর্গ তথা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

দুর্গা পৌরাণিক দেবতা। তিনি আদ্যশক্তি, মহামায়া, শিবানী, ভবানী, দশভুজা, সিংহবাহনা ইত্যাদি নামে অভিহিত হন বা দুর্গম নামক দৈত্যকে বধ করেন বলে তাঁর নাম হয় দুর্গা। জীবের দুর্গতি নাশ করেন বলেও তাঁকে দুর্গতনাশিনী বলা হয়। দেবতাদের শক্তিতে শক্তিময়ী এবং বিভিন্ন অস্ত্রে সজ্জিতা হয়ে এ দেবী যুদ্ধে মহিষাসুরকে বধ করেন। তাই দেবীর এক নাম হয় মহিষাসুরমর্দিনী। কালীবিলাসতন্ত্র, কালিকাপুরাণ, দেবীভাগবত, মহাভাগবত, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী, দুর্গোৎসব বিবেক, দুর্গোৎসব তত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থে দেবী দুর্গা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

দুর্গাপূজার প্রচলন সম্পর্কে পুরাণে লিখিত হয়েছে যে, পুরাকালে রাজ্যহারা রাজা সুরথ এবং স্বজনপ্রতারিত সমাধি বৈশ্য একদিন মেধস মুনির আশ্রমে যান। সেখানে মুনির পরামর্শে তাঁরা দেবী দুর্গার পূজা করেন। পূজায় তুষ্ট দেবীর বরে তাঁদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়। এ পূজা বসন্তকালে হয়েছিল বলে এর এক নাম 'বাসন্তী' পূজা।

কালিকা পুরাণ ও বৃহদ্ধর্ম পুরাণ অনুসারে, রাম ও রাবণের যুদ্ধের সময় শরৎকালে দুর্গাকে পূজা করা হয়েছিল। হিন্দুশাস্ত্র

অনুসারে, শরৎকালে দেবতারা ঘুমিয়ে থাকেন। তাই এই সময়টি তাদের পূজা যথাযথ সময় নয়। অকালের পূজা বলে তাই এই পূজার নাম হয় "অকালবোধন"। এই দুই পুরাণ অনুসারে, রামকে সাহায্য করার জন্য ব্রহ্মা দুর্গার বোধন ও পূজা করেছিলেন। কৃত্তিবাস তার রামায়ণে লিখেছেন, রাম স্বয়ং দুর্গার বোধন ও পূজা করেছিলেন। তবে রামায়ণের প্রকৃত রচয়িতা বাল্মীকি মুনি রামায়ণে রামচন্দ্রকৃত দুর্গাপূজার কোনো উল্লেখ করেন নি। উপরন্তু রামায়ণের অন্যান্য অনুবাদেও এর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায়না। তবে এই প্রচলিত তথ্য অনুসারে স্মৃতিশাস্ত্রসমূহে শরৎকালে দুর্গাপূজার বিধান দেওয়া হয়েছে।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ-এ কৃষ্ণকে দুর্গাপূজার প্রবর্তক বলা হয়েছে। বিভিন্ন দেবদেবীরা কীভাবে দুর্গাপূজা করেছিলেন, তার একটি তালিকা এই পুরাণে পাওয়া যায়। তবে এই প্রসঙ্গে কোনো পৌরাণিক গল্পের বিস্তারিত বর্ণনা এই পুরাণে দেওয়া হয়নি। সৃষ্টির প্রথম যুগে পরমাত্মা কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠের আদি-বৃন্দাবনের মহারাসমণ্ডপে প্রথম দুর্গাপূজা করেন। এরপর মধু ও কৈটভ নামে দুই অসুরের ভয়ে ব্রহ্মা দ্বিতীয় দুর্গাপূজা করেছিলেন। ত্রিপুর নামে এক অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে শিব বিপদে পড়ে তৃতীয় দুর্গাপূজার আয়োজন করেন। দুর্বাসা মুনির অভিশাপে লক্ষ্মীকে হারিয়ে ইন্দ্র যে পূজার আয়োজন করেছিলেন, সেটি ছিল চতুর্থ দুর্গাপূজা। এরপর থেকেই পৃথিবীতে মুনিঋষি, সিদ্ধপুরুষ, দেবতা ও মানুষেরা নানা দেশে নানা সময়ে দুর্গাপূজা করে আসছে।

দুর্গাপূজা সমাধারণত সাত্ত্বিক মতে জপ, যজ্ঞ ও নিরামিষ ভোগ দ্বারা পূজা সম্পন্ন করা হয়। অতীতে দুর্গাপূজার সময় ছাগল, মেষ, মহিষ, হরিণ বলি দেওয়া হতো। বর্তমানে অবশ্য বলির প্রচলন নেই বললেই চলে। দেবী সাধারণত দশভুজা, তবে শাস্ত্রানুসারে তাঁর বাহুর সংখ্যা হতে পারে চার, আট, দশ, ষোলো, আঠারো বা কুড়ি। প্রতিমার রং হতে পারে অতসীপুষ্পবর্ণ বা তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, কখনও বা রক্তবর্ণ। প্রতিমা ছাড়াও পূজা হতে পারে দর্পণে, অনাবৃত ভূমিতে, পুস্তকে, চিত্রে, ত্রিশূলে, শরে, খড়গে বা জলে। দুর্গাপূজায় হিন্দু ধর্মের সকল বর্ণের লোকেরাই অংশগ্রহণ করতে পারে।

বঙ্গদেশে প্রথম দুর্গাপূজার প্রচলন করেন সম্রাট আকবরের (১৫৫৬- ১৬০৫) রাজত্বকালে রাজশাহী জেলার তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ। কিন্তু জীমূতবাহনের (আনু. ১৩৮১-১৪৬১) রামায়ণ, শূলপাণির (১৫শ-১৬শ শতক) তিথিতত্ত্ব ইত্যাদি গ্রন্থে দুর্গাপূজার বিস্তৃত বর্ণনা থাকায় অনুমান করা হয় যে, বাংলায় দুর্গাপূজা দশম অথবা একাদশ শতকেই প্রচলিত ছিল। উনিশ শতকে কলকাতায় মহাসমারোহে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হতো। অষ্টাদশ শতকের শেষ অব্দি ইউরোপীয়ানরাও দুর্গোৎসবে অংশগ্রহণ করত।

বাঙালি হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হলো দুর্গাপূজা। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অবাঙালিরাও ভিন্ন ভিন্ন নামে এ পূজা উদ্‌যাপন করে থাকেন। কাশ্মীর ও দাক্ষিণাত্যে অম্বা ও অম্বিকা, গুজরাটে হিঙ্গুলা ও রুদ্রাণী, কান্যকুব্জে কল্যাণী এবং কুমারিকা প্রদেশে কন্যাকুমারী নামে দেবীর পূজা ও উৎসব পালিত হয়। এ পূজা সারাবিশ্বে হিন্দু সম্প্রদায়ের দ্বারা পালিত হয়, তবে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ওড়িশা, বিহার, ত্রিপুরা, ঝাড়খণ্ড, উত্তর প্রদেশ (পূর্বাঞ্চল) এবং বাংলাদেশে ঐতিহ্যগতভাবে প্রধান উৎসব হিসেবে উদযাপিত হয়। আশ্বিনের নবরাত্রির পূজা শারদীয় দুর্গাপূজা এবং বসন্তের নবরাত্রির পূজা বাসন্তিক বা বসন্তকালীন দুর্গাপূজা নামে পরিচিত। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে কলকাতার দুর্গাপূজা ইউনেস্কোর অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় যুক্ত হয়েছে।

সাধারণত আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠ থেকে দশম দিন পর্যন্ত শারদীয়া দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই পাঁচ দিন যথাক্রমে "দুর্গাষষ্ঠী", "দুর্গাসপ্তমী", "মহাষ্টমী", "মহানবমী" ও "বিজয়াদশমী" নামে পরিচিত। আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষটিকে বলা হয় "দেবীপক্ষ"। দেবীপক্ষের সূচনার অমাবস্যাটির নাম মহালয়া; এই দিন সনাতনীরা তর্পণ করে তাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। দেবীপক্ষের শেষ দিনটি হল কোজাগরী পূর্ণিমা। এই দিন সনাতন ধর্মাবলম্বীদের দেবী লক্ষ্মীর পূজা করা হয়। কোথাও কোথাও পনেরো দিন ধরে দুর্গাপূজা পালিত হয়। সেক্ষেত্রে মহালয়ার আগের নবমী তিথিতে পূজা শুরু হয়। এক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো যে, কালিকা পুরাণে বলা হয়েছে, অষ্টাদশভুজা মহিষাসুরমর্দিনী উগ্রচণ্ডা তথা দশভুজার বোধন করা হবে কৃষ্ণপক্ষের নবমী তিথিতে, ষোড়শভুজা ভগবতী ভদ্রকালীর বোধন করা হবে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে এবং চতুর্ভুজা ও দশভুজা মহিষাসুরমর্দিনী বিগ্রহের বোধন করা হবে যথাক্রমে শুক্ল প্রতিপদে এবং শুক্লা ষষ্ঠীতে। আবার মহাকাল সংহিতার বিধানে প্রতিমাভেদে উগ্রচণ্ডার কৃষ্ণনবম্যাদিকল্পে, ভদ্রকালীর প্রতিপদাদি কল্পে ও কাত্যায়নী দুর্গার ষষ্ঠ্যাদি কল্পে পূজার অনুষ্ঠান বিধেয়।

আঞ্চলিক স্তরে এক একটি অঞ্চলের বাসিন্দারা যৌথভাবে যে দুর্গাপূজার আয়োজন করেন তা বারোয়ারি পূজা বা সর্বজনীন পূজা নামে পরিচিত। ভারতে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের সময় সর্বজনীন পূজা শুরু হয়। মূলতঃ দেবী দুর্গাকে মাথায় রেখেই দেশমাতা বা ভারতমাতা বা মাতৃভূমির জাতীয়তাবাদী ধারণা বিপ্লবের আকার নেয়। দেবী দুর্গার ভাবনা থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বন্দে মাতরম গানটি রচনা করেন যা ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্র। সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ বিপ্লবী ও জাতীয়তাবাদী নেতারা বিভিন্ন সর্বজনীন পূজার সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। বেলুড় মঠসহ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্র এবং ভারত সেবাশ্রম সংঘের বিভিন্ন কেন্দ্রের সন্ন্যাসীরা দুর্গাপূজার আয়োজন করেন।

দুর্গোৎসব উপলক্ষে আত্মীয়স্বজন সকলে একত্র মিলিত হয়। ঢাকার সর্বজনীন দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয় ঢাকেশ্বরী মন্দিরে। এছাড়া শতাধিক মন্দিরে পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজা উপলক্ষে গরিব-দুঃখীদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। ঢাকাস্থ রামকৃষ্ণ মিশন-মন্দিরে অষ্টমীর দিন আট/নয় বছরের একটি বালিকাকে দুর্গা সাজিয়ে কুমারী পূজা করা হয়। দশমীর দিন সকাল থেকে চলে বিসর্জনের আয়োজন। মিছিল সহকারে প্রতিমা নিয়ে বিকেল থেকে শুরু হয় নিকটস্থ নদী খাল-বিল কিংবা পুকুরের বিসর্জনের পালা। ঢাকার অধিকাংশ প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয় বুড়িগঙ্গার জলে। এভাবে বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হয় পাঁচদিন ব্যাপী দুর্গোৎসব।

মূর্তিতত্ত্ব

বাংলায় দেবী দুর্গার যে মূর্তিটি সচরাচর দেখা যায় সেটি পরিবারসমন্বিতা বা সপরিবার দুর্গার মূর্তি। এই মূর্তির মধ্যস্থলে দেবী দুর্গা সিংহবাহিনী ও মহিষাসুরমর্দিনী; তার মুকুটের উপরে শিবের ছোট মুখ, দেবীর ডানপাশে উপরে দেবী লক্ষ্মী ও নিচে গণেশ; বামপাশে উপরে দেবী সরস্বতী ও নিচে কার্তিকেয়। কলকাতায় সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবার ১৬১০ সালে এই সপরিবার দুর্গার প্রচলন করেন। তারা কার্তিকেয়র রূপ দেন জমিদার পুত্রের, যা তৎপূর্ব ছিল সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের আদলে যুদ্ধের দেবতা রূপে। এছাড়াও বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর-সংলগ্ন অঞ্চলে দেবী দুর্গা এক বিশেষ মূর্তি দেখা যায়। সেখানে দেবীর ডানপাশে উপরে গণেশ ও নিচে লক্ষ্মী, বামে উপরে কার্তিকেয় ও নিচে সরস্বতী এবং কাঠামোর উপরে নন্দী-ভৃঙ্গীসহ বৃষভবাহন শিব ও দুইপাশে দেবীর দুই সখী জয়া ও বিজয়া অবস্থান করেন। কলকাতার কোনও কোনও বাড়িতে দুর্গোৎসবে লক্ষ্মী ও গণেশকে সরস্বতী ও কার্তিকেয়ের সঙ্গে স্থান বিনিময় করতে দেখা যায়। আবার কোথাও কোথায় দুর্গাকে শিবের কোলে বসে থাকতেও দেখা যায়। এগুলি ছাড়াও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে দেবী দুর্গার বিভিন্ন রকমের স্বতন্ত্র মূর্তিও চোখে পড়ে। তবে দুর্গার রূপকল্পনা বা কাঠামোবিন্যাসে যতই বৈচিত্র থাকুক, বাংলায় দুর্গোৎসবে প্রায় সর্বত্রই দেবী দুর্গা সপরিবারে পূজিতা হন। এই প্রসঙ্গে স্বামী প্রমেয়ানন্দের উক্তিটি স্মরণীয়ঃ

"...ধনদাত্রী লক্ষ্মী, বিদ্যাদায়িনী সরস্বতী, শৌর্য-বীর্যের প্রতীক কার্তিকেয়, সিদ্ধিদাতা গণেশ ও তাঁদের বাহন-সকলের মূর্তিসহ মহামহিমময়ী দুর্গামূর্তির পরিকল্পনা ও পূজা বাংলার নিজস্ব।"

দুর্গা

স্বামী প্রমেয়ানন্দে মতানুসারে-

-'দ' অক্ষর দৈত্যনাশক, উ-কার বিঘ্ননাশক, 'রেফ' রোগনাশক, 'গ' অক্ষর পাপনাশক ও অ-কার ভয়-শত্রুনাশক। অর্থাৎ, দৈত্য, বিঘ্ন, রোগ, পাপ ও ভয়-শত্রুর হাত থেকে যিনি রক্ষা করেন, তিনিই দুর্গা। অন্যদিকে শব্দকল্পদ্রুম অনুসারে, "দুর্গং নাশয়তি যা নিত্যং সা দুর্গা বা প্রকীর্তিতা" অর্থাৎ, দুর্গ নামক অসুরকে যিনি বধ করেন তিনিই নিত্য দুর্গা নামে অভিহিতা। আবার শ্রীশ্রীচণ্ডী অনুসারে এই দেবীই 'নিঃশেষ দেবগণ শক্তিসমূহ মূর্ত্যাঃ' বা সকল দেবতার সম্মিলিত শক্তির প্রতিমূর্তি।

সিংহ

দুর্গার বাহন সিংহ। শ্রীশ্রীচণ্ডী-তে সিংহকে "মহাসিংহ", "বাহনকেশরী", "ধূতসট" ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে। দুর্গাপূজার সময় সিংহকেও বিশেষভাবে পূজা করা হয়। দেবীপুরাণ-এ উল্লিখিত সিংহের ধ্যানে তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে বিষ্ণু, শিব, দুর্গা প্রমুখ দেবদেবীরা অবস্থান করেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অপর একটি ধ্যান মন্ত্রে সিংহকে বিষ্ণুর একটি রূপ বলা হয়েছে। কালীবিলাস তন্ত্র-এ দুর্গার বাহনকে বলা হয়েছে বিষ্ণুরূপী সিংহ।

কালিকাপুরাণ অনুসারে, মহামায়া কামাখ্যার বাহন হওয়ার জন্য শিব শবদেহ, ব্রহ্মা রক্তপদ্ম ও বিষ্ণু সিংহের মূর্তি ধারণ করেছিলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুসারে, হিমালয় দুর্গাকে সিংহ দেন। শিবপুরাণ অনুসারে, শুম্ভ-নিশুম্ভকে বধ করার জন্য ব্রহ্মা দুর্গাকে সিংহ দেন। পদ্মপুরাণ-এ আছে, দুর্গার ক্রোধ থেকে সিংহের জন্ম হয়। দেবীপুরাণ অনুযায়ী, বিষ্ণু দুর্গার বাহন সিংহকে নির্মাণ করেছিলেন এবং সেই সিংহে সকল দেবতার অধিষ্ঠান হয়েছিল।

সিংহ রজোগুণের এক প্রচণ্ড শক্তির উচ্ছ্বাসের প্রতীক। স্বামী নির্মলানন্দ বলেছেন,

"সত্ত্বগুণের অনুগত হলে সেই শক্তি লোকস্থিতির সহায়ক হয়ে ওঠে।...(সিংহ) আসুরিকতা ও পাশবিকতার উচ্ছেদ সাধনপূর্বক দেবীর লোকস্থিতিমূলক পূণ্য কর্মের সহায়কারী।"

এছাড়াও সিংহ মানুষের পশুত্ববিজয়েরও প্রতীক। স্বামী প্রমেয়ানন্দ লিখেছেন, "প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে পশুশক্তি। পুরুষকার ও সাধন-ভজনের দ্বারা মানুষ যখন যথার্থ মনুষ্যত্বে উপনীত হয় তখন তার পশুভাব কেটে গিয়ে দেবভাব জাগ্রত হয়। আর তখনই সে প্রকৃত শরণাগত হওয়ার যোগ্যতা লাভ করে, সার্থক জীবনের অধিকারী হয়। দেবীর চরণতলে সিংহ সেই ভাবেরই প্রতীক।"

মহিষাসুর

মহিষাসুর অসুর, অর্থাৎ দেবদ্রোহী। তাই দেবীপ্রতিমায় দেবীর পদতলে দলিত এই অসুর 'সু' এবং 'কু'-এর মধ্যকার চিরকালীন দ্বন্দে অশুভ শক্তির উপর শুভশক্তির বিজয়ের প্রতীক। স্বামী প্রমেয়ানন্দের ভাষায়,

"সাধকের পক্ষে অসুর অবিদ্যা। বিদ্যারূপিণী মা অবিদ্যা বিনাশ করে মহামুক্তির বিধান করেন। সাধারণ মানুষের জীবনে দুঃখ-কষ্ট, ভয়-ভীতি, আপদ-বিপদ- এ-সকলই আসুরিক শক্তির কার্য। পরমকরুণাময়ী মা নিরন্তর অসুর বিনাশ করে সন্তানের কল্যাণ বিধান করছেন।"

তবে অসুর হলেও দুর্গোৎসবে মহিষাসুরের

পূজা কিন্তু শাস্ত্রনির্দিষ্ট। কালিকা পুরাণ অনুসারে, মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে ভদ্রকালীর হাতে নিজের শিরশ্ছেদ ও রক্তপানের স্বপ্নদৃশ্য দেখে ভীত মহিষাসুর ভদ্রকালীকে তুষ্ট করেন। ভদ্রকালী তাঁর ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে বরদান করতে ইচ্ছুক হন। মহিষাসুর যজ্ঞভাগ বর চাইলে দেবী সেই বর দিতে অস্বীকৃত হন; কিন্তু মহিষাসুরকে এই বর দেন যে যেখানেই দেবী অষ্টাদশভুজা উগ্রচণ্ডা, ষোড়শভুজা ভদ্রকালী ও দশভুজা দুর্গা রূপে পূজিতা হবেন, সেখানেই তাঁর চরণতলে থেকে মহিষাসুরও পূজা পাবেন। কালিকা পুরাণের বর্ণনায় আরও জানা যায় যে স্বয়ং মহাদেব রম্ভাসুরের কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে তিন জন্মে মহিষাসুর রূপে তাঁর পুত্র হিসেবে জন্ম নেন, আর জগজ্জননী দুর্গার পদলগ্ন হয়ে সিংহরূপী বিষ্ণুর সঙ্গে দেবীর ভার বহন করেন।

গণেশ
গণেশ কার্যসিদ্ধির দেবতা। হিন্দু পুরাণের নিয়ম অনুসারে, অন্যান্য দেবতার আগে গণেশের পূজা করতে হয়। গণেশের পূজা আগে না করে অন্য কোনো দেবতার পূজা করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। স্বামী প্রমেয়ানন্দ লিখেছেন, "গণশক্তি যেখানে ঐক্যবদ্ধ সেখানে কর্মের সকল প্রকার বাধাবিঘ্ন দূরীভূত হয়। দেবাসুর-যুদ্ধে দেবতারা যতবারই ঐক্যবদ্ধ হয়ে অসুরদের সঙ্গে লড়াই করেছেন ততবারই তাঁরা জয়ী হয়েছেন। গণেশের আর এক নাম বিঘ্নেশ, অর্থাৎ বিঘ্ননাশকারী। বিঘ্নেশ প্রসন্ন থাকলে সিদ্ধি নিশ্চিত।"

মুষিক
গণেশের বাহন মুষিক বা ইঁদুর। ইঁদুর মায়া ও অষ্টপাশ ছেদনের প্রতীক। ব্রহ্মর্ষি শ্রীসত্যদেবের ভাষায়,

"অথর্বশীর্ষের সায়নভাষ্যে উক্ত হইয়াছে মুষ্ণাতি অপহরতি কর্মফলানি ইতি মূষিকঃ। জীবের কর্মফলসমূহ অজ্ঞাতসারে অপহরণ করে বলিয়া ইহার নাম মূষিক। প্রবল প্রতিবন্ধকস্বরূপ কর্মফল বিদ্যমান থাকতে সিদ্ধিলাভ হয় না। তাই, কর্মফল হরণের উপর সিদ্ধি প্রতিষ্ঠিত।"

লক্ষ্মী
লক্ষ্মী শ্রী, সমৃদ্ধি, বিকাশ ও অভ্যুদয়ের প্রতীক। শুধু ধনৈশ্বর্যই নয়, লক্ষ্মী চরিত্রধনেরও প্রতীক। স্বামী নির্মলানন্দের ভাষায়, "ধন, জ্ঞান ও শীল- এ তিনেরই মহনীয় বিকাশ দেবী লক্ষ্মীর চরিত্রমাহাত্ম্যে। সর্বাত্মক বিকাশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলেই তিনি কমলা। কমল বা পদ্মের ন্যায়ই তিনি সুন্দরী; তদীয় নেত্রদ্বয় পদ্মের ন্যায় আয়ত। তাঁর শুভ করে প্রস্ফুটিত পদ্মকুসুম; পদ্মবনেই তাঁর বসতি। "

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী অন্যদিকে সমুদ্রমন্থনে সমুদ্ভূতা দেবী লক্ষ্মীর মূর্তিতত্ত্বের অপর এক ব্যাখ্যাও দিয়েছেন, "যাঁহারা বিচক্ষণ তাঁহারা ভূমি-প্রকৃতি কর্ষণ করিয়া শস্যধন আহরণ করেন, বন-প্রকৃতি অনুসন্ধান করিয়া ধন আহরণ করেন। খনি প্রকৃতি খনন করিয়া স্বর্ণধন সংগ্রহ করেন। এই সকলই সাগরমন্থন। ...এই সকল সাগর-মন্থনে ধনাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীর আবির্ভাব।

পেচক
লক্ষ্মীর বাহন পেচক বা প্যাঁচা। রূপে ও গুণে অতুলনীয় এই দেবীর এমন কিম্ভুত বাহন কেন, সে নিয়ে বেশ কয়েকটি মত প্রচলিত। প্রথমেই স্মরণে রাখা কর্তব্য, হিন্দু শাস্ত্রে কোথাও পেচককে লক্ষ্মীর বাহনের মর্যাদা দান করা হয়নি। এই বিশ্বাস একান্তই বাঙালি হিন্দু লোকবিশ্বাস।

প্যাঁচা দিবান্ধ। মনে করা হয়, যাঁরা দিবান্ধ অর্থাৎ তত্ত্ববিষয়ে অজ্ঞ, তারাই পেচকধর্মী। মানুষ যতকাল পেচকধর্মী থাকে ততদিনই ঐশ্বর্যের দেবী লক্ষ্মীর আরাধনা করে।

মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর মতে, "পেচক মুক্তিকামী সাধককে বলে, সকলে যখন ঘুমায় তুমি আমার মতো জাগিয়া থাকো। আর সকলে যখন জাগ্রত তখন তুমি আমার মতো ঘুমাইতে শিখ, তবেই সাধনে সিদ্ধি। কৈবল্যধন লাভ।

পরমার্থধনাভিলাষী সাধক পেঁচার মতো রাত্রি জাগিয়া সাধন করে। লোকচক্ষুর অন্তরালে নির্জনে থাকে। লক্ষ্মীমার বাহন রূপে আসন লইয়া পেচকের যে ভাষণ তাহা বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন প্রকার সাধকের উপাদেয় সম্পদ।

সরস্বতী
সরস্বতী বাণীরূপিণী বাগদেবী; তিনি জ্ঞানশক্তির প্রতীক।

"দেবীর হাতে পুস্তক ও বীণা। পুস্তক বেদ শব্দব্রহ্ম। বীণা সুরছন্দের প্রতীক নাদব্রহ্ম। শুদ্ধ সত্ত্বগুণের পূর্তি, তাই সর্বশুক্লা। শ্বেতবর্ণটি প্রকাশাত্মক। সরস্বতী শুদ্ধ জ্ঞানময়ী প্রকাশস্বরূপা। জ্ঞানের সাধক হতে হলে সাধককে হতে হবে দেহে মনে প্রাণে শুভ্র-শুচি।"

হংস
সরস্বতীর বাহন হংস। হংস হিন্দুদের নিকট একটি পবিত্র প্রতীক।

"সরস্বতী-ব্রহ্মবিদ্যা। যে সাধক দিবারাত্র অজপা মন্ত্রে সিদ্ধ তিনিই হংসধর্মী। মানুষ সুস্থ শরীরে দিবারাত্র মধ্যে একুশ হাজার ছয়শত 'হংস' এই অজপা মন্ত্রজপরূপে শ্বাস-প্রশ্বাস করিয়া থাকে। মানুষ যতদিন এই স্বাভাবিক জপ উপলব্ধি করিতে না পারে, ততদিন 'হংসধর্মী' হতে পারে না; সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যারও সন্ধান পায় না।"

কার্তিকেয়
দুর্গাপূজার সময় পূজিত কার্তিক মূর্তি। দেবসেনাপতি কার্তিকেয় বা কার্তিক সৌন্দর্য ও শৌর্যবীর্যের প্রতীক।

"যুদ্ধে শৌর্য-বীর্য প্রদর্শন একান্ত প্রয়োজনীয়। তাই সাধক-জীবনে এবং ব্যবহারিক জীবনে কার্তিকেয়কে প্রসন্ন করতে পারলে শৌর্য-বীর্য আমাদের করতলগত হয়..."

ময়ূর
কার্তিকেয়ের বাহন ময়ূর। সৌন্দর্য ও শৌর্য– কার্তিকেয়ের এ দুই বৈশিষ্ট্যই তার বাহন ময়ূরের মধ্যে বিদ্যমান।

মহালয়া
মহালয়া বা পিতৃপক্ষের দিন থেকে মূলত দুর্গা পূজার আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। তবে এ দিনটির তাৎপর্য মূলত ভিন্ন। এ

তিথিকে পিতৃপক্ষও বলা হয়ে থাকে। এ দিনে পিতৃপক্ষের শেষ এবং দেবী পক্ষের শুরু হয়। এই মহালয়া তিথিতে যারা পিতৃ-মাতৃহীন তারা তাদের পূর্বপুরুষের স্মরণ করে, পূর্বপুরুষের আত্মার শান্তি কামনা করে অঞ্জলি প্রদান করেন। সনাতন ধর্ম অনুসারে এই দিনে প্রয়াত আত্মাদের মর্ত্যে পাঠিয়ে দেয়া হয়, প্রয়াত আত্মা যে সমাবেশ হয় তাকে মহালয় বলা হয়। মহালয় থেকে মহালয়া। পিতৃপক্ষেরও শেষদিন এটি। মহালয়াতে যারা গঙ্গায় অঞ্জলি প্রদান করেন পূর্বদের আত্মার শান্তির জন্য, তাহারা শুধু পূর্বদের নয়, পৃথিবীর সমগ্র কিছুর জন্য প্রার্থনা ও অঞ্জলি প্রদান করেন। যাদের পুত্র নেই, যাদের কেউ নেই আজ স্মরণ করার তাদের জন্য ও অঞ্জলি প্রদান করতে হয়।

এ সম্পর্কে মহাভারতে একটি কাহিনী বর্ণিত আছে যে- প্রসিদ্ধ দাতা কর্ণের মৃত্যু হলে তার আত্মা স্বর্গে গমন করলে, তাকে স্বর্ণ ও রত্ন খাদ্য হিসেবে প্রদান করা হয়। কর্ণ ইন্দ্রকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে ইন্দ্র বলেন, কর্ণ সারা জীবন স্বর্ণই দান করেছেন, তিনি পিতৃগণের উদ্দেশ্যে কোনোদিন খাদ্য প্রদান করেননি। তাই স্বর্গে তাকে স্বর্ণই খাদ্য হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। কর্ণ বলেন, তিনি যেহেতু তার পিতৃগণের সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না, তাই তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে পিতৃগণকে স্বর্ণ প্রদান করেননি। এই কারণে কর্ণকে ষোলো দিনের জন্য মর্ত্যে গিয়ে পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে অন্ন ও জল প্রদান করার অনুমতি দেওয়া হয়। এই পক্ষই পিতৃপক্ষ নামে পরিচিত হয়। এই কাহিনির কোনো কোনো পাঠান্তরে, ইন্দ্রের বদলে যমকে দেখা যায়।

নবপত্রিকা

নবপত্রিকা দুর্গাপূজার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। নবপত্রিকা শব্দটির আক্ষরিক অর্থ নটি গাছের পাতা। তবে বাস্তবে নবপত্রিকা নটি পাতা নয়, নটি উদ্ভিদ। এগুলি হল –

১. কদলী বা রম্ভা (কলা),
২. অপরাজিতা,
৩. হরিদ্রা (হলুদ),
৪. জয়ন্তী,
৫. বিল্ব (বেল),
৬. দাড়িম্ব (দাড়িম),
৭. অশোক,
৮. মানকচু,
৯. ধান

গণেশের ডান পাশে স্থাপিত নবপত্রিকা

একটি সপত্র কলাগাছের সঙ্গে অপর আটটি সমূল সপত্র উদ্ভিদ একত্র করে একজোড়া বেলসহ শ্বেত অপরাজিতা লতা দিয়ে বেঁধে লালপাড় সাদা শাড়ি জড়িয়ে ঘোমটা দেওয়া বধূর আকার দেওয়া হয়। তারপর তাতে সিঁদুর দিয়ে সপরিবার দেবীপ্রতিমার ডান দিকে দাঁড় করিয়ে পূজা করা হয়। প্রচলিত ভাষায় নবপত্রিকার নাম কলাবউ।

নবপত্রিকার নয়টি উদ্ভিদ আসলে দেবী দুর্গার নয়টি বিশেষ রূপের প্রতীকরূপে কল্পিত হয়। এই নয় দেবী হলেন রম্ভাধিষ্ঠাত্রী ব্রহ্মাণী, কচ্বাধিষ্ঠাত্রী কালিকা, হরিদ্রাধিষ্ঠাত্রী উমা, জয়ন্ত্যাধিষ্ঠাত্রী কার্তিকী, বিল্বাধিষ্ঠাত্রী শিবা, দাড়িম্বাধিষ্ঠাত্রী রক্তদন্তিকা, অশোকাধিষ্ঠাত্রী শোকরহিতা, মানাধিষ্ঠাত্রী চামুণ্ডা ও ধান্যাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী। এই নয় দেবী একত্রে "নবপত্রিকাবাসিনী নবদুর্গা" নামে নবপত্রিকাবাসিন্যৈ নবদুর্গায়ৈ নমঃ মন্ত্রে পূজিতা হন।

মহাস্নান
দুর্গাপূজার একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হল মহাস্নান। মহাসপ্তমীর দিন নবপত্রিকা স্নানের পর মহাস্নান অনুষ্ঠিত হয়। মহাষ্টমী ও মহানবমীর দিনও পূজার মূল অনুষ্ঠান শুরুর আগে মহাস্নান অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গা প্রতিমার সামনে একটি দর্পণ বা আয়না রেখে সেই দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিমার প্রতিবিম্বে বিভিন্ন জিনিস দিয়ে স্নান করানো হয়। মহাস্নানের সময় শুদ্ধজল, নদীর জল, শঙ্খজল, গঙ্গাজল, উষ্ণ জল, সুগন্ধি জল, পঞ্চগব্য, কুশ ঘাসের দ্বারা ছেটানো জল, ফুলে দ্বারা ছেটানো জল, ফলের জল, মধু, দুধ, নারকেলের জল, আখের রস, তিল তেল, বিষ্ণু তেল, শিশিরের জল, রাজদ্বারের মাটি, চৌমাথার মাটি, বৃষশৃঙ্গমৃত্তিকা, গজদন্তমৃত্তিকা, বেশ্যাদ্বারমৃত্তিকা, নদীর দুই তীরের মাটি, গঙ্গামাটি, সব তীর্থের মাটি, সাগরের জল, ঔষধি মেশানো জল, বৃষ্টিজল, সরস্বতী নদীর জল, পদ্মের রেণু মেশানো জল, ঝরনার জল ইত্যাদি দিয়ে দুর্গাকে স্নান করানো হয়।

অষ্টমীপূজা
অষ্টমী পূজা হলো দুর্গা পূজার একটি গুরুত্ব পূর্ণ অংশ। এ অষ্টমীর দিনে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে দেবী দুর্গাকে নিজের মনের ইচ্ছা জানানো হয়। পূজার সূচনায় দন্তকাষ্ঠ ও উষ্ণোদকে দেবীর মুখপ্রক্ষালনের পর মহাস্নান, সাধারণ পূজার নিয়মে ন্যাস, অর্ঘ্যস্থাপন প্রভৃতির পর দুর্গা, কার্তিক,গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতীর পৃথক ষোড়শোপচার পূজা, নবপত্রিকা পূজা, সর্বতোভদ্রমণ্ডলে অষ্টশক্তি, অষ্টমাতৃকা, নবঘট-নবপতাকায় নবদুর্গার পূজা, ৬৪ যোগিনী ও কোটি যোগিনীর পূজা, দেবীর অস্ত্রপূজার পর সিংহ, মহিষাসুর, ময়ুর, মুষিকের পঞ্চোপচার পূজা সমাধা করা হয়। এই দিন অষ্টমী-নবমীর সন্ধিক্ষণে ৪৮ মিনিটে চামুণ্ডা রূপে দেবী দুর্গাকে পুজো করা হয়। এই দিন বিভিন্ন মন্দিরে চালকুমড়ো, চিনি প্রভৃতি বলি দেবার রীতি প্রচলিত আছে। এই দিন অষ্টমীর সন্ধি পুজোর সময় অষ্ট মাতৃকা, ৬৪ ও কোটি যোগিনীরও পুজো করা হয়। এই দিন বেশিরভাগ মন্দিরে দেবী দুর্গাকে লুচি সুজির ভোগ দেওয়া হয়। এই মহাষ্টমী তিথি হল দুর্গাপূজার মধ্যে একটি অন্যতম প্রধান দিন।

কুমারী পূজা
তন্ত্রশাস্ত্রমতে, কুমারী পূজা হলো ষোলো বছরের অনধিক অরজঃস্বলা কুমারী মেয়েকে দেবীজ্ঞানে পূজা করা। বিশেষত দুর্গাপূজার একটি বিশেষ অঙ্গরূপে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা এবং অন্নপূর্ণা পূজা উপলক্ষে এবং কামাখ্যাদি শক্তিক্ষেত্রেও কুমারী পূজার প্রচলন রয়েছে।

১৯০১ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ অক্টোবর, স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে দুর্গাপূজার অষ্টমী তিথিতে প্রথম কুমারী পূজার সূচনা করেন। বেলুড় মঠে রঘুনন্দন প্রণীত তত্ত্ব অনুসারেই পূজা নিষ্পন্ন হয়। পুজোয় সারদা দেবীর নামে সংকল্প করা হয়।

সন্ধিপূজা
দুর্গাপূজার একটি বিশেষ অধ্যায় হল সন্ধিপূজা। দুর্গাপূজার অষ্টমী ও নবমী তিথির সন্ধিক্ষণে ৪৮ মিনিট এই পূজা হয়ে থাকে। অষ্টমী তিথির শেষ ২৪ মিনিট ও নবমী তিথির প্রথম ২৪ মিনিট নিয়ে মোট ৪৮ মিনিটের মধ্যে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। যেহেতু অষ্টমী ও নবমী তিথির সংযোগ স্থলে এই পূজা হয়, তাই এই পূজার নাম সন্ধিপূজা অর্থ্যাৎ সন্ধি-কালীন পূজা। এই পূজা দুর্গাপূজার একটি বিশেষ অঙ্গ, এইসময় দেবী দুর্গাকে চামুন্ডা রূপে পূজা করা হয়ে থাকে। সন্ধিপুজোর মাহেন্দ্রক্ষণেই দেবী দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন। এই পূজা

সম্পন্ন হয় তান্ত্রিক মতে। এই পূজায় দেবীকে ষোলটি উপাচার নিবেদন করা হয়।

নবমীপূজা

দুর্গাপূজার নবমী পূজাকে শারদীয়া মহাপূজা হিসেবে পালন করা হয়। কালিকাপুরাণে বলা হয়েছে- নবম্যাং বলিদানন্তু কর্ত্তব্যং বৈ যথাবিধি। জপং হোমঞ্চ বিধিবৎ কুর্য্যাত্তত্র বিভুতয়ে।। অর্থাৎ বিভূতি লাভের জন্য নবমী তিথিতে যথাবিধি বলিদান করা কর্তব্য। তার সংগে জপ ও হোম করা হয়। এক্ষেত্রে জপ বলতে চণ্ডিপাঠ ও চণ্ডিজপ বোঝায়।

দশমীপূজা

বিসর্জন ও বিজয়া দশমী কৃত্য

দশমির দিন সকালে প্রথা মেনে পূজা সম্পন্ন করার পর ঢাক ঢোল বাজিয়ে বেদনা মিশ্রিত আনন্দের সাথে জলাশয় বা নদী দেবীর ঘট বিসর্জন করে দেবীকে বিদায় জানানো হয়। শুরু হয় আবার এক বছরের প্রতীক্ষা।

অপরাজিতা পূজা

অপরাজিতা পূজা দুর্গাপূজার একটি অঙ্গ। দুর্গার অপর নাম অপরাজিতা। তবে এই দেবীর মূর্তি অন্যরকম। ইনি চতুর্ভুজা; হাতে শঙ্খ, চক্র, বর ও অভয়মুদ্রা; গায়ের রং নীল; ত্রিনয়না ও মাথায় চন্দ্রকলা। বিজয়াদশমীর দিন বিসর্জনের পর পূজামণ্ডপের ঈশানকোণে অষ্টদল পদ্ম এঁকে অপরাজিতার লতা রেখে এই দেবীর পূজা করা হয়। হংসনারায়ণ ভট্টাচার্যের মতে, ইনি "...বৈষ্ণবী শক্তি বিষ্ণুমায়া লক্ষ্মী ও শিবশিক্তি শিবানীর মিশ্রণে কল্পিতা।"

পূজা মন্ত্র

সনাতম ধর্মের যেকোনো পূজার ক্ষেত্রে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে সংস্কৃত মন্ত্রগুলো। দুর্গাপূজা মহাপূজা,(কারণ এতে মহাস্নান-পূজন-হোম-বলিদান- এই চারটি কর্ম জড়িত) এখানে পূজামন্ত্রের সঙ্গে শ্রীশ্রী চণ্ডীও পঠিত হয়। ঢাক-ঢোল-খোল-করতাল-শঙ্খ-ঘণ্টা বাদ্যের সম্মিলিত ঐকতান, ধূপ-ধুনোর সুগন্ধী ধোঁয়া, ফুল-মালা-নৈবেদ্য-চন্দন-অগুরু-কস্তুরী-কর্পূরের মিলিত সুবাস, তার সাথে মন্ত্রোচ্চারণ ও মন্দ্রস্বরে চণ্ডীপাঠ এক ভাবগম্ভীর পবিত্র পরিবেশের সৃষ্টি করে। পূজায় প্রচলিত দেবী দুর্গার ধ্যানমন্ত্র:

দুর্গা পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার মন্ত্রঃ

"১) ওঁ আয়ুর্দ্দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে।
পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্ব্বান্ কামাংশ্চ দেহি মে।।
এষ সচন্দনপুষ্পবিল্বপত্রাঞ্জলি সায়ুধবাহনসাঙ্গাবরণপরিবারসহিতায়ৈ মহাঘোরায়ৈ কোটিযোগিনীপরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ।

২) ওঁ হর পাপং হর ক্লেশং হর শোকং হরাসুখম্।
হর রোগং হর ক্ষোভং হর মারীং হরপ্রিয়ে।।
এষ সচন্দন পুষ্পবিল্বপত্রাঞ্জলি
সায়ুধবাহন সাঙ্গাবরণ পরিবার সহিতায়ৈ মহাঘোরায়ৈ
কোটি যোগিনী পরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ।

৩) ওঁ মহিষঘ্নি মহামায়ে চামুণ্ডে মুণ্ডমালিনি।
আয়ুরারোগ্যং বিজয়ং দেহি দেবি নমোহস্তুতে।।
চন্দনেন সমালব্ধে কুঙ্কুমেন বিলেপিতে।
বিল্বপত্রকৃতাপীড়ে দুর্গেহহং শরণং গতঃ।।
এষ সচন্দন পুষ্পবিল্বপত্রাঞ্জলি সায়ুধ বাহন সাঙ্গাবরণ পরিবার সহিতায়ৈ মহাঘোরায়ৈ কোটি যোগিনী পরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ।"

দুর্গা প্রণাম মন্ত্রঃ

"সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তুতে।।"

লেখক : উপদেষ্টা
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ

ছবি: মৃন্ময় সেন

মহাভারতেও ছিলেন দেবী দুর্গা

সঞ্জীব কুমার সাহা

আমাদের প্রাচীন মহাকাব্য দুটি, রামায়ণ ও মহাভারত। এর মধ্যে রামায়ণে যে দুর্গাপূজার উল্লেখ পাওয়া যায়, তা তো বলাই বাহুল্য। কিন্তু অন্য মহাকাব্য, অর্থাৎ মহাভারতেও কি রয়েছে দুর্গাপূজার কোনও উল্লেখ? আসুন জেনে নিই সেই কথা।

শরৎকালে দুর্গাপূজা হওয়ার পিছনে যে রয়েছেন স্বয়ং রামচন্দ্র, সে কথা তো আমরা সবাই জানি। রাবণবধের আগে দেবী দুর্গার বর প্রার্থনা করে দুর্গাপুজো করেছিলেন রাম। এমনকি, পুজোর জন্য ১০৮টি নীলপদ্ম থেকে একটি কম পড়েছিল বলে নিজের একটি চোখ দিয়ে সেই অভাব মেটাতে চেয়েছিলেন তিনি। তাঁর রামায়ণে এমনটাই জানিয়েছেন বাঙালি কবি কৃত্তিবাস। কিন্তু আরও এক মহাকাব্যে, অর্থাৎ মহাভারতেও কি স্থান পেয়েছে দেবী দুর্গার উপাসনার বৃত্তান্ত?

হ্যাঁ। মহাভারতেও উপেক্ষিতা নন দেবী দুর্গা। মহাভারতের দুটি পর্বে উল্লেখ রয়েছে তাঁর পূজার। কারা করেছিলেন এই পূজা? আর কখনই বা দুর্গাপূজার আয়োজন করা হয়েছিল?

এই মহাকাব্যে দেবীর উপাসনার কথা প্রথম পাওয়া যাচ্ছে বিরাট পর্বে। যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় হেরে যাওয়ার পর শর্ত মতোই রাজ্য, সম্পদ সব হারিয়েছিলেন তাঁরা। সঙ্গে যোগ হয়েছিল বারো বছরের বনবাস এবং আরও এক বছরের অজ্ঞাতবাস। এই অজ্ঞাতবাস কালে কেউ তাঁদের খোঁজ পেলে আরও বারো বছরের জন্য বনবাসে যেতে হবে তাদের। বনবাসের সময় শেষ হলে পঞ্চপাণ্ডব অজ্ঞাতবাসের জন্য নির্বাচন করেন বিরাট নগরকে। কিন্তু সেই রাজ্যে যাওয়ার আগে মুনিরা যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দেন, দেবী দুর্গার কাছে অজ্ঞাতবাসের সাফল্য কামনা করার জন্য। সেইমতো দেবীর আরাধনা করেন জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব। স্তব করেন, 'দুর্গাৎ তারয়সে দুর্গে তৎ ত্বং দুর্গা স্মৃতা, জনৈ'। যুধিষ্ঠির দুর্গার যে রূপের স্তব করেছিলেন, তিনি চতুর্ভুজা, চতুর্বক্তা ও সিংহারূঢ়া। এই দেবী অতসী বর্ণের, সুচারুদশনাও। চোখ নীল পদ্মের মতো গভীর ও সুন্দর। আমাদের পূজিতা দেবীর মতো পাণ্ডবদের উপাস্য এই দেবীরও সৃষ্টি হয়েছিল দেবতাদের দেহনিঃসৃত পুঞ্জীভূত তেজ থেকেই। বলা হয়, মহিষমর্দিনীর ঘোর রূপের উপাসনা করেছিলেন যুধিষ্ঠির। তাঁর স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে রাজ্য ফিরে পাওয়ার বরও দিয়েছিলেন দেবী।

মহাভারতে দ্বিতীয় বার দেবী দুর্গার উপাসনা করেন তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন। কৌরব পক্ষে নিজেদের অগণিত আত্মীয় বন্ধু স্বজনকে দেখে অর্জুন কাতর হয়ে পড়েছিলেন, জানিয়েছিলেন তাঁদের নিজের হাতে হত্যা করতে পারবেন না। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে যা যা উপদেশ দেন, গীতার পাঠক মাত্রেই সে কথা জানেন। কিন্তু এ কথা কি জানেন, তিনি অর্জুনকে দেবী দুর্গার আরাধনা করারও পরামর্শ দিয়েছিলেন? কৌরব পক্ষের বিপুল সেনাবাহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে নাকি সাময়িক ভাবে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন মহাপরাক্রমশালী অর্জুনও। সেই সময়েই কৃষ্ণের উপদেশে দেবী দুর্গার উদ্দেশে স্তোত্রপাঠ শুরু করেন তিনি। তুষ্ট দেবী তাঁকে বর দেন শত্রুজয়ের।

সুতরাং, মহাকাব্যের সাক্ষ্য অনুযায়ী, কেবল রামায়ণ নয়, মহাভারতেও আবির্ভূতা দেবী দুর্গা। তাঁর আশীর্বাদ সঙ্গে করে একদিকে রাবণ বিজয়ে যুদ্ধে নেমেছিলেন রাম, আরেকদিকে হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য কৌরব পক্ষের সম্মুখীন হয়েছিলেন পাণ্ডবেরা। জয় এসেছিল উভয় পক্ষেই। আর সেই জয়ের নেপথ্যে ছিলেন শত্রুবিনাশিনী দেবী দুর্গাও।

লেখক : উপদেষ্টা
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ
প্রক্তন সিনিয়র শিক্ষক
হলিক্রস স্কুল, ঢাকা

দেবী দুর্গার আগমনী বার্তা

শিশির রঞ্জন দাস

ইয়া চণ্ডী মধুকৈটভাদি দৈত্যদলনী
ইয়া মাহিষ্মেমালিনী
ইয়া ধূম্রেক্ষণচণ্ড মুণ্ডমথনি
ইয়া রক্তবীজাশনী
শক্তি শুণ্ডনিশুড়ম্ভ দৈত্যদলনী।
ইয়া সিদ্ধিদাত্রী পরা
যা দেবী নবকোটি মূর্তি সহিতা
আশ্বিনের শারদপ্রাতে বেজে উঠেছে
আলোকমঞ্জীর। ধরণীর বহিরাকাশে
অন্তহিত মেঘমালা। প্রকৃতির অন্তরাকাশে
জাগরিত জ্যোতিময়ী জগন্মাতার আগমন
বার্তা।
আনন্দময়ী মহামায়ার পদধ্বনি। অসীম
ছন্দে বেজে উঠে রূপলোক ও রসলোকে
নবভাবমাধুরীর সঞ্জীবন।
তাই আনন্দিতা শ্যামলী মাতৃকার
চিন্ময়ীকে মৃন্ময়তে আহ্বান আজ
চিচ্ছক্তি রূপিণী বিশ্বজননীর শ্বারদশ্রী
বিমণ্ডিতা প্রতিমা মন্দিরে মন্দিরে
ধ্যানবোধিতা।
"সিংহস্থা শশিশেখরা মরকতপ্রেক্ষা
চতুর্ভির্ভুজৈঃ।
শখং চক্রদনুঃশরাংশ্চ দেতা নেতৈস্ত্রিভিঃ
শোভিতা।।
আমুক্তাঙ্গদাহার কঙ্কনরণৎ
কাঞ্চাক্কনুন্নপুরা।
দুর্গা দুর্গতহারিণী ভবুত নো
রত্নোল্লসৎকুণ্ডলা।
মহামায়া সনাতনী, শক্তিরূপা, গুণময়ী
তিনি এক, তবু প্রকাশ বিভিন্ন দেবী
নারায়নী; আবার ব্রহ্মশক্তিরূপ
ব্রাহ্মণী কখনো মহেশ্বরীরূপে প্রকাশমানা,
কখনো বা নির্মলা।
কৌমারী রূপধারিণী কখনো মহাবজ্র
রূপিনী ঐন্দ্রি, উগ্র-শিব
দুতিনী-নমুণ্ডমালিনী-চামুণ্ডা-তিনি
আবর তবময়ী নিয়তি
এসব প্রকাশমান মহাশক্তি পরমা প্রকৃতির
আবির্ভাব হবে সপ্তলোক তাই আনন্দমগ্ন।
'বাজলো তোমার আলোর বেনু
মাতাল যে ভুবন
আজ প্রভাতে সে সুর শুনে খুলে দিনু মন
অন্তরে যা লুকিয়ে রাজে
অরূপ বীনায় সেই সুর বাজে
এই আনন্দ যজ্ঞে সবার মধুর আমন্ত্রণ
আজ সমীরণ আলোয় পাগল, নবীন
সুরের বীণায়
আজ শরতের আকাশ বীণায় গানের
মালা বিলায়
তোমায় হারা জীবন মম, তোমারি
আলোয় নিরূপম
ভোরের পাখি উঠে গাহি তোমারি বন্দন।'
দেবী চণ্ডিকা সচেতন চিন্ময়ী, তিনি নিত্য,
তাঁর আদি নেই, তাঁর প্রকৃত মূর্তি নেই,
এই বিশ্বের প্রকাশ তার মূর্তি। নিত্য হয়েও
অসুর-পিঁড়িতে দেবতা রক্ষণে তার
আবির্ভাব। দেবীর শাশ্বত
অভয়বাণী-'ইলখং যদা যদা বাধা,
দানবোলখা ভবিষ্যতি। তদা
তদাবতীযাহং, করিষ্যাম্যারি সংক্ষয়ম।
পূর্বকলা অবসানের পর প্রেমময়কালে
সমস্ত জগৎ যখন কারণ সলিলে পরিণত
হলো। ভগবান বিষ্ণুর অখিল শক্তির
প্রভাব সংহত করে। সেই কারণে সমুদ্রে
রচিত অনন্ত শয্যাপরে, যোগ নিদ্রায়
হলেন অভিভূত বিষ্ণুর যোগ নিন্দ্রার
অবসান কালে তার নাভিপদ্ম থেকে জেগে
উঠলেন ভাবিকলার সৃষ্টি বিধাতা ব্রহ্মা,
কিন্তু কর্ণমলজাত মধুকৈটও অদুরন্দয়,
ব্রহ্মার অস্তিত্ব বিনাশে উদ্ধত হতে,
পদ্মযোনি ব্রহ্মা যোগ নিদ্রায় মগ্ন
সর্বশক্তিমান বিশ্ব বিধাতা বিষ্ণুকে
জাগরিত করবার জন্য, জগতের স্থিতি
সংহারকারিণী বিশ্বেশ্বরী জগজ্জননী
হরিনেত্র-নির্বাসিনী নিরূপমা ভগবতীকে
স্তব মন্ত্রে করলেন উদভুদিত-
এই ভগবতী বিষ্ণু নিদ্রারূপা মহারাত্রি,
যোগ-নিদ্রা দেবী
'তব অচিন্ত্য রূপ চরিত মহিমা
নব শোভা- নব ধ্যান রূপায়িত প্রতিমা,
বিকশিল জ্যোতি প্রাতি মঙ্গল বরণে
তুমি সাধন ধন ব্রহ্ম বোধন সাধনে
তব প্রেমনয়ন ভাতি নিখিল তারণী
কনককান্তি ঝরিছে কান্ত বদনে।।
হে মহালক্ষ্মী জননী গৌরী শুভদা।
জয় সংগীত ধ্বনিছে তোমারই ভুবনে।।'
অপূর্ব স্ত্রীমূর্তি মহাশক্তি দেবগণের অংশ

সম্ভুতা, দেবগণের সমষ্টিভূত তেজপিণ্ড এক বরবর্ণিনী শক্তি স্বরূপিণী দেবীমূর্তি ধারণ করলেন। এই দেবীর আনন শ্বেতবর্ণ, নেত্র কৃষ্ণবর্ণ অধর পল্লব আরক্তিম ও করতলদ্বয় তম্রাও। তিনি কখনোবা সহস্রভুজা, কখনো বা অষ্টাদশ ভুজারূপে প্রকাশিত হতে লাগলেন। এই ভামকান্তরূপিণী দেবী ত্রিগুণা মহালক্ষ্মী। তিনিই আদ্য মহাশক্তি মহাদেবীর, মহা মহিমায় আবির্ভাবে বরণগীত ধ্বনিত হয়ে উঠল।

'অখিল বিমানে তব জয়গানে যে সামবর,
বাজে সেই সুরে সোনার নূপুরে নিত্যে নব।
হে আলোর আলো, তিমির মিলাল।
তবজ্যোতি সুধা চেতনা বিশাল।
রাগিনী সে ছিড়ে গাহিল মধুরে সে বৈভব।
'জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিণী।
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোহস্ত তে॥
দেবীর আবির্ভাবের এই শুভ বার্তা প্রকাশিত হলো।'

সব দেবদেবী মহাদেবীকে বরণ করলেন গীতিমাল্যে, সেবা করলেন রাগচন্দনে। জগৎমাতা চণ্ডিকা উপাসকের ধনদাত্রী, ব্রহ্মা চৈতন্যস্বরূপা
সর্বোত্তম মহিমা। মহাদেবী অন্তর্যামীরূপে ব্যক্ত হয়ে আছেন দ্যুলোক ভূলোক। ভুবনমোহিনী সর্ব বিরাজমান জগদীশ্বরী, আপন মহিমায় দ্যাবপৃথিবী ও সৃষ্টির মধ্যে পরিব্যক্ত হয়ে অবস্থান করেন পরম চৈতন্যরূপ। মানবের কল্যাণে সর্বমঙ্গলা হোন উদ্বুদ্ধা।

'শুভ্র শঙ্খরবে সারা নিখিল ধ্বনিত।
আকাশতলে অনিল জলে, দিকে দিগঞ্চলে,
সকল লোকে, পুরে বনে বনান্তরে
নিত্যগীত ছন্দে নন্দিত।
শরৎ প্রকৃতি উল্লসি তবগানে, চিরসুন্দর
চিরসুন্দর, চিরসুন্দর বন্দনদানে,
ত্রিলোকে যোগে সুরনয়ী আনন্দে।
মহাশক্তিরূপা মঞ্জুজুলশোভা জাগে আনন্দে,
মা কল্যাণী সদা রাজ্যে, সদা সুখদা, সদা
বরদান, সদা ভয়দা ক্ষেমঙ্করী সুধা হৃদে।
অসুরদর্শন দশ প্রহরণ ভুজা রাগে।
রণিত বীণাবেণু, মধু ললিত শমিত তানে,
শুভ আরতি ঋতকৃত ভুবনে নবজ্যোতি
রাগে।
জ্যোতি অলঙ্কারে তানে তানে উঠে গীতি,
সুধারসঘন শান্তি শান্তি ঝন ঝন জয়গানে॥

দেবী নিত্য, তথাপি দেবগণের কার্যসিদ্ধ হেতু সর্বদেবশরীরজ তেজঃপুত্র থেকে তখন প্রকাশিত হয়েছেন বলে তাঁর এই অভিনব প্রকাশ বা আবির্ভাবেই মহিষমর্দিনার উৎপত্তিরূপে খ্যাত হল। দেবী সজ্জিত হলে অপূর্ব রণচণ্ডী মূর্তিতে হিমাচল দিলেন সিংহবাহন, বিষ্ণু দিলেন চক্র। পিনাকপানি শঙ্কর দিলন শ্রম, যম দিলেন তাঁর দণ্ড। কালদেব সুতাক্ষ্ম খড়গ। চন্দ্র, অষ্টচন্দ্র, শোষা চর্ম দিলেন। ধনুবান দিলেন সূর্য, বিশ্বকর্মা অভেদ বর্ম, ব্রহ্মা দিলেন অক্ষমালা কমন্ডলু, কুবের রত্নহারা সকল দেবতা মহাদেবীকে নামা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ও বিবিধ প্রহরণে সুসজ্জিত করে। অসুর বিজয় যাত্রায় মেতে প্রার্থনা করলেন। রণদুদুম্ভি ধ্বনিতে বিশ্ব সংসার নির্মাদিত হতে লাগল। যাত্রার পূর্বে সুর-নরলোকবাসী সকলে দশপ্রহরণধারিণী দশভুজা মহাশক্তিকে ধ্যানমন্ত্রে করলেন অতিবন্দনা।

নমো দৈব্যৈ, মহাদৈব্যৈ শিবায় সততং নমঃ।
নমঃ প্রকৃতৈ ভদ্রায়ে নিয়তাঃ প্রণতা স্মাতাম॥
রৌদ্রায়ে নম নিত্যায়ে গৌর্যে ধাত্রৈ নমো নমঃ।
জ্যোৎস্নায়ে চেন্দুরূপিণ্যে সুখায়ে সততঃ নমঃ।
কল্যাণ্যে প্রণতা ব্রদ্ধৌ কুর্মো নমো নমঃ।
নৈঋত্য ভুভুতাং লক্ষ্যে শর্বান্যে তে নমো নমঃ॥
দুর্গায়ে দুর্গপারায়ে সারায়ে সর্বকারিণ্যে-
খ্যাত্যে যৈব কৃষ্ণয়ে ধুয়ে সততঃ নমঃ।
অতি যৌক্ষাতি রৌদ্রয়ে নতাস্তস্য নমো নমঃ।
নমো জগৎ প্রতিষ্ঠায় দৈব্যে কৃত্যে নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্বভুতেষু বিষ্ণু মায়েতি শতি।
নমস্ত স্যে নমস্তসে নমস্তসে নমো নমঃ
যা দেবী সর্বভুতেষু চৈতনেত্য ভিধয়িতে।
নমস্তস্যে নমস্তস্যে নমস্তসে নমো নমঃ॥

বাণী মহাবর অম্লান মনে
জননী গো নমি রাতুল চরণে,
পূজায় উল্লাসে ধরণী যে হাসে সুরভিত রাতে।

নমো চণ্ডী, নমো চণ্ডী, নমো চণ্ডী, জাগো রক্তবীজ নিকৃন্তিনী, জাগো মহিষাসুর বিমর্দিনী

উঠে শঙ্খমন্ত্রে অভ্রবক্ষ শঙ্কাশননে চণ্ডী।

এর খড়গশক্তি কৃতকৃান্ত শত্রু শাত্তন তন্ত্রী,
নত সিংহবাহিনী ঘন গুংকারে ইন্দ্রাদি চমুতন্দ্রী

তুমি রণ কম্র টাঙ্কার হানো খর কলম্ব জলে।

নাচো ধূমনেত্র সমুজমুণ্ড চক্রপাতনে খণ্ডী,
তব তাতার্থে তাতার্থে প্রলয় নৃত্য ধ্বংসে
বাঁধন গণ্ডী।

দেবীর সঙ্গে মহিষাসুরের প্রবল সংগ্রাম আরম্ভ হলো। দেবীর অস্ত্র প্রহারে দৈত্যসেনা ছিন্ন ভিন্ন হতে লাগল। মহিষাসুর ক্ষণে ক্ষণে রূপ পরিবর্তন করে নানা কৌশল বিস্তার করল। মহিষ হয়ে হস্তীরূপ ধারণ করলো। আবার সিংহরূপী দৈত্যের রণোন্মুত্তা দেবী প্রশমিত করলেন। পুনরায় নয়নবিমোহন পুরুষ বেশে আত্মপ্রকাশ করল ওই ঐন্দ্রজালিক। দেবীর রূঢ় প্রত্যাখ্যান পেয়ে আবার মহিষ মূর্তি গ্রহণ করলেন। রণবাদ্যে দিকে দিগন্তরে নিনাদিত। চতুরঙ্গ নিয়ে অসুরেশ্বর দেবীকে পরাজিত করবার মানসে উল্লসিত।

দেবীবাহন সিংহরাজ দাবাগ্নির মতো সমস্ত রণক্ষেত্র শত্রু নিধনে দুর্নিবার হয়ে উঠল। নানা প্রহরণধারিণী দেবী দুর্গা মধু পান করতে করতে করতে মহিষরূপকে সদম্ভে বললেন,

'গর্জ গর্জ ক্ষণং মূঢ় মধু বাকা
নিবামাহম্, ময়া ত্বয়ি হতৈছত্রেব
গর্জিষ্যান্ত্যাশু দেবতা।'

দেবতাগণ সানন্দে দেখলেন, দুর্গা মহিষাসুরকে শুলে বিদ্ধ করেছেন আর খড়গ নিপাতে দৈত্যের মস্তক ভূলুণ্ঠিত। তখন অসুরনাশিনী দেবী মহালক্ষ্মীর আরাধনা গীতি সুষমা দ্যাব্যা পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হলো।

মাগো, তব ধানে সঙ্গীত প্রেম ললিত,
নিখিল প্রাণের বীণা তারে তারে রণিত।
সকল রোদন সেই সুরে গেল মরিয়া,
কালি কালি যত জমছিল সুখসামিনী
উষার মুরতি ধরিয়া বাহির রাগিণী,
জীবন ছিল আলোক সুধায় ধরি তাই।

লেখক : সহ-সভাপতি ও আহবায়ক, অর্থ-কমিটি
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ

শারদীয় দুর্গাপূজা : সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চিরন্তন উৎসব

অধ্যাপক ড. অসীম সরকার

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ বাংলাদেশ। ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-আজহা, ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী, জন্মাষ্টমী, শারদীয় দুর্গোৎসব, বৌদ্ধপূর্ণিমা, বড়োদিন প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ কোনো বিশেষ ধর্মের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকে না, সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ ও উপস্থিতিতে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয় প্রতিটি ধর্মীয় উৎসব। জাতীয় চেতনায় এবং শান্তির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে ধর্ম যার যার উৎসব সবার এই স্লোগানকে সামনে রেখে সকল ধর্মের, সকল বর্ণের, সকল গোষ্ঠীর মানুষ সাড়ম্বরে পালন করে প্রতিটি ধর্মীয় উৎসব।

শারদীয় দুর্গোৎসব বাঙালি হিন্দুসম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। সমগ্র বাঙালির কাছে এ পূজা চিরায়ত ঐতিহ্য ও ধর্মীয় সংস্কৃতির মেলবন্ধনে এক অনুপম প্রীতিময় আনন্দ উৎসব। অশুভ ও অপশক্তির পরাজয় এবং শুভশক্তির জয়, সত্য ও সুন্দরের আরাধনায় সর্বজীবের মঙ্গলসাধন শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য। অশুভ ও আসুরিক শক্তি দমনের মাধ্যমে সমাজে ন্যায়বিচার, সত্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠা, সকল মানুষের সমধিকার নিশ্চিতকরণ, মানুষের মধ্যকার সকল প্রকার বৈষম্য বা ভেদাভেদ ও অন্যায়, অবিচার দূরীকরণ এবং অসত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, হানাহানিমুক্ত অসাম্প্রদায়িক মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ সমাজগঠন করার শিক্ষালাভই দুর্গোৎসবের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

শারদীয় দুর্গোৎসব সমাজকে অসহিষ্ণুতা, হিংসা, বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্ব সংঘাতের অশুভ প্রভাব থেকে মুক্ত করে মানুষের মধ্যে ঐক্য, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠা করে। ঐক্যবদ্ধ করে সমগ্র বাঙালিকে। এক মায়াবী বন্ধনে জড়িয়ে রাখে সমস্ত বাঙালিকে। উদ্বুদ্ধ করে ভ্রাতৃবোধ ও সম্প্রীতি চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হতে। সবার মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্যের বন্ধন সুদৃঢ় করে। দুর্গোৎসবের শুভ্র ও আনন্দ জাগানিয়া পরশ শুধুমাত্র বাঙালি হিন্দু ধর্মানুসারীদেরই নয়, এর চিরায়ত ঐকতান স্পর্শ করে প্রতিটি বাঙালির হৃদয়কে। দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে যে অনাবিল আনন্দ সবার মনের মাঝে জেগে ওঠে তা বাঙালির প্রতিটি গৃহকে আলোকিত করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মঙ্গল ও হিতকামনায়।

সকল ধর্মের মূল বাণী হচ্ছে সৃষ্টির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করা, সমগ্র জীবের কল্যাণ সাধনই ধর্মের মূল লক্ষ্য, কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের কল্যাণ সাধন নয়। এই চেতনাকে মনে-প্রাণে ধারণ করেই সকল মানুষের সুখ-শান্তি কামনায় এবং সর্বজীবের মঙ্গলার্থে আবহমান কাল ধরে বাঙালি হিন্দুসম্প্রদায় বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও উৎসবমুখর পরিবেশে নানা উপচার ও অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে পালন করে শারদীয় দুর্গোৎসব, আরাধনা করে দেবী দুর্গার। সকল প্রকার হীনতা, সংকীর্ণতা ও ধর্মান্ধতার উর্ধ্বে উঠে সকল প্রকার ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনগণ শারদীয় দুর্গোৎসব উদ্‌যাপন করে এবং আনন্দ উৎসবে অংশগ্রহণ করে। সকল বাঙালি মিলিত হয় অভিন্ন মোহনায়, অভিন্ন চেতনায়। পূজার ধর্মীয় অংশটুকু হিন্দুদের; কিন্তু মেলা, উৎসব ও আপ্যায়নে অংশগ্রহণ এবং আনন্দ উপভোগ করেন সবাই। সকলের অংশগ্রহণ ও উপস্থিতিতে শারদীয় দুর্গাপূজা পরিণত হয় সর্বজনীন উৎসবে, পরিণত হয় সর্বস্তরের মানুষের মিলনমেলায়, পরিণত হয় অন্যতম জাতীয় উৎসবে। ঐক্য ও সমন্বয়ের প্রতীক হিসেবে এ উৎসব পরিণত হয় সম্প্রীতিময় আনন্দযজ্ঞে। সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ে উৎসবের আবহ এবং ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হয় সকল মানুষের হৃদয়; দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয় ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। পূজা থেকে উৎসবে রূপান্তরের এই যে প্রক্রিয়া, এটি বাঙালি জাতির অসাম্প্রদায়িক সত্তার চিরন্তন বহিঃপ্রকাশ।

অতীত থেকেই দুর্গাপূজা উৎসবাকারে পালিত হয়ে আসছে সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে। সকলের মঙ্গল ও হিতকামনায়, এমন বৃহত্তম আয়োজন খুবই গুরুত্ব বহন করে। পূজার সময় মন্দিরে মন্দিরে ভক্তিমূলক গান, চণ্ডীপাঠ, অর্চনা, আরতি, ভক্তদের শ্রদ্ধার্ঘ্য এবং সেই সাথে কোলাকুলি, প্রণাম, আশীর্বাদ, মেলা ইত্যাদি দুর্গোৎসবকে ধর্মীয় আবেশে আনন্দঘন করে তোলে। দুর্গোৎসব মানুষে মানুষে মেলবন্ধন সৃষ্টি করে। সৃষ্টি করে মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রীতিময় ও কল্যাণময় সম্পর্ক। ধর্মীয় উৎসবের পাশাপাশি দুর্গাপূজা সর্বস্তরের জনগণের মাঝে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও ঐক্য সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দুর্গাপূজা সর্বজনীন উৎসব এটা শুধু কথার কথা নয় – পূজা বিধিতেও তা লক্ষ করা যায়। দেবী দুর্গা মৃণ্ময়ী প্রতিমায় সপরিবারে পূজ্যপাদ। দুর্গার সঙ্গে সিদ্ধিদাতা গণেশ, মহাবীর দেবসেনা কার্তিক, ঐশ্বর্যের দেবী লক্ষ্মী ও বিদ্যার দেবী সরস্বতী পূজিত হন। দেবাদিদেব মহাদেবের স্থান থাকে সবার উপরে। দুর্গা দেবীর সঙ্গে তাঁর বাহন সিংহ, গণেশের বাহন ইঁদুর, কার্তিকের বাহন ময়ূর, লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা, সরস্বতীর বাহন হংস, এমন কি মহিষাসুরও পূজিত হন। সকলে একত্রে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে। পূজার পর শুভ বিজয়া। বিজয়ায় অবাধ মিলন। সকল মানুষ একত্রে বিজয়ার উৎসব পালন করে। সকল বাধা ও মনের সংকীর্ণতা দূর করে অনৈক্য-বিভেদ, হিংসা-বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িক মনোভাব দূরে ঠেলে মানুষে মানুষে সমাবেশ ঘটে পূজার উৎসবস্থলে। সকলের সহাবস্থান আর ঐক্যের মেলায়

পরিণত হয় পূজার মন্দির। প্রকাশিত হয় বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনা। এ জন্যই শারদীয় দুর্গাপূজা সামাজিক সম্প্রীতি, মহামিলন এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনার চিরন্তন উৎসব। সম্প্রীতিবিধ্বংসী কোনো প্রচেষ্টা দুর্গাপূজার সর্বজনীনতাকে বিনষ্ট করতে পারবে না। বাঙালি জাতিসত্তার মর্মমূলে গ্রথিত ঐকতানের কাছে তা পরাভূত হবেই। আপামর জনতা দুর্গোৎসবে সামিল হয়ে উৎসবের আমেজে যে ঐক্যচেতনায় বাধা পড়ে তা ছিন্ন করার ক্ষমতা কারোর নেই। কোনো ঠুনকো আঘাতে এ বন্ধন কোনো দিন ছিন্ন হবে না।

দুর্গাপূজা যদিও ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা হিন্দুদের, কিন্তু মূলবাণী সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে নিবেদিত। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাঙালির হাজার বছরের অসাম্প্রদায়িক চেতনা দুর্গোৎসবে সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে এক সামাজিক বন্ধন ও অসাম্প্রদায়িক পরিচয় ফুটে ওঠে, ভ্রাতৃত্ববোধের এক নতুন আবহ তৈরি হয়। দেবীর যুদ্ধরতরূপ লোকশিক্ষার একটি দৃষ্টান্ত। এটি হচ্ছে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভ শক্তির যুদ্ধ, অন্যায়, অসত্য ও অনাচারের বিরুদ্ধে ন্যায়, সত্য ও সদাচারের সংগ্রাম। দেবীর বন্দনার প্রেক্ষাপট হলো অন্তরের আসুরিক শক্তির বিনাশ। দুর্গাপূজা হচ্ছে শক্তি অথবা ঐশ্বরিক শক্তির আরাধনা। দেবীর 'দশ হাত' ঐক্য বা সম্মিলিত শক্তির প্রতীক। ঐক্যবদ্ধভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার, অন্যায়কে প্রতিহত করার শিক্ষাই দেবীর প্রতিমা হতে শিক্ষণীয়। সুতরাং দুর্গাপূজা শক্তি, সংহতি বা ঐক্যের প্রতীক।

ধর্মীয় আচার যখন কোনো একটা জাতির জীবনে উৎসবের মর্যাদা প্রাপ্ত হয় তখন তা ধর্মীয় চেতনার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে হয়ে ওঠে অগ্রবর্তী সমাজ কাঠামোর ভিত্তিমূলের চলমান সোপান। বাঙালির জীবনে শারদীয় দুর্গোৎসব তেমনি এক বহমান অসাম্প্রদায়িক চেতনসত্তার প্রতিরূপ। যেখানে থাকে না কোনো জাত-পাতের বাছ-বিচার, থাকে না কোনো ভেদাভেদ, থাকে না সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প। বাঙালি যে অসাম্প্রদায়িক জাতি হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে তা প্রতিবছরই প্রমাণিত হয় দুর্গোৎসবের মধ্য দিয়ে। এ কারণেই দুর্গোৎসব হচ্ছে সম্প্রীতির আর বাঙালির আনন্দ উচ্ছ্বাস উদ্‌যাপনের উৎসব– এক মহামিলনধর্মী সত্যিকার অসাম্প্রদায়িক উৎসব।

লেখক : অধ্যাপক ও সাবেক চেয়ারম্যান, সংস্কৃত বিভাগ;
ট্রাস্টি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট;
উপদেষ্টা, শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্র;
সাবেক প্রাধ্যক্ষ, জগন্নাথ হল;
সিনেট সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রী শ্রী দুর্গাপূজা

পন্ডিত শ্রী দেবেশ চন্দ্র (সান্যাল) গোস্বামী

ওঁ সর্ব্ব-মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ-সাধিকে।
শরণ্যেত্র্যম্বকে গৌরি নারায়নি নমোহস্তুতে।।

আমাদের ধর্মের নাম সনাতন ধর্ম। আমরা সনাতন ধর্মাবলম্বী। আমাদের পূর্ব পুরুষগণের কিছু মানুষ সিন্ধু নদীর নিকটবর্তী স্থানে বসবাস করতেন। তাই সারা বিশের কাছে প্রচলিত ভাষায় আমরা হিন্দু হিসাবে পরিচিত। শ্রী শ্রী দুর্গা পূজা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জগন্মাতা বিষ্ণু শক্তি স্বরুপিনী মা মহামায়ার শক্তি পূজা। বছরে দুই বার মা মহামায়ার অর্চনা করা হয়। বসন্ত কালে বাসন্তী পূজা আর শরৎ কালে শ্রী শ্রী দুর্গা পূজা। শরৎ কালের দুর্গা পূজাকে আমরা সনাতন ধর্মাবলম্বীরা শারদীয় দুর্গোৎসব হিসেবে উদযাপন করে থাকি। শ্রী শ্রী দুর্গাদেবী দুর্গম নামক অসুরকে বধ করে ছিলেন। মা মহামায়া জীবনের দুর্গতি নাশ করেন বলেও তাঁকে দুর্গা (দুর্গতি নাশিনী) বলা হয়। যে শক্তিদৈত্য, বিঘ্ন, রোগ, পাপ, ভয় ও শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেন তিনিই দুর্গা, বসন্ত কালে অনুষ্ঠিত দুর্গা পূজা বাসন্তী পূজা নামে অভিহিত। ত্রেতা যুগে ভগবান শ্রী রামচন্দ্র ব্রহ্মার পরামর্শে রাবণকে বধ করার জন্য দক্ষিনায়ন কালে দেবী দুর্গার পূজা করেন। সেই থেকে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা শরৎ কালে শ্রী শ্রী দুর্গা পূজা করে থাকেন। উত্তরায়নের কাল দেব/দেবীর জাগরই কাল। দক্ষিনায়ন কাল দেব/দেবীর নিদ্রা কাল। মাঘ হইতে আষাঢ় মাস পর্যন্ত ছয় মাস উত্তরায়ন এবং শ্রাবন হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ৬ মাস দক্ষিনায়ন কাল। শ্রী শ্রী দুর্গা পূজা দুর্গতি নাশিনী মা মহামায়ার শক্তি পূজা-অর্চনা। দক্ষিনায়ন কালে শরৎ কালে শ্রী শ্রী দুর্গা পূজার জন্য পূজার পূর্বদিন সায়ংকালে বোধন করে মাকে জাগ্রত করে নিতে হয়। দুর্গা পূজা বৈদিক পূজা। মাকে জাগ্রত করার মন্ত্রে আছে" রাবনস্য বধার্থায়..., অকালে ব্রহ্মনা বোধো দেব্যস্তয়ি...। ভগবান শ্রী রামচন্দ্র রাবন বধের জন্য অকালে দুর্গা পূজা করে ছিলেন। দেবতাদের স্তব/স্তুতিতে মা দুর্গা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপে আবির্ভূত হয়ে তাঁদের রক্ষা করেছেন। আমরা মহিষ মর্দ্দিনী রুপের পূজা করে থাকি। স্তুতিতে আছে- " প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গাক্ষর দ্বয়ম। আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা।" দুর্গা পূজা করলে মনোস্কামনা পূরণ ও সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়।

সাত্ত্বিক ভাবে দুর্গা পূজা করতে হয়। বৈদিক রীতি অনুসারে পূজার্চ্চনা, স্তব, ভূতি, দেবী যুক্ত, দেবী মাহাত্ম্য শ্রী শ্রী চন্ডী পাঠও অন্যান্য কাজ করতে হয়। দেবত্ব, ধর্ম, সত্য, সাত্ত্বিকতা ও অন্যান্য সব বাঁচিয়ে রাখতে হলে চাই শক্তি। সে শক্তি আসে সর্ব্ব শক্তির আধার দুর্গা দেবী থেকে। মহর্ষি মার্কন্ডেয় এই পুরানের বক্তা এবং ক্রৌষ্টকি ভাগুরি হলেন শ্রোতা। শ্রী শ্রী চন্ডী মার্কন্ডেয়-পুরান অন্তর্গত। এই শ্রী গ্রন্থে ১৩ টি অধ্যায়-৭০০ টি মন্ত্র ও ৫৭৮টি শ্লোক আছে। এক সময়ে রাজ্য হারা হয়ে চৈত্র বংশের রাজা সুরথ ও স্ত্রী, পুত্রাদি দ্বারা বিতারিত হয়ে ধণী বৈশ্য সমাধি একটি তপোবনে আশ্রয় নিলেন। মায়ার কারণে রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি রাজ্যের প্রজা ও অন্যান্যদের জন্য চিন্তিত। দুই জনে পরামর্শ করে ঐ তপোবনে সাধনা রত মুনি মেধার নিকটে গেলেন। তাঁরা মুনি বরের কাছে এই মায়ার কারণ জানতে চাইলেন। মেধা মুনি তাঁদের দু'জন কে বললেন- এ সব হচ্ছে মা মহামায়ার মায়া। পূজা-অর্চনা আরাধনা/তপস্যা করে মা মহামায়াকে তুষ্ট করতে পারলে তিনি মায়ার পর্দা সরিয়ে নিবেন। মেধা মুনি বললেন- একবার সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার স্তবে তুষ্ট হয়ে দেবী দুর্গা আবির্ভুত হয়ে নিদ্রারুপিণী দেবী ভগবতী যোগমায়া রূপী শ্রী শ্রী দুর্গা মধু ও কৈটভ দুই অসুর কে বধ করে ছিলেন। আর একবার দেবতাদের স্তবে তুষ্ট হয়ে দেবী মহিষা সুর সৈন্যদের বধ করে ছিলেন। আর একবার দেবতাদের স্তবে তুষ্ট হয়ে দেবী মহিষা সুর কে বধ করে ছিলেন। আর একবার দেবতাদের স্তবে তুষ্ট হয়ে শুম্ভ ও নিশুম্ভ দুই অসুর ভাই কে বধ করে ছিলেন। আর একবার দেবতাদের স্তবে তুষ্ট হয়ে অসুর ধুম্রলোচনকে বধ করে ছিলেন। আর একবার দেবতাদের স্তবে তুষ্ট হয়ে শুম্ভ নিশুম্ভের দুই সেনাপতি চন্ড ও মুন্ড কে বধ করে ছিলেন। আর একবার দেবতাদের স্তবে তুষ্ট হয়ে অসুর রক্ত বীজ কে বধ করে ছিলেন। আর একবার দেবতাদের স্তবে তুষ্ট হয়ে অসুরনিশুম্ভ কে বধ করে ছিলেন। আর একবার দেবতাদের স্তবে তুষ্ট হয়ে অসুর শুম্ভকে বধ করে ছিলেন। দেবীর কৃপা লাভের পর দেবতারা দেবীর স্তব মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে ছিলেন। ঋষি মেধা রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধির কাছে এই ভাবে দেবীর মাহাত্ম্য ও আবির্ভাবের কথা বললেন। সেই দেবী বিষ্ণু মায়া ও মহা মায়ার প্রভাবেই সারা বিশ্ব ব্রহ্মান্ড চলছে। তাঁর দয়াতেই তত্ত্ব জ্ঞান লাভ হয়। তাঁর দয়াতেই সুখ-ভোগ, স্বর্গ, মুক্তি লাভ হয়। শ্রী শ্রী দুর্গা দেবীর মাহাতম্য কথা শ্রবণ করে রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি নদীর তীরে বসে মৃন্ময়ী প্রতিমা তৈরী করে দেবী সুক্ত জপ ও অন্যান্য রীতি পদ্ধতি অনুসারে শ্রী শ্রী দুর্গা দেবীর আরাধনা/তপস্যা করলেন। তিন বছর তপস্যার পর তাদের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে দেবী দুর্গা তাদের সম্মুখে আবির্ভুত হলেন। শ্রী শ্রী দুর্গা দেবী তাঁদের কে বর চাইতে বললেন। রাজা সুরথ ইহ জন্মে নিজের শক্তি দ্বারা শত্রু সৈন্য বিনাশ করিয়া তাঁর হারানো রাজ্য ফিরে পাওয়ার ও পর

জন্মে অক্ষয় রাজ্য পাওয়ার বর চাইলেন। সমাধি বৈশ্যের আর সংসারে দিকে আকর্ষণ ছিল না। তিনি চাইলেন পরম জ্ঞান, আমি ও আমার অভিমান নাশ তত্ত্বজ্ঞান, ব্রহ্ম জ্ঞান ও মুক্তি। যাতে সংসারের সব কিছুর মায়া কেটে যায়। শ্রী শ্রী দুর্গা দেবী বললেন-"তথাস্তু"। মায়ের কৃপায় তাঁদের মনো বাসনা পূর্ণ হলো। মানুষেরা যদি ভক্তিভরে দেবী দুর্গা আরাধনা করে তখন মা তাদের দুর্গতি নাশ করেন। দুর্গতি নাশিনী বলে তাঁর নাম দুর্গা। নিত্য বর্তমান রূপী শ্রী শ্রী দুর্গা দেবী সপরিবারে স্বামী শিবের সাথে কৈলাশে থাকেন। প্রথম পুজা অর্থাৎ সপ্তমী পুজার পূর্ব সায়ংকালে দেবীর বোধন, আমন্ত্রন ও অধিবাস করা হয়। কল্পারম্ভ দিনে মা (সপ্তমী পুজার দিন) পুত্র কন্যাসহ পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। মৃন্ময়ী মুর্তিকে বৈদিক মন্ত্রে প্রান প্রতিষ্ঠা করে চিন্ময়ী করা হয়। দেবী মাহাতম্য শ্রী শ্রী চণ্ডী গ্রন্থে মা মহামায়া বলেছেন- তয়াস্মাকংবরো দত্তো যথাপৎসু স্মৃতা খিলাঃ। ভবতাং নাময়িষ্যামি তৎক্ষনাৎ পরমা পদঃ।। (শ্রী শ্রী চণ্ডী ৫/৬)

অর্থাৎ- তোমরা আমাকে বিপদকালে স্মরণ করলেই আমি তৎক্ষণাৎ তোমাদের বিপদ সমূহ বিনাশ করব।

মায়ের নিজ মুখে অঙ্গীকার করা আছে। তিনি দেবতা ও আমাদের রক্ষা করবেন। আমাদের কর্তব্য হলো মায়ের পুজা-অর্চনা করা এবং মায়ের শরণাগত হয়ে থাকা। শ্রী শ্রী মা দুর্গা যুগে যুগে বিভিন্ন বিপদে স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে দেবতা ও মানুষদের রক্ষা করেছেন। তিনি বিপদ নাশিনী। সবাইকে বিশ্বাস রাখতে হবে যে প্রয়োজনের সময়ে শ্রী শ্রী দুর্গা দেবী আমাদের সকল বিপদ হতে রক্ষা করবেন।

।। ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ।।

পন্ডিত শ্রী দেবেশ চন্দ্র (সান্যাল) গোস্বামী
সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার
রতনকান্দি গ্রামের অধিবাসী।

দশভুজা দেবী দুর্গা

ড. কালিদাস ভক্ত

জগৎ মাঝে যখন খুব খারাপ অবস্থা বিরাজ করে, অশুভ শক্তির কাছে শুভ শক্তি পরাস্ত, সমাজে বিরাজ করে চরম বিশৃঙ্খলা, তখন দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনের জন্য সমস্ত অশান্তি অরাজকতা বিদূরীভূত করতে, শান্তির আবাস নির্মাণ করার জন্য দেবী মহামায়া আবির্ভূত হয়েছেন। শ্রীশ্রী চণ্ডীতে উক্ত রয়েছে – মহিষাসুর চরম সাধনায় ব্রহ্মাকে তৃপ্ত করে তাঁর কাছ থেকে বর লাভ করেছিলেন, কোনো পুরুষ তাকে বধ করতে পারবে না। ব্রহ্মার এই বরে বলীয়ান হয়ে মহিষাসুর দেবতাদের পরাজিত করে স্বর্গরাজ্য দখল করে। দেবতারা স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হন। স্বর্গরাজ ইন্দ্র সকল দেবতাদের একত্রিত করে ব্রহ্মা ও শিবের কাছে যান। তখন ব্রহ্মার পরামর্শে সবাই মিলে বিষ্ণুর কাছে যান। মহিষাসুরের অত্যাচারের কাহিনি শুনে সবাই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। তাঁদের শরীর থেকে তেজ বেরুতে থাকে। সকল দেবতাদের তেজ একত্রিত হয়ে এক তেজোপুঞ্জের সৃষ্টি হয়। সেই তেজোপুঞ্জ এক নারীর রূপ নেয়। এই নারীই দেবী দুর্গা। তাঁর দশ হাত রয়েছে বলেই তাঁকে দশভুজা বলা হয়। তাঁর তিনটি চোখ, এজন্য তাঁকে ত্রিনয়নী বলা হয়। তাঁর বাম চোখ চন্দ্র, ডান চোখ সূর্য এবং কপালের উপর অবস্থিত চোখকে জ্ঞান চোখ বলা হয়। তাঁর হাতে দশটি অস্ত্র রয়েছে যা শক্তির প্রতীক। সবচেয়ে শক্তিধর প্রাণী সিংহ তাঁর বাহন। দেবী হিসেবে দুর্গার গায়ের রং অতসী ফুলের মতো সোনালী হলুদ। তিনি তাঁর দশ হাত দিয়ে দশ দিক থেকে অকল্যাণ দূর করেন এবং আমাদের মঙ্গল করেন। দেবী দুর্গার ডানদিকের পাঁচ হাতের অস্ত্রগুলো যথাক্রমে ত্রিশূল, খড়গ, চক্র, বাণ ও শক্তি নামক অস্ত্র। বামদিকের পাঁচ হাতের অস্ত্রগুলো যথাক্রমে শঙ্খ, ঢাল, ঘণ্টা, অঙ্কুশ ও পাশ। এ সকল অস্ত্র দেবী দুর্গার অসীম শক্তি ও গুণের প্রতীক। আবার জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে দশ হাত হলো দশদিকের প্রতিভূ। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঈশান, বায়ু, অগ্নি, নৈঋত, উর্ধ, অধঃ – এই দশদিক থেকে মহিষাসুরকে বধ করার জন্য দেবী দুর্গার দশটি হাত সৃষ্টি হয়। এই দশদিককে দশপ্রহরণী বলা হয়। দশপ্রহরণ নিয়ে মহিষাসুরকে আক্রমণ করেছেন। তবে লোকমুখে প্রচলিত মানব জাতির অশুভশক্তি বিনাশের জন্য দেবীকে দশ প্রহরণধারিণী বলা হয়। মূলত ভক্তগণ শক্তি পাবার মানসে সেই সাথে জাগতিক ও পারমার্থিক কল্যাণলাভের জন্য দেবী দুর্গার আরাধনায় রত হয়ে থাকেন। দেবীর আরাধনা ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত হয়ে আসছে। তবে বঙ্গদেশে এর প্রসার ও প্রচার সর্বাধিকভাবে পরিলক্ষিত হয়। গবেষকদের মতে সম্রাট আকবরের সময়ে ষোড়শ শতকের শেষের দিকে বর্তমান রূপের শারদীয় দুর্গাপূজা প্রচলিত হয়। বাংলায় দুর্গা পূজা সুচিত হয় উত্তরবঙ্গের রাজশাহী অঞ্চলের রাজা কংসনারায়ণের সময়ে। এ পূজা প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রমেশ শাস্ত্রী রাজাকে বলেছেন – 'কলির যুগে মহাযজ্ঞ হচ্ছে দুর্গোৎসব। এ অনুষ্ঠানে সকল যজ্ঞের ফল লাভ হয়। তাই আপনি দুর্গা পূজা করুন।' সর্ব প্রাচীন গ্রন্থ বেদ থেকে শুরু করে বিখ্যাত গ্রন্থে দেবী দুর্গার উল্লেখ আছে। রামায়ণে রামচন্দ্র ১০৮টি নীলপদ্ম দিয়ে দুর্গা দেবীর পূজার আয়োজন করেছিলেন এবং মহাভারতের ভীষ্ম পর্বে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধারম্ভের পূর্বে জয়ের জন্য দুর্গাপূজার উপদেশ দিয়েছিলেন। সর্ব প্রথমে বসন্তকালে বাসন্তী দুর্গাপূজা হতো। রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য বসন্তকালে দুর্গাপূজা করেছিলেন। তাঁদের পূজা করার পেছনের কাহিনি হলো – রাজা সুরথ রাজ্য হারিয়ে বনে বনে ঘুরছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি এলেন মেধা নামে এক মহর্ষির আশ্রমে। অন্যদিকে সমাধি নামে এক বৈশ্য স্ত্রী ও সন্তানদের আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। তিনিও ঘুরতে ঘুরতে আসেন মেধা মুনির আশ্রমে। আশ্রমে এসেও হারানো রাজ্যের জন্য রাজা সুরথের মনে মায়া কাজ করেছিল। আবার সমাধি বৈশ্যও তার স্ত্রী-পুত্রদের ভুলতে পারছিলেন না। কেন এই অন্তরের আকর্ষণ! রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্যের দেখা হলো। দুজন দুজনের কাছে মনের কথা ব্যক্ত করলেন। তারপর গেলেন মহর্ষি মেধার কাছে। গিয়ে জানালেন নিজেদের অন্তরের কথা। মহর্ষি মেধা বললেন যে, এর নাম মায়া। আর এ মায়া হচ্ছে মহামায়ার প্রভাব। তবে মহামায়া সন্তুষ্ট হলে তিনি কৃপা করেন এবং মুক্তি দান করেন। মহর্ষি মেধা মহামায়ার মাহাত্ম্য রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্যের কাছে বর্ণনা করলে দেবীর কৃপায় তাদের জাগতিক ও মানসিক অশান্তি দূরীভূত হয়। মহামায়া দুর্গারূপে দুর্ধর্ষ অসুররাজ মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন। অসুরদের অত্যাচার হতে দেবগণ মুক্ত হলেন, ফিরে পেলেন তাঁদের প্রিয় স্বর্গ রাজ্য। অপরদিকে দেবী দুর্গার আবাহনের মধ্য দিয়ে ধরামাঝে নারীর শক্তি প্রকাশ পায়। বিভিন্ন মনীষীরা দুর্গা রূপেই নারীকে কল্পনার কথা বলেছেন। তাঁর পূজার মাধ্যমে নারীর ভূমিকাকে আরো বড় করে দেখানো হয়েছে। দেবী দুর্গাকে জগজ্জননী রূপে বন্দনা করার মাধ্যমে নারীকেও মাতৃরূপে রূপায়িত করা হয়েছে। দুর্গা মহিষাসুর বধকারী হিসেবে মহাশক্তি

দিয়ে অপশক্তি অপসারিত করেছেন। এমনিভাবে দেবী দুর্গা সৃষ্টির প্রতীক, সমৃদ্ধির প্রতীক, সুরক্ষার প্রতীক। নারীও মাতৃরূপে সৃষ্টির প্রতীক, সন্তান জন্ম দিয়ে সন্তানের মুখে আহার তুলে দিয়ে, সন্তানকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেন। মহামহিমাময় নারী জগৎ সংসারে ভালোবাসা দিয়ে, প্রেরণা দিয়ে, শক্তি দিয়ে বিজয়ী করার জন্য দশহাত দিয়ে কাজ করছেন এবং পরিত্রাণ করছেন। এই মাতৃসম নারী যেন বঞ্চনার শিকার না হন। সেই সাথে খারাপ প্রবৃত্তির আক্রোশে শিকার হয়ে নারীরা যেন কলঙ্কিত না হন। সবাই মিলে মহৎতম গুণ দিয়ে ধরাকে আনন্দ ধাম করতে হবে। দেবী দুর্গার অবাহন হোক অশুভ শুক্তির বিরুদ্ধে শুভ শক্তির প্রকাশ। বৈশ্বিক দুর্যোগ থেকে পরিত্রাণের পন্থাধারী। শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিপালনের মমতারূপী। অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের প্রকাশ। সাম্প্রদ্রায়িকতার বিরুদ্ধে অসাম্প্রদায়িকতার মেলবন্ধন। আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে উদার ধারণার উন্মেষ। অসুরশক্তির বিরুদ্ধে সুরশক্তির জয়গান। দুঃখ-কষ্ট থেকে আনন্দের প্রকাশ। যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে শান্তির বার্তা সূচিত হোক। সর্বশেষে মায়ের কাছে ভক্তকান্ত গীতিকবির প্রার্থনায় বলতে হয় – 'জাগো তুমি জাগো... জাগো দুর্গা! জাগো দশপ্রহরণধারিণী! অভয়াশক্তি বলপ্রদায়িণী তুমি জাগো!'

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রী শ্রী দুর্গা

প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস

ঈশ্বরের শক্তিরূপের প্রকাশ শ্রীশ্রীদুর্গায়। দুর্গা দুর্গতি নাশেরও দেবী। শ্রীদুর্গার গায়ের রং অতশী ফুলের মত। পূর্ণিমার চাঁদের মত সুন্দর তাঁর মুখমণ্ডল। তাঁর তিনটি চোখ, একটি চোখ কপালের মাঝখানে, এ জন্য দুর্গাকে ত্রিনয়নী বলা হয়। দেবীর দশটি হাত বিধায় নাম তাঁর দশভূজা, যুদ্ধে দেবী প্রথমে দুর্গম নামক এক অসুরকে বধ করেছিলেন, এ ছাড়া মহিষাসুর ও অসুরকুলের ছোট বড় অসংখ্য অসুর বধ হয়েছিল তাঁর হাতে। বিশ্বের সকল শক্তির মিলিতরূপ শ্রীদুর্গা। ঈশ্বরের মাতৃরূপরেও প্রকাশ দুর্গার মধ্যে তাই মর্তের লোকেরা মাতৃরূপেই বেশি পূজা করেন। শ্রীদুর্গা মায়ের পূজা বছরে দুবার হয়ে থাকে। শরৎকালের দুর্গাপূজাকে শারদীয় দুর্গাপূজা এবং বসন্তকালের দুর্গা পূজাকে বাসন্তী পূজা বলে। আশ্বিন মাসের শুক্লা সপ্তমীতে ত্রেতাযুগের অবতার রামচন্দ্র সীতা দেবীকে উদ্ধারের জন্য তাঁর অভিষ্টি পূরণের লক্ষ্যে দুর্গাপূজা করেন। সত্যযুগে চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে রাজা সুরথ তার হৃত রাজ্য ফিরে পাবার জন্য দুর্গাপূজা করেন। শারদীয় দুর্গামায়ের পূজাই আমাদের মর্তের লোকেরা সাড়ম্বরে করে থাকেন। দুর্গাপূজা বাঙালি হিন্দুদের সবচেয়ে বৃহৎ উৎসব। এ পূজায় শুধু দুর্গাকে নয় দুর্গার সাথে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, অসুর এবং নবপত্রিকা অর্থাৎ প্রকৃতির সকল উদ্ভিদের প্রতিনিধি হিসেবে নবপত্রিকা বা কলাবৌ এর পূজা হয়ে থাকে।

দুর্গার বর্ণনায় তাঁর প্রয়োজন পড়ে প্রথম দেবতাদের। অসুররা দেবতাদেরকে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করলে তাদের হৃত স্বর্গ পুনরুদ্ধার করতে ঈশ্বরের যে শক্তির প্রকাশ ঘটাতে হয়েছিল সে শক্তিরূপই দুর্গা। দুর্গার দশটি হাতে দশটি অস্ত্র আর বাহন সিংহ। তাঁর কৃপা হলে জীব সকল দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পায়।

দেবী দুর্গা যখন আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হন তখন তিনি একা আসেন না। পুত্রকন্যাস্বরূপ চার শক্তিকে নিয়েই আসেন। দেবীর এ প্রতিমা দর্শনে লব্ধ জ্ঞানই রাষ্ট্রীয় জ্ঞান বা রাষ্ট্র বিজ্ঞান। বস্তুত দুর্গা প্রতিমাই জাতীয় প্রতিমা। দেবী পূজায় সমাজের সকল স্তরের লোককেই প্রয়োজন। হাত কর্মের প্রতীক। আলস্য, নিদ্রা, তন্দ্রা, জড়তা, নির্বীর্যতার মহাপাপ দূরীভূত করে জাতির মধ্যে সর্বতঃপ্রসারী কর্মশক্তি জাগিয়ে তোলার জন্যই তিনি দশভূজা। দশে মিলে কাজ করার, কল্যাণ করার, সুন্দর সমাজ গড়ার কাজ নিয়েছেন বলেই তিনি দশভূজা। জাতির সকল প্রকার অশুভ বিনাশ করার জন্যই তিনি হলেন দশ প্রহরণধারিণী।

সিংহ কেন তাঁর বাহন?

পুরাণ থেকে জানা যায় দেবীর বাহন রূপে সিংহকে দান করেছিলেন গিরিরাজ হিমালয়। কেননা অসুরদের নিধনে সহায়ক সিংহই সবচেয়ে বেশি। দেবীর বাহ্য লক্ষণের সাথে মিলিয়ে দেখলে বুঝা যায় সিংহ বাহন কতটুকু যুক্তিযুক্ত। দেবী নিখিল বিশ্বের সম্রাজ্ঞী, আর সিংহ পশুরাজ্যের সম্রাট। দেবী অস্ত্রধারিণী, সিংহও দন্ত নখরধারী। দেবী জটাজুট সমাযুক্ত, সিংহ কেশরী, অর্থাৎ হিংস্রতায় দুজনেই সমযাত্রী।

আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে শিক্ষা নিলে দেখা যায় সিংহ হিংস্রতায় পূর্ণ হয়েও দেবীর পদতলে নিত্য শরণাগতে কত অবিচল। জীবন মাত্রই পশু। এ পশুত্ব থেকে মুক্ত হয়ে দেবত্বে উন্নীত হওয়া প্রতিটি জীবের আকাঙ্ক্ষা। তাই আমাদের উচিত মাতৃচরণে শরণাগত হওয়া। মায়ের লক্ষ্য জনকল্যাণ, সত্ত্বগুণময়ী মা রজোগুণময় সিংহকে বাহন নিয়ন্ত্রণ করে লোক স্থিতি রক্ষা করছেন। রজোগুণের সঙ্গে তমোগুণের সমন্বয় হলে হবে লোকের অকল্যাণ তাতে আসুরিকতা ও পাশবিকতার হবে জয়। এ পাশবিকতা ও আসুরিকতার সংহার করে, উচ্ছেদ করে লোকস্থিতি ও সমাজ কল্যাণকর কাজ সমাধা করতে চাই রজোগুণাত্মক শক্তির সহয়তা। দেবী সে শিক্ষাই এখানে দিয়েছেন আমরা তার শরণাগত হই।

দেবী দুর্গার প্রণামমন্ত্র :

"ওঁ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তুতে॥"

লেখক : উপ-পরিচালক
হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

সনাতনীদের প্রতিমা পূজা : স্বামীজীর ব্যাখ্যা

বিমল কুমার সাহা

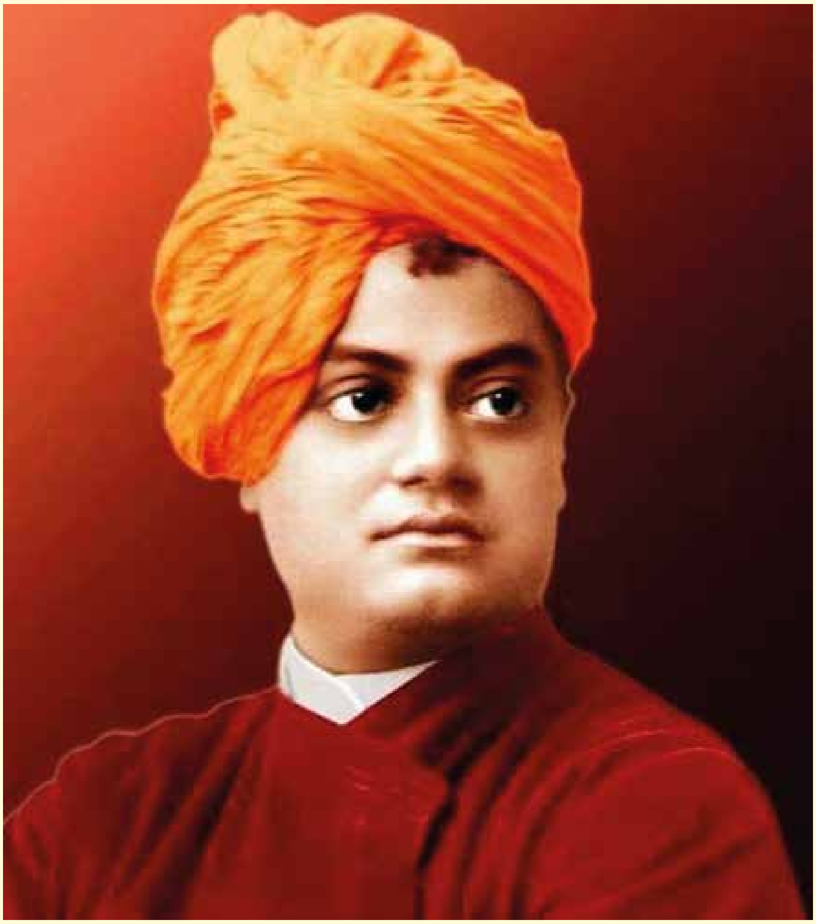

মানবসৃষ্টির আদিকাল থেকে যে ধর্মের অস্তিত্ব পাওয়া যায় তা সনাতন ধর্ম। এ ধর্মের অনুসারীরা আদিকাল থেকেই মূর্তি তথা প্রতিমা পূজা করে আসছেন। কিন্তু কেন? এর দর্শন কি? এ নিয়ে এ দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বন্ধু-বান্ধব, পড়শী, সহকর্মী, সহপাঠী পর্যায়ের লোকজনের যেমন প্রশ্নের শেষ নেই-- তেমনি সনাতন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যেও অনেকের এর দর্শন সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান না থাকায়, যে যার মতো করে এর ব্যাখ্যা দেন। স্বামী বিবেকানন্দও তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনে একদিন স্ব-সম্প্রদায়ের এক মহাপরাক্রমশালী মহারাজের নিকট থেকে প্রতিমা পূজা তথা মূর্তি পূজা নিয়ে বিব্রতকর প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে ঘটনক্রমে তিনি যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তা এ বিষয়ের যথাযথ ব্যাখ্যা হিসেবে নিচে তুলে ধরা হলো:

সময়টা ১৮৯১ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। সে সময় তিনি ভারতবর্ষের রাজস্থানের আলোয়ার নামক পরগনার মহারাজ মঙ্গলসিংহ-এর দেওয়ানজীর আশ্রয়ে থেকে তার বৈঠকখানায় প্রতিদিন ধর্মসভা করতেন। দূর দুরান্ত থেকে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহুলোক সেই ধর্মসভায় আসতেন। ধর্মীয় বিষয়ে স্বামীজীকে প্রশ্ন করে স্বামীজীর উত্তর শুনতেন। ইতোমধ্যে তিনি একজন সর্বজনীন জ্ঞানী সন্যাসী হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছেন। লোকমুখে স্বামীজীর প্রসংশা শুনে একদিন মহারাজ স্বয়ং সেই বৈঠকখানায় উপস্থিত হলেন। তিনি ব্রিটিশপন্থী ছিলেন। ব্রিটিশ প্রশাসনের সাথে তার সখ্যতা থাকার কারণে সমসাময়িকদের তুলনায় তিনি মহাপরাক্রমশালী জমিদার হিসেবে পরিচিত ছিলেন। মহারাজ স্বামীজীকে সরাসরি প্রশ্ন করেন, 'আচ্ছা স্বামীজী, আপনি তো মহাপণ্ডিত। আমি অন্যান্যদের মতো মাটি, ইট, কাঠ বা ধাতুর তৈরি মূর্তিপূজা করিনা। আমার ওতে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। আমার কি গতি হবে?'

মহারাজে প্রশ্নে যে বিদ্রুপ ছিল, তা বুঝতে পেরেও স্বামীজী তাঁকে বললেন, 'যার যেমন বিশ্বাস।' এরপর স্বামীজী বৈঠকখানা ঘরের দেয়ালে টাংগিয়ে রাখা ছবিটি দেখিয়ে দেওয়ানজীকে প্রশ্ন করলেন, 'ছবিটি কার?' দেওয়ানজী উত্তর দিলেন, 'আমাদের মহারাজের।' এবার স্বামীজী এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলেন। দেওয়ানজীকে স্বামীজী আদেশের সুরে ছবিটির উপর থুথু ফেলতে বললেন। মহারাজের উপস্থিতিতে স্বামীজির এই অদ্ভুত কাণ্ডে সকলেই হতভম্ভ। মহারাজ নির্বিকার। কিন্তু স্বামীজী কোনদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ না করেই দেওয়ানজীকে ওই ছবিটির উপর থুথু ফেলার কথা বলেই চলেছেন। এবার দেওয়ানজী বললেন, 'এ কি কথা বলছেন স্বামীজী? এ-যে আমাদের মহারাজের ছবি।' স্বামীজী নির্লিপ্তভাবে বললেন, 'তাতে কি? এ-তো একটা ছবি মাত্র। এ-তো রক্তে মাংসে গড়া মহারাজ স্বয়ং নন। এটা তো মহারাজের মতো নড়েও না-চড়েও না। মহারাজের মতো কথাও কয় না।' এবার দেওয়ানজী বললেন, এটা ছবি হলেও, এটা আমাদের মহারাজেরই প্রতিকৃতি। এতে থুথু ফেললে, প্রকারান্তে মহারাজের উপরই থুথু ফেলা হবে। এতে আমাদের প্রভুরই অপমান হবে। আমি এই গর্হিত কাজ কিছুতেই করতে পারব না। এবার

স্বামীজী স্মীতহাস্যে মহারাজকে বললেন, ' দেখুন মহারাজ, ছবিটি রক্ত-মাংসে গড়া জীবন্ত আপনি স্বয়ং না হলেও, আপনার একান্ত অনুরাগী কর্মচারী আপনাকে স্বয়ং যে-সম্মান করেন, আপনার ছবিকে আপনার প্রতিকৃতি মান্য করে ঠিক তেমনই সম্মান করেন। ঠিক তেমনি, যারা মাটির, ইট, কাঠ বা ধাতুর তৈরি মূর্তি তথা প্রতিমা পূজা করেন, তারা কখনোই মাটি, ইট, কাঠ বা ধাতুর পূজা করেন না, তারা কখনোই বলেন না যে, হে মাটি/হে ইট/হে কাঠ/হে ধাতু আমরা তোমার পূজা করছি, তুমি আমাদের কৃপা কর।' বরং তারা মাটি/ইট/কাঠ/ধাতুর তৈরি মূর্তি তথা প্রতিমার মাধ্যমে তাদের ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করে মূলত ভগবানকেই পূজা করেন। এরা মাটি/ইট/কাঠ/ধাতুর তৈরি মূর্তি তথা প্রতিমার সামনে এই বলে প্রার্থনা করেন যে, হে ভগবান, আমরা তোমার পূজা করছি, তুমি আমাদের কৃপা কর।'

এরপর মহারাজ অনুতপ্ত হয়ে স্বামীজীকে বললেন, 'মূর্তি তথা প্রতিমা পূজার পেছনে এমন মহান দর্শন আছে-আমি ইতিপূর্বে কখনও শুনিনি। আমি এতদিন ভুল ধারণায় আচ্ছন্ন ছিলাম। এবার মহারাজ স্বামীজীর নিকট এসে তার পা জড়িয়ে ধরে ক্ষমা চাইলেন এবং সত্যি সত্যি তার গতি কি হবে, সেইমর্মে পরামর্শ চাইলেন। স্বামীজী মহারাজকে ভগবানের নিকট ক্ষমা চেয়ে, ভগবানের কৃপা প্রার্থনার পরামর্শ দিলেন।

ঈশ্বর তথা ভগবানের সৃষ্ট এই মহাজগতের যেমন কোন আদি-অন্ত নেই, তেমনি ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝার বিষয়টিও আদি-অন্তহীন। তাই মানুষ ধর্মকে আশ্রয় করে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার প্রয়াস করে। কিন্তু এক্ষেত্রে সমস্যা এই যে, জগতে ধর্মও অনেক, আবার ধর্মে ধর্মে ভিন্নতাও অনেক। এক্ষেত্রে, সাধক রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যথার্থই বলেছেন, 'যত মত তত পথ। তবে সব পথেরই গন্তব্য এক।' তাই ঈশ্বর আরাধনার জন্য সর্বাগ্রে ঈশ্বরে 'বিশ্বাস' স্থাপন অপরিহার্য। এজন্য প্রচলিত প্রবাদ আছে, 'বিশ্বাসে মিলায় ঈশ্বর, তর্কে বহুদূর।' সাধারণ মানুষের জন্য সহজে ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপনের ক্ষেত্রে 'নিরাকার ঈশ্বর' ধারণার চেয়ে সাকার ঈশ্বর ধারণা অধিকতর কার্যকরী পথ হিসেবে প্রমাণিত। আর তাই সৃষ্টির আদিকাল থেকে 'সাকার ঈশ্বর' ধারণার পথ ধরে ঈশ্বর আরাধনার ক্ষেত্রে মূর্তিপূজা তথা প্রতিমা পূজার প্রচলন ছিল, আছে এবং সৃষ্টির প্রলয় পর্যন্ত থাকবে। প্রতিকৃতির মাধ্যমে ইষ্টদেব তথা ভগবান আরাধনা যারা করেন, তাদের ধর্মের নামই 'সনাতন ধর্ম'। যা সৃষ্টির শুরু থেকে ছিল, আজও আছে এবং সৃষ্টির প্রলয় পর্যন্ত থাকবে।

বি:দ্রঃ সনাতন ধর্মের অনুসারীরা কেউ 'মূর্তি' পূজা করেন না। তারা প্রকৃত অর্থে 'প্রতিমা' পূজা করেন। পূজার উদ্দেশ্যে পূর্ণাঙ্গভাবে তৈরিকৃত মূর্তি যখন মন্দিরে স্থাপন করে ঘট প্রতিষ্ঠা ও মন্ত্রের মাধ্যমে তাতে প্রাণ সঞ্চার করা হয়, তখন তা প্রতিমাতে রূপান্তর হয়। তখন সেই প্রতিমাকেই ইষ্ট দেবতা তথা ভগবান জ্ঞান করে পূজা করা হয়।

লেখক: উপদেষ্টা
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ

সনাতন ধর্ম এবং নারীর অধিকার

সান্তনু দাস

"স্ত্রিয়ঃ প্রিয়শ্চ গেহেষু"

মনুসংহিতায় নারী প্রসঙ্গ উঠলে সবার প্রথমেই কিছু আধুনিক নারীবাদী, বামপন্থী এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ের একটি বিখ্যাত শ্লোককে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, ঋষি মনু অত্যন্ত নারী বিরোধী ছিলেন। গবেষণার নামে তারা মনুসংহিতায় বর্ণিত শ্লোকগুলোর পূর্বাপর বা সময়কাল বিবেচনায় না নিয়েই তাদের নিজস্ব মতামত এবং সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন। কিন্তু ভাল করে একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যায় তাদের সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব চিন্তা এবং নিজস্ব বাস্তবতার নিরিখে একপাক্ষিক চাপিয়ে দেয়া সিদ্ধান্ত।

উক্ত শ্লোকটিতে ভালো করে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, শ্লোকে 'রক্ষতি' শব্দের সুস্পষ্ট ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ নারীকে পরাধীনতার নাগপাশে বদ্ধ নয় তাকে সকল অবস্থাতেই রক্ষা করতে হবে। গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা নারী যেন কোন অবস্থাতেই দুর্দশাগ্রস্ত না হয়। সনাতন ধর্ম নারীর সম্ভ্রম রক্ষার শিক্ষা দেয়। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সম্ভ্রম রক্ষা করেছিলেন। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিবর্গের সাথে সাথে স্বধর্মদ্বেষী কিছু আত্মঘাতী বুদ্ধিজীবীগণ মহর্ষি মনুর লেখা মনুস্মৃতিকে নারী বিদ্বেষী গ্রন্থ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হন। বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক এবং দুর্ভাগ্যজনক।

'মনু' শব্দ থেকেই মানব, মানবতা, মানুষ, মনুষ্যত্ব ইত্যাদি শব্দের উৎপত্তি। তাই মহর্ষি মনুর নির্দেশনায় শুধু নারী-পুরুষ নয়; বৈশ্বিক মানবতার কথা বলা হয়েছে। শ্লোকগুলোকে স্থান, কাল, পাত্র বিবেচনা না করে নিজস্ব চশমা দিয়ে দেখতে গিয়ে আমরা মনুসংহিতা নিয়ে বিভ্রান্ত হচ্ছি। মানবসমাজের প্রাণ হচ্ছে নারী। তাদের মাধ্যমেই মানব প্রজাতির বংশধারা, প্রজন্ম রক্ষিত হয়। তাই তারা বিশেষ সম্মান প্রাপ্য। এ বিষয়গুলো অত্যন্ত সুন্দর এবং সুস্পষ্টভাবে মহর্ষি মনু মনুসংহিতায় বলেছেন।

১. সর্বাবস্থায় নারীকে রক্ষা করতে হবে :

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষতি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমহতি।।

(মনুসংহিতা : ৯.৩)

"বিবাহের আগে কুমারী অবস্থায় স্ত্রীলোককে পিতা রক্ষা করবে, যৌবনকালে বিবাহিতা স্ত্রীকে স্বামী রক্ষা করবে, আর বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রেরা রক্ষা করবে; পতি-পুত্রবিহীনা স্ত্রীকেও সন্নিহিত পিতা প্রমুখরা রক্ষা করবে। কোনও অবস্থাতেই স্ত্রীলোককে অরক্ষিত স্বতন্ত্র অবস্থায় রাখবে না।"

২. গৃহে গর্ভবতী নারীকে আগে খাবার দিতে হবে :

ভারতবর্ষের সংস্কৃতিতে অতিথিকে দেবতা বলে সম্বোধন করা হয়। বেদের মধ্যেই আছে, অতিথি দেবো ভবঃ। তাই কোন গৃহে আগমন করা অতিথি স্বরূপ দেবতাদের গৃহের গৃহকর্তাদের ভোজনের পূর্বেই ভোজন করানো হয়। অর্থাৎ অতিথিকে আগে খাইয়ে পরে গৃহস্থ পরিবারের খাবার গ্রহণের রীতি। কিন্তু সেই গৃহে যদি কোন নববিবাহিতা বধূ, কন্যা এবং গর্ভবতী নারী থাকে তবে অতিথি ভোজনের পূর্বেই তাদের খাবার প্রদান করতে হবে। নববিবাহিতা বধূ যেহেতু পিতার গৃহ থেকে এসে শ্বশুরের গৃহে এক নতুন পরিবেশে আগমন করে তাই তার নতুন পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে উঠতেও কিছু সময়ের প্রয়োজন। সে অধিকাংশ সময়েই নিজের কথা মুখ ফুটে বলতে লজ্জা পায়। তাই পরিবারের সকলের খাবার পূর্বে তাকে কোনরকম বিচার না করেই আহার করাতে হবে। গৃহের বালক বালিকাদেরও স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে দেহে যেন পুষ্টির ব্যাঘাত ঘটতে না পারে তাই সকলের পূর্বেই ভোজনের সুযোগ দিতে হবে।

সুবাসিনীঃ কুমারাংশ্চ রোগিণো গর্ভিণীস্তথা।

অতিথিভ্যোহগ্র এবৈতান্ ভোজয়েদবিচারয়ন।

(মনুসংহিতাঃ ৩,১১৪)

"সুবাসিনী অর্থাৎ নববিবাহিতা বধূ, পুত্রবধূ ও কন্যা, বালক, রোগী এবং গর্ভবতী নারী এদের অতিথি ভোজনের আগেই কোনরকম বিচার না করেই। ভোজন করাবে। কারণ, স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে এদের আহারাদি ব্যবস্থায় বিলম্ব হওয়া উচিত নয়। বিলম্ব হলে তাদের পুষ্টির ব্যাঘাত ঘটতে পারে। তাই অতিথি ভোজনের আগেই এদের ভোজন করালে কোন দোষ হয় না।"

৩. নারী অপহরণকারীদের মৃত্যুদণ্ড :

নারী অপহরণকারীদের মৃত্যুদণ্ডের মত সর্বোচ্চ দণ্ডে দণ্ডিত করতে হবে।
পুরুষাণাং কুলীনানাং নারীণাঞ্চ বিশেষতঃ
মুখ্যানাঞ্চৈব রত্নানাং হরণে বধমহতি।।

(মনুসংহিতাঃ ৮.৩২৩)

"পুরুষ কিংবা রূপ, গুণ ও সৌভাগ্যসম্পন্ন নারী এবং হীরা, বৈদূর্য প্রভৃতি উৎকৃষ্টজাতীয় রত্ন অপহরণ করলে বধদণ্ড অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ড হবে।"

৪. পরিবারে পুত্র এবং কন্যার অধিকার সমান :

কন্যা পুত্রের সমান অধিকার ভোগ করবে। কন্যার উপস্থিতিতে কেউ অন্যায়ভাবে তার অধিকার হরণ করতে পারবে না।

যথৈবাত্মা তথা পুত্রঃ পুত্রেণ দুহিতা সমা।
তস্যামাত্মনি তিষ্ঠন্ত্যাং কথমন্যো ধনং হরেৎ।।

(মনুসংহিতাঃ ৯.১৩০)

"কোন ব্যক্তি নিজেও যেমন পুত্রও সেইরকম, অর্থাৎ আত্মা ও পুত্রতে কোন প্রভেদ নেই। আবার দুহিতা বা কন্যার পুত্রেরই সমান অধিকার। কন্যা পুত্র স্বয়ং বিদ্যমান থাকতে অন্য কোন ব্যক্তি কিভাবে তার পিতার ধন গ্রহণ করবে? অর্থাৎ কন্যাকে তার পিতামাতার ধন থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।"

৫. পতি-পত্নীর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য এবং আমৃত্যু :

পতি ও পত্নী অন্যকোন জীবনসঙ্গী গ্রহণ না করে আমৃত্যু একসাথে থাকবে এবং তারা কেউ ব্যভিচারে লিপ্ত হতে পারবে না। স্ত্রী স্বামীর সাথে যুক্ত হয়ে সর্বদা ধর্মাচরণ করবেন। তাই স্ত্রীকে শাস্ত্রে সহধর্মিণী বলা হয়। সনাতন শাস্ত্রে স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক বিচ্ছেদকে নিন্দনীয় কর্ম বলা হয়েছে। কারণ এতে বংশের সাথে সাথে সন্তানদের মনোজগতে প্রভূত ক্ষতি হয়।

অন্যোন্যস্যা ব্যভিচারো
ভবেদামরণান্তিকঃ।
এষ ধর্মঃ সমাসেন জ্ঞেয়ঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ
পরঃ।।
তথা নিত্যং যতেয়াতাং স্ত্রীপুংসৌ তু
কৃতক্রিয়ৌ।
যথা নাতিচরেতাং তৌ
বিযুক্তাবিতরেতরম্।

(মনুসংহিতাঃ ৯.১০১-২)

"স্ত্রী এবং পুরুষের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য সম্বন্ধে এই কথাই সংক্ষেপে বলা যায় যে, মরণকাল পর্যন্ত পতি-পত্নী পরস্পর পরস্পরের প্রতি ব্যভিচার অর্থাৎ ব্যতিক্রমী সম্পর্ক স্থাপন করবে না।

স্ত্রী এবং পুরুষ বিবাহ-সংস্কারে আবদ্ধ হয়ে সকল সময় এমন কাজ করতে থাকবে, যাতে তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে ধর্মাদি কাজ পৃথকভাবে না করে।"

৬. ধর্ষণের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড :

জোরপূর্বক নারীদের সাথে অবৈধ যৌন মিলনকে ধর্ষণ বলা হয়। যারা নারীদের ধর্ষণ করে বা উত্যক্ত করে বা তাদের ব্যভিচারে প্ররোচিত করে তাদের এমন শাস্তি দিতে হবে যাতে তা অন্যদের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করে এবং কেউ তা করতে আর সাহস না পায়। ধর্ষণ বা নারীদের সাথে জোরপূর্বক যৌন মিলনের প্রচেষ্টারূপ ব্যভিচার উৎপন্ন হলে সেক্ষেত্রে করণীয় প্রসঙ্গে মনুস্মৃতিতে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশনা দেয়া আছে। যারা নারীদের ধর্ষণ করে বা উত্যক্ত করে তা তাদের ব্যভিচারে প্ররোচিত করে, তাদের এমন শাস্তি দিতে হবে যাতে তা অন্যদের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করে এবং কেউ তা করতে আর সাহস না পায়।

পরদারাভিমর্ষেষু প্রবৃত্তান্ নৃন্ মহীপতিঃ।
উদ্বেজনকরৈর্দণ্ডৈশ্চিহ্নয়িত্বা প্রবাসয়েৎ।।

(মনুসংহিতাঃ ৮.৩৫২)

"যারা পরস্ত্রী নারীদের জোরপূর্বক যৌন মিলনের প্রচেষ্টা করে ব্যভিচারে রত হয়, রাজা তাদের নাক- কান ছেদন করে এমন শাস্তি দিবেন; যা দেখে সকলে ভীত হয়। সে অবস্থায় তাদের দেশ হতে বিতারিত করতে হবে।"

যোহকামাং দূষয়েৎ কন্যাং স সদ্যো
বধমহতি।
সকামাং দূষয়ংস্তুল্যো ন বধং
প্রাপুয়ান্নরঃ।

(মনুসংহিতাঃ ৮.৩৬৪)

"যে পাপিষ্ঠ পুরুষ কোন কন্যাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে, তার কন্যাত্ব ভ্রষ্ট করবে; প্রমাণ পাওয়ার সাথে সাথেই রাজা তাকে সে দিনই বধদণ্ড প্রদান করবে। তবে কন্যাটির যদি সেই কাজে ইচ্ছা এবং সম্মতি থাকে, তাহলে সম্ভোগকারীর শারীরিক দণ্ড হবে না। "

৭. নারী পূজ্যা, সমাদরণীয়া, ভূষণীয়া, সম্মানীয়া ও বংশের শ্রীবৃদ্ধির কারণ :

যে বংশে স্ত্রীলোকেরা সন্তুষ্ট থাকে, সেই বংশ নিশ্চিতভাবেই শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে এবং দেবতারাও সেই বংশের প্রতি প্রসন্ন হয়। কিন্তু ভগিনী, পত্নী, পুত্রবধূ প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা যে বংশে অনাদৃত, অপমানিত সেই বংশ বিষপান করা ব্যক্তির ন্যায় ধন, পশু প্রভৃতিসহ সর্বতোভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। দেবতারাও সেই বংশের প্রতি রুষ্ট হন।

পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ।।
যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ।।
শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যন্ত্যাশু তৎ কুলম্।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্বদা।।
জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ।।
তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ।।
তস্মাদেতাঃ সদা পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
ভূতিকামৈর্নরৈর্নিত্যং সতকারেষ্যুসবেষু চ।।

(মনুসংহিতাঃ ৩.৫৫-৫৯)

"বিবাহ সময়ে পতিই কেবল কন্যাকে ধনাদি দিবেন এমন নয়, বিবাহোত্তর কালেও পিতা, ভ্রাতা, পতি, দেবর ইহারা সকলেই যদি বহু কল্যাণরাশির অভিলাষী হয়, তবে ঐ কন্যাদিগকে ভোজনাদির দ্বারা পূজা করবে ও বস্ত্র অলঙ্কারাদির দ্বারা ভূষিত করবে।

যে বংশে নারীরা বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা পূজা বা সমাদর প্রাপ্ত হন, সেখানে দেবগণ প্রসন্ন হয়ে থাকেন এবং দেবতারা প্রসন্ন হলে পরিবারের সবাই অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হয়। অন্যথা যে বংশে নারী সমাদরনীয় নয়, সে গৃহে যোগ, হোম, দেব আরাধনাদি সমস্ত ক্রিয়াই নিষ্ফল হয়ে যায়।

যে বংশে ভগিনী ও গৃহস্থের সপিণ্ড স্ত্রী, কন্যা, পুত্রবধূ প্রভৃতি নারীরা ভূষণ-আচ্ছাদন-অন্নাদির অভাবে দুঃখিনী হয়, সেই বংশ অতি শীঘ্র ধ্বংস প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ দৈব ও রাজাদের দ্বারা পীড়িত হয়। পক্ষান্তরে যে বংশে নারীরা ভোজন-আচ্ছাদনাদিতে দুঃখী না থেকে সন্তুষ্ট থাকে সেই বংশের নিশ্চিতভাবে শ্রীবৃদ্ধি হয় ।

ভগিনী, পত্নী, পুত্রবধূ প্রভৃতি স্ত্রীরা অনাদৃত হয়ে যে বংশকে উদ্দেশ্য করে অভিশাপ দেন, সেই বংশ বনপশু প্রভৃতির সহিত সর্বতোভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

অতএব যারা ভূতি অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য, সম্পদাদি কামনা করেন, এইরকম পতিসম্বন্ধীয় লোকেরা উপনয়ন, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি বিভিন্ন সংকার্য্যানুষ্ঠানে এবং নানা উৎসবে অলঙ্কার, বস্ত্র ও ভোজনাদির দ্বারা নিত্য নারীদের পূজা করবে অর্থাৎ সম্মানিত করবে।"

৮. স্বামী-স্ত্রীর কেউ ব্যভিচার করতে পারবে না :

স্ত্রিয়ান্তু রোচমানায়াং সর্বং তদ্রোচতে কুলম্।
তস্যান্ত্বরোচমানায়াং সর্বমেব ন রোচতে।।

(মনুসংহিতাঃ ৩.৬২)

"ভূষণাদির দ্বারা স্ত্রী সুসজ্জিত থাকলে সম্পূর্ণ বংশ শোভামণ্ডিত থাকে। আর স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যদি রুচি না থাকে তাহলে সমস্ত পরিবার শোভাহীন হয়ে পড়ে।"

স্বামীর যেমন স্ত্রীর প্রতি সম্পূর্ণ রুচি এবং ভালোবাসা থাকতে হবে। তেমনি বিপরীতক্রমে স্ত্রীর স্বামীর প্রতি সম্পূর্ণ সমর্পণ এবং ভালোবাসা থাকতে হবে। স্ত্রীকে কায়মনোবাক্যে সংযত থাকতে হবে। পতির এবং তার বংশের কোনও অনিষ্ট চিন্তা করতে পারবে না। তবেই সেই স্ত্রী স্বামীর অর্জিত পুণ্য লাভ করে এবং সমাজ তাকে 'সাধ্বী' বলে প্রশংসা করে। কিন্তু যে স্ত্রী স্বামীর প্রতি ব্যভিচারিণী হয়ে অন্য পুরুষের সাথে সম্পর্ক করে, বিষয়টি জানাজানি হলে জগতে সে যেমন নিন্দনীয় হয় এবং ভয়ংকর রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়। মৃত্যুর পরে মুক্তিলাভ না করে জন্মান্তরে শৃগাল সহ বিবিধ পশুযোনিতে জন্মগ্রহণ করে।

পতিং যা নাতিচরতি
মনোবাগদেহসংযতা।
সা ভর্তৃলোকানাপ্নোতি সদ্ভিঃ সাধ্বীতি চোচ্যতে।।
ব্যভিচারাত্ত্ব ভর্তুঃ স্ত্রী লোকে প্রাপ্নোতি নিন্দ্যতাম্।
শৃগালযোনিঞ্চাপ্নোতি পাপরোগৈশ্চ পীড্যতে।।

(মনসংহিতাঃ ৯. ২৯-৩০)

"যে কায়মনোবাক্যে সংযত থেকে পতির কোনও অনিষ্ট চিন্তা করে না, সেই স্ত্রী স্বামীর পুণ্যে অর্জিত যে উৎকৃষ্ট স্বর্গলোক, সেখানে গমন করে এবং সাধুগণও তাকে 'সাধ্বী' বলে প্রশংসা করেন।

কিন্তু যে স্ত্রী স্বামীর প্রতি ব্যভিচারিণী হয় অর্থাৎ অন্য পুরুষের সাথে সম্ভোগ-সম্পর্ক করে, ইহলোকে সে নিন্দনীয় হয় এবং জন্মান্তরে শৃগাল-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে ও নানারকম ক্ষতিকারক রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়।"

৯. জন্মদায়িনী মাতা, স্ত্রী এবং কন্যার নামে মিথ্যা দোষারোপ করলে, তাকে দণ্ডিত করতে হবে :

যদি কেউ মা, স্ত্রী বা কন্যার নামে মিথ্যা দোষারোপ করে তাদের নামে কুৎসা রটনা করে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টা করে তবে সেই ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করতে হবে যাতে পরবর্তীতে কেউ এমন ঘৃণ্য কাজ না করে।

মাতরং পিতরং জায়াং ভ্রাতরং তনয়ং গুরুম্।
আক্ষারয়ন শতং দাপ্যঃ পন্থানং চাদদদ্ গুরোঃ ॥

(মনুসংহিতাঃ ৮.২৭৫)

"মাতা, পিতা, স্ত্রী, ভ্রাতা, পুত্র এবং গুরু এঁদের সম্বন্ধে মিথ্যা দোষারোপ বা নিন্দা করলে এবং শিক্ষাদাতা গুরুকে অহংকারী হয়ে পথ ছেড়ে না দিলে একশ পণ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।"

১০. মা-বাবা, স্ত্রী-সন্তানকে পরিত্যাগ দণ্ডনীয় অপরাধ :

ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া যে ব্যক্তি মা-বাবা, স্ত্রী-সন্তান পরিত্যাগ করে তাকে কঠিন দণ্ড প্রদান করতে হবে।

ন মাতা না পিতা ন স্ত্রী ন পুত্রস্ত্যাগমর্হতি।
ত্যজন্ন পতিতানেতান্ রাজ্ঞা দণ্ড্যঃ শতানি ষট্॥

(মনুসংহিতাঃ ৮.৩৮৯)

"মা, বাবা, স্ত্রী এবং পুত্র- এদের অকারণে পরিত্যাগ করা চলবে না। এদের কাউকে ত্যাগ করা হয়েছে, এমন হলে ত্যাগকারী ব্যক্তিকে রাজা ছয়শত পণ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করবেন।

১১. রাস্তায় চলাচলের ক্ষেত্রে নারীকে আগে পথ ছেড়ে দিতে হবে :

বর্তমানে আমরা দেখি নারীদের জন্যে বাস, ট্রেন সহ বিবিধ যানবাহনে সংরক্ষিত আসন থাকে। আমরা কোন সিট-এর পার্শ্ববর্তী কোন নারী দাঁড়িয়ে থাকলে তাকে আগে বসতে দেই। এই অত্যন্ত জনপ্রিয় মানবিক বিধানটি নিরাপদে নারীদের রাস্তায় চলাচল করার ক্ষেত্রে মনুসংহিতায় সুস্পস্টভাবে দেখি। সেখানে বলা হয়েছে, কোন যানবাহনে বৃদ্ধ মানুষ, অসুস্থ ব্যক্তি, বোঝা বহনকারী, বিবাহের বর, রাজা, ছাত্র এবং নারীকে আগে পথ ছেড়ে দিতে হবে।

চক্রিণো দশমীস্থস্য রোগিণো ভারিণঃ স্ত্রিয়াঃ।
স্নাতকস্য চ রাজশ্চ পন্থা দেয়ো বরস্য চ।।

(মনুসংহিতাঃ ২.১৩৮)

"চাকাযুক্তরথাদি প্রভৃতি যানে আরূঢ় ব্যক্তি, বয়স্ক ব্যক্তি, রোগার্ত, ভারবহনে ক্লান্ত ব্যক্তি, স্ত্রীলোক, স্নাতক অর্থাৎ গুরুগৃহ থেকে শিক্ষা সমাপন করা ছাত্র, রাজা এবং বিবাহের উদ্দেশ্যে প্রস্থিত বর এদের আগে যেতে পথ ছেড়ে দেয়া কর্তব্য।"

১২. নারীরা সৌভাগ্যবতী, বহুসম্মানের অধিকারী এবং তারাই গৃহের দীপ্তি :

মাতৃরূপে, কন্যারূপে, স্ত্রীরূপে, ভগ্নীরূপে কিংবা ধর্মকর্মে অংশীদাররূপে নারীরাই সকল কল্যাণের অন্যতম উৎস। তারা নতুন প্রজন্ম বা উত্তরসুরির জন্ম দেয় ও পালন করে। তারা সৌভাগ্য ও আশীর্বাদ বয়ে আনে; তাই তারা প্রতিটি গৃহের লক্ষ্মী স্বরূপা শ্রী। সনাতন ধর্ম নারীর ক্ষমতায়নে কঠোরভাবে বিশ্বাসী। বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, অষ্টাদশ পুরাণসহ শাস্ত্রে বিভিন্ন স্থানেই নারীদের উজ্জ্বলভাবে গুরুত্বপূর্ণ পদে পাওয়া যায়। পুরাকালে

নারীদের রথ বা যানবাহন চালানোর অধিকারও ছিল। এ কারণে, নারীদের সর্বদা সম্মান সহকারে রাখা উচিত। বাড়িতে স্ত্রী এবং শ্রী এ দুইয়ের মধ্যে কোনও ভেদ নেই। অভেদ সন্তানাদি প্রসব ও পালন করে বলে, শাস্ত্রে নারীদের অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী বলা হয়েছে। তারা গৃহের দীপ্তি বা প্রকাশস্বরূপ। ভূতি অর্থাৎ ঐশ্বর্য কামনা করে, বিভিন্ন সংকার্যের অনুষ্ঠানে এবং নানা উৎসবে উত্তম অলঙ্কার, বস্ত্র ও ভোজনাদি দ্বারা নারীদের সম্মান প্রদর্শন করে প্রীত রাখতে হবে। পরিবারের সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধির জন্য নারীকে সর্বদা সুখী রাখতে হবে।

প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ ।
স্ত্রিয় শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোহস্তি কশ্চন।।
উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনম্।
প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রীনিবন্ধনম্॥
অপত্যং ধর্মকার্যাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চ হ।।

(মনুসংহিতাঃ ৯.২৬-২৮)

"স্ত্রীলোকরা সন্তান প্রসব ও পালন করে বলে তারা অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী। এ কারণে তারা সম্মানের যোগ্য। নারীরা গৃহের দীপ্তি অর্থাৎ প্রকাশস্বরূপ। পুরুষের ধনৈশ্বর্য থাকলেও যদি ভার্যা না থাকে, তা হলে বাড়ীতে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনেরা উপস্থিত হলে গৃহস্বামী নিজে তাদের প্রত্যেককে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পান-ভোজনাদির দ্বারা আপ্যায়িত করতে পারে না।

সন্তান উৎপাদন ও জাত সন্তানের পরিপালন এবং প্রতিদিন লোকযাত্রা নির্বাহরূপ অতিথিসেবা, ভিক্ষাদান প্রভৃতি গৃহস্থের যে সব কাজ স্ত্রীলোকেরাই এই সব কাজ অন্তরঙ্গভাবে সম্পাদন করে।

সন্তানের উৎপাদন, অগ্নিহোত্রাদি পঞ্চমহাযজ্ঞ সহ সকল প্রকারের ধর্মকর্ম সম্পাদন, সকলের পরিচর্যা, রতি-সুখ, সন্তানের মাধ্যমে পিতৃগণের পরিতৃপ্তি এ সকল কাজ পত্নীর দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়।"

১৩. নারী-শিশু হত্যাকারীদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে হবে :

নারী, শিশু ও জ্ঞানীদের যারা হত্যা করে, তাদের মত পাপী আর নেই। তাই তাদের মৃত্যুদণ্ডের মত কঠিনতম শাস্তি প্রদান করতে হবে।

কূটশাসনকর্তৃংশ্চ প্রকৃতীনাঞ্চ দূষকান্।
স্ত্রীবালব্রাহ্মণঘ্নাংশ্চহন্যাদ্দ্বিটসেবিনস্তথা।।

(মনুসংহিতাঃ ৯.২৩২)

"যারা মিথ্যা রাজাজ্ঞা লেখে বা প্রচার করে, যারা অমাত্যাদির রাজ প্রকৃতিদের মধ্যে ভেদ ঘটায়, যারা স্ত্রীলোক, বালক ও ব্রাহ্মণকে বধ করে এবং যারা রাজার শত্রুপক্ষের সাহায্য করে তাদের বধ করা কর্তব্য।"

(সংগৃহীত)

লেখক : সহ-সভাপতি
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ
সাধারণ সম্পাদক
দি মেট্রোপলিটন হিন্দু কর্মজীবি সমবায় সমিতি লি:
কোষাধ্যক্ষ
শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী মন্দির, কলসকাঠী, বরিশাল
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
বাংলাদেশ হিন্দু কল্যাণ ফাউন্ডেশন
International Member
Amnesty International

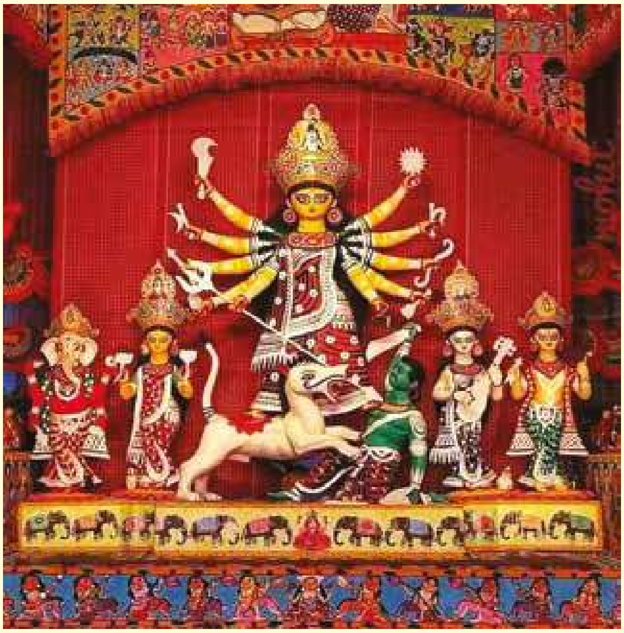

জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা

প্রদীপ কুমার সাহা

জগন্নাথ অর্থাৎ "জগতের নাথ" বা "জগতের প্রভু"।

পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, বিহার, আসাম, মণিপুর ও ত্রিপুরা রাজ্যে এবং বাংলাদেশে তাঁর পূজা প্রচলিত। জগন্নাথ হলেন হিন্দু দেবতা বিষ্ণু বা তাঁর অবতার কৃষ্ণের একটি বিশেষ রূপ। তাকে তার দাদা বলরাম ও বোন সুভদ্রার সঙ্গে পূজা করা হয়।

জগন্নাথের মূর্তি সাধারণত কাঠে তৈরি করা হয়। 'নিম্ব বৃক্ষ' বা নিম গাছের কাঠ দ্বারা জগন্নাথদেবের প্রধান বিগ্রহগুলো (জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা) নির্মিত। এই মূর্তির চোখদুটি বড়ো বড়ো ও গোলাকার। হাত অসম্পূর্ণ। মূর্তিতে কোনো পা দেখা যায় না। বিগ্রহে অসম্পূর্ণ হাত ও পায়ের অনুপস্থিতি নিয়ে নানা ধরনের মতবাদ এবং পবিত্র বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে। জগন্নাথের পূজাপদ্ধতিও অন্যান্য হিন্দু দেবতাদের পূজাপদ্ধতির চেয়ে আলাদা। ওড়িশা রাজ্যের পুরী শহরে জগন্নাথের প্রধান মন্দিরটি অবস্থিত। এই মন্দির হিন্দুধর্মের চারধামের অন্যতম।

বেদে জগন্নাথের সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই। তিনি দশাবতার অথবা বৈদিক হিন্দু দেবমণ্ডলীর সদস্যও নন। অবশ্য কোনো কোনো ওড়িয়া গ্রন্থে জগন্নাথকে বিষ্ণুর নবম অবতার রূপে বুদ্ধের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। বিষ্ণুর রূপভেদ হিসেবে জগন্নাথ এক অসাম্প্রদায়িক দেবতা। তাকে এককভাবে হিন্দুধর্মের কোনো একটি সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত করা যায় না। বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, স্মার্ত সকল শাখার অনুগামীরাই জগন্নাথকে পূজা করেন। এমনকি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গেও জগন্নাথের যোগ দেখানো হয়।

জগন্নাথের সবচেয়ে বিখ্যাত উৎসবটি হল রথযাত্রা। এই উৎসবের সময় জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি মূল মন্দিরের (বড় দেউল) গর্ভগৃহ থেকে বের করে এনে কাঠের তৈরি তিনটি বিরাট রথে করে প্রায় ৩ কিলোমিটার (১.৯ মা) দূরে গুণ্ডিচা মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। ভক্তরাই এই রথগুলো টেনে নিয়ে যান। যেখানেই জগন্নাথ মন্দির আছে, সেখানেই এই ধরনের রথযাত্রা আয়োজিত হয়।

ব্যুৎপত্তি

"জগন্নাথ" শব্দটি "লোকনাথ" বা "অবলোকিতেশ্বর" শব্দদুটির মতো একটি বর্গনাম। আসলে যে দেবতাকেই সর্বোচ্চ জ্ঞান করা হয়, তাঁকেই "জগন্নাথ" বলা চলে।

"জগন্নাথ" শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ "জগত বা ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু"।

"জগন্নাথ" কথাটি তৎপুরুষ সমাস। এটি "জগৎ" (যার মূল ধাতু "গম্", অর্থাৎ "[যা কিছু] চলে") এবং "নাথ" (অর্থাৎ, প্রভু বা আশ্রয়) শব্দটির সংমিশ্রণে গঠিত। অর্থাৎ, "জগন্নাথ" শব্দের অর্থ "যিনি চলমান জগতের আশ্রয় বা প্রভু"। ওড়িয়া ভাষায় "জগন্নাথ" নাম থেকে উৎপন্ন "জগা" বা "জগবন্ধু" শব্দদুটিরও প্রচলন লক্ষ করা হয়। এ ছাড়া জগন্নাথের মূর্তির গড়ন অনুসারে তার "কাল্য" (অর্থাৎ, "কালো দেবতা" বা "কালের দেবতা"), "দারুব্রহ্ম" (অর্থাৎ, কাষ্ঠরূপী ব্রহ্ম), "দারুদেবতা" (অর্থাৎ, কাঠের দেবতা), "চকাআঁখি", "চকাডোলা" বা "চকানয়ন" (অর্থাৎ, যে দেবতার চোখ গোলাকার) নামও প্রচলিত।

কোনো কোনো গবেষকের মতে, "জগন্নাথ" শব্দটি কোনো সংস্কৃতায়িত আদিবাসী শব্দ। এই গবেষকেরা জগন্নাথকে মূলত আদিবাসী দেবতা মনে করেন। ওড়িশার আদিম আদিবাসী শবর ছিল বৃক্ষ-উপাসক। তারা তাদের দেবতাকে বলত "জগনাত"। সম্ভবত, এই শব্দটি থেকে "জগন্নাথ" শব্দটি এসেছে। যদিও এই সব মতবাদ সর্বজনসম্মত নয়। কিন্তু ওড়িয়া গ্রন্থ নীলাদ্রি মহোদয় গ্রন্থে এই সম্পর্কে অনেকটা ধারণা পাওয়া যায়। "দৈতাপতি" নামে পরিচিত একটি অব্রাহ্মণ শ্রেণীকে নীলমাধবের পরম ভক্ত বিশ্বাবসুর (শবর উপজাতির রাজা) বংশধর হিসাবে মেনে নেয়া হয়, যার অনেক প্রমাণ আছে। তারা পুরীর মন্দিরের কয়েকটি প্রধান দায়িত্ব পালন করেন, গুড়িচা যাত্রা, নবকলেবর, সপ্তাভরণ, শ্রীঅঙ্গ সেবা ইত্যাদি এবং ঈশ্বরের পরিবার নামে পরিচিত হন। আর বিদ্যাপতির বংশধরেরা পতি মহাপাত্র হিসেবে পরিচিত, রথযাত্রা ও নবকলেবরে ইনাদের ও বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

হিন্দুদের কোনো কোনো সম্প্রদায় জগন্নাথকে বিষ্ণুর অবতার মনে করে। আবার কোনো কোনো সম্প্রদায়ে তাকে সকল অবতারের উৎস বিষ্ণু মনে করা হয়। মনে করা হয়, অবতারেরা সকল জাগতিক সৃষ্টির কারণ জগন্নাথের থেকে উৎসারিত। তাই রাম, কৃষ্ণ প্রমুখ অবতারের মতো জগন্নাথের কোনো জীবনবৃত্তান্ত বা লীলা নেই।

দীপ্তি রায় তার প্রতাপরুদ্র দেব (ওড়িশার শেষ উল্লেখযোগ্য সূর্যবংশীয় রাজা) গ্রন্থে লিখেছেন:

"সরল দাসের মতে, বিষ্ণুর (জগন্নাথ) সকল অবতার তাঁর থেকেই উৎসারিত এবং তাঁদের লীলা অবসানের পর জগন্নাথেই বিলীন হয়ে যান। প্রতাপরুদ্র দেবের আমলে ওড়িয়া কবিরা এই ধারণা গ্রহণ করে তাঁদের বইতেই এই মতবাদ প্রচার করতেন। তাঁদের মতে, জগন্নাথ শূন্য পুরুষ, নিরাকার ও নিরঞ্জন। নীলাচলে লীলার জন্য তিনি সর্বদা উপস্থিত থাকেন;... প্রতাপরুদ্র দেবের আমলে ওড়িশার পাঁচটি বৈষ্ণব শাখা তাঁদের ধর্মগ্রন্থে জগন্নাথকে (পুরুষোত্তম) পূর্ণব্রহ্মরূপে প্রচার করেন। তাঁরাও বলেছেন, জগন্নাথের থেকেই রাম, কৃষ্ণ প্রমুখ অবতারেরা উৎসারিত হয়ে জগতে লীলা করেছেন এবং লীলার অন্তে পূর্ণব্রহ্মে লীন হয়েছেন।

জগন্নাথের মধ্যে বিষ্ণুর সকল অবতারের চিহ্ন আছে। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে তাকে বিষ্ণুর এক-একটি অবতারের মূর্তিতে পূজা করা হয়। বিভিন্ন প্রথা-রীতিনীতি থেকেও জগন্নাথের সঙ্গে নানা অবতারের যোগ লক্ষিত হয়। যদিও তাকে বিষ্ণুর অষ্টম অবতার কৃষ্ণের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত করা হয়ে থাকে। পুরাণে আছে, বিষ্ণুর নৃসিংহ অবতার কাঠের স্তম্ভ ভেঙে বেরিয়েছিলেন। তাই জগন্নাথকে দারুব্রহ্ম রূপে নৃসিংহ স্তোত্র পাঠ করে পূজা করা হয়। জগন্নাথকে এককভাবে পূজা করার সময় বলা হয় "দধিবামন"। প্রতি বছর ভদ্র মাসে জগন্নাথকে বিষ্ণুর বামন অবতারের বেশে পূজা করা হয়। বার্ষিক রথযাত্রার সময়ও জগন্নাথকে বামন রূপে পূজা করা হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে তুলসীদাস পুরীতে এসে জগন্নাথকে রঘুনাথ (রাম) রূপে পূজা করেছিলেন। চৈতন্য মহাপ্রভুর সময় থেকে জগন্নাথকে কৃষ্ণের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। আবার বিষ্ণুর নবম অবতার বুদ্ধকেও জগন্নাথ মনে করা হয়। যদিও বিষ্ণুর নবম অবতার রূপে বুদ্ধের বদলে জগন্নাথকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়াসটি বিতর্কিত। প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে, জগন্নাথ দায়িত্বশীল পুত্রের মতো তার সকল মানব অবতারের বাবা-মায়ের বাৎসরিক শ্রাদ্ধকার্য করে থাকেন।

জগন্নাথ মন্দিরে ভক্তদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা কখনই ছিল না। হিন্দুধর্মের সকল সম্প্রদায়ে জগন্নাথের পূজা হয়। তিনি শুধু বৈষ্ণব দেবতা নন, সকল সম্প্রদায়ের দেবতা। জগন্নাথকে তান্ত্রিক ক্রিয়ার সার মনে করা হয়। শৈব ও শাক্তরা জগন্নাথকে দেবী বিমলার ভৈরব অর্থাৎ শিব মনে করেন। এমনকি জগন্নাথ মন্দিরের পূজারিরাও শাক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত। যদিও এই মন্দিরে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রভাবই সবচেয়ে বেশি। বলরামকেও শিব ও সুভদ্রাকে দুর্গা মনে করা হয়। প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে, ভক্তদের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য জগন্নাথ যে কোনো দেবতার রূপ ধরতে পারেন। ভাগবত পুরাণে আছে, ঋষি মার্কণ্ডেয় পুরুষোত্তম জগন্নাথ ও শিবের একত্ব প্রমাণ করেন। মহারাষ্ট্রের গণপতি ভট্ট হাতিবেশের সময় জগন্নাথকে গণেশ রূপে পূজা করেছিলেন।

পৌরাণিক উপাখ্যান

জগন্নাথদেবকে কেন্দ্র করে দুটি জনপ্রিয় কাহিনি প্রচলিত আছে। প্রথম কাহিনি অনুসারে, কৃষ্ণ তার ভক্ত রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের সম্মুখে আবিভূর্ত হয়ে পুরীর সমুদ্রতটে ভেসে আসা একটি কাষ্ঠখণ্ড দিয়ে তার মূর্তি নির্মাণের আদেশ দেন। মূর্তিনির্মাণের জন্য রাজা একজন উপযুক্ত কাষ্ঠশিল্পীর সন্ধান করতে থাকেন। তখন এক রহস্যময় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কাষ্ঠশিল্পী তার সম্মুখে উপস্থিত হন এবং মূর্তি নির্মাণের জন্য কয়েকদিন চেয়ে নেন। সেই কাষ্ঠশিল্পী রাজাকে জানিয়ে দেন মূর্তি নির্মাণকালে কেউ যেন তার কাজে বাধা না দেন। বন্ধ দরজার আড়ালে শুরু হয় কাজ। রাজা ও রানি সহ সকলেই নির্মাণকাজের ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে ওঠেন। প্রতিদিন তারা বন্ধ দরজার কাছে যেতেন এবং শুনতে পেতেন ভিতর থেকে খোদাইয়ের আওয়াজ ভেসে আসছে। ৬-৭ দিন বাদে যখন রাজা বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন এমন সময় আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায়। অত্যুৎসাহী রানি কৌতুহল সংবরণ করতে না পেরে দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করেন। দেখেন মূর্তি তখনও অর্ধসমাপ্ত এবং কাষ্ঠশিল্পী অন্তর্ধিত। এই রহস্যময় কাষ্ঠশিল্পী ছিলেন দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা। মূর্তির হস্তপদ নির্মিত হয়নি বলে রাজা বিমর্ষ হয়ে পড়েন। কাজে বাধাদানের জন্য অনুতাপ করতে থাকেন। তখন দেবর্ষি নারদ তার সম্মুখে আবির্ভূত হন। নারদ রাজাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন এই অর্ধসমাপ্ত মূর্তি পরমেশ্বরের এক স্বীকৃত স্বরূপ।

দ্বিতীয় কাহিনিটির অবতারণা করা হয়েছিল পূর্বোল্লিখিত উপখ্যানটির ব্যাখ্যা ও সংশয় নিরসনের উদ্দেশ্যে। বৃন্দাবনে গোপীরা একদিন কৃষ্ণের লীলা ও তাদের কৃষ্ণপ্রীতির কথা আলোচনা করছিলেন। কৃষ্ণ গোপনে সেই সকল কথা আড়ি পেতে শুনছিলেন। কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রাকে নিয়োগ করা হয়েছিল গোপীরা যখন কৃষ্ণের কথা আলোচনা করেন তখন কৃষ্ণ যেন তাদের নিকটবর্তী না হতে পারে সেদিকে নজর রাখার জন্য। কিন্তু গোপীদের কৃষ্ণপ্রীতি দেখে পরিতুষ্ট সুভদ্রা তাদেরই কথা শুনতে শুনতে বিমোহিত হয়ে গেলেন। দেখতে পেলেন না যে তাদের দুই দাদা কৃষ্ণ ও বলরাম এগিয়ে আসছেন। শুনতে শুনতে দুই ভাইয়ের কেশ খাড়া হয়ে উঠল, হাত গুটিয়ে এল, চোখদুটি বড় বড় হয়ে গেল এবং মুখে আনন্দের উচ্চ হাসির রেখা ফুটে উঠল। এই কারণেই জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার এইপ্রকার রূপ। বৈষ্ণবরা কৃষ্ণের এই বিমূর্ত রূপটিকে পূজা করেন।

জগন্নাথ মন্দির

পুরীর জগন্নাথ মন্দির ভারতের অন্যতম প্রসিদ্ধ মন্দির। জগন্নাথ-আরাধনার ইতিবৃত্ত এতই প্রাচীন যে এর কোনো ঐতিহাসিক রেকর্ড পাওয়া সম্ভব নয়। জগন্নাথ মন্দিরে অহিন্দুদের প্রবেশ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কলিঙ্গ স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত এই মন্দিরটি শ্রীমন্দির নামে সমধিক পরিচিত। গর্ভগৃহের মাথায় রয়েছে একটি সুউচ্চ শিখর বা চূড়া। প্রদীপ উৎসর্গের জন্য রয়েছে ফসিল হয়ে যাওয়া কাঠের একটি স্তম্ভ। মন্দিরের প্রধান দ্বার সিংহদ্বারের রক্ষক দেবতা জয় ও বিজয়। মূল প্রবেশপথের সামনে রয়েছে অরুণস্তম্ভ নামে একটি স্মৃতিস্তম্ভ। খুরদার রাজা কোনার্কের সূর্যমন্দির থেকে এটি নিয়ে আসেন।

তিন দেবতাকে সাধারণত মন্দিরের অভ্যন্তরেই পূজা করা হয়। তবে প্রতি বছর আষাঢ় মাসে তাদের রাজপথে বের করে রথারূঢ় করে তিন কিলোমিটার দূরে গুন্ডিচা মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। এই সময় ভক্তরা দেবতাকে গণদর্শনের সুযোগ পান। এই বিরাট বিরাট রথগুলি প্রতি বছর কাঠ দিয়ে নির্মাণ করা হয়। এই সুদীর্ঘ রথগুলিই ইংরেজি শব্দ 'juggernaut'-উৎসব। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর কৃষ্ণের বৃন্দাবন প্রত্যাবর্তনের প্রতীকী রূপে পালিত হয়ে থাকে এই রথযাত্রা উৎসব। রথযাত্রার সময় সারা পৃথিবী থেকে এখানে ভক্ত সমাগম হয়। পুরীর রাজা রথে ঝাঁট দিয়ে সেবা করেন যাকে ছেরাপহরা বলা হয়।

বলরাম

বলরাম শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। তিনি বলদেব, বলভদ্র ও হলায়ুধ নামেও পরিচিত। তিনি জগন্নাথ ঐতিহ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ত্রয়ী দেবতাদের একজন। বৈষ্ণবরা বলরামকে বিষ্ণুর অবতার জ্ঞানে পূজা করেন। ভাগবত পুরাণের অবতারপট তালিকাতেও তার নাম আছে। বৈষ্ণব ও অন্যান্য হিন্দুরা সবাই তাকে বিষ্ণুর শয্যারূপী শেষনাগের একটি রূপ বলে মনে করেন। দ্বাপর যুগের শেষে বলরামের জন্ম হয় রোহিণীর গর্ভে। রোহিণী হলেন শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেবের আর এক পত্নী ও নন্দের ভগিনী। শ্রীহরি বিষ্ণুর আদিশেষ নাগের অবতার হলেন বলরাম। অত্যাচারী কংসের কারাগারে বন্দী বসুদেব ও দেবকীর সপ্তম গর্ভে বলরাম আসেন, কিন্তু কংসের হাত থেকে সেই শিশুকে বাঁচানোর জন্য শ্রীহরির আদেশে দেবী যোগমায়া দেবকীর সপ্তম গর্ভের ভ্রূণ সেখান থেকে গোকুলে নন্দগৃহে রোহিণীর গর্ভে স্থাপিত করেন। এবং রোহিণীর গর্ভে বলরামের জন্ম হয়। যাদব বংশীয় গুরু গর্গাচার্য রোহিনী পুত্রের নাম দেন বলরাম। বল মানে শক্তি। শক্তি ও আধ্যাত্মিকতার মিলন হয়েছে বলে তার নাম বলরাম রাখা হয়। এছাড়াও দেবকী গর্ভ থেকে সংকর্ষণ করা হয়েছে বলে তার আরেক নাম সংকর্ষণ। এছাড়াও তাকে হলধর বলা হয়। তিনি ছোটভাই শ্রীকৃষ্ণের সহিত অনেক অসুর বধ করেন ও ভাইয়ের সাথে এক মধুর সম্পর্কের আদর্শ স্থাপন করেছেন।

সত্যযুগে মহারাজা রেবতের পুত্র মহারাজা কাকুদমি যজ্ঞ করে এক গুণবতী সুলক্ষণা কন্যা সন্তান লাভ করেন। সেই কন্যার বিবাহ কার সাথে দিবেন তা মনস্থির না করতে পেরে তিনি ব্রহ্মার নিকট যান। ব্রহ্মা জানান যে,

দ্বাপরে ভগবান বিষ্ণুর সাথে শেষনাগ বলরাম অবতার ধারন করেছেন এবং তিনিই কাকুদমি কন্যা রেবতীর উপযুক্ত। রাজা জানতে পারেন যে পৃথিবীর সময় ব্রহ্মলোকের থেকে দ্রুত গতিসম্পন্ন। তাই এখন সত্যযুগ এবং ত্রেতাযুগ সমাপ্ত হয়ে দ্বাপর যুগের সূচনা হয়েছে। রাজা ব্রহ্মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দ্বারকায় উপস্থিত হন এবং বলরামের সহিত রেবতীর বিবাহ দেন।

মূর্তির বিবরণ

পুরাণ মতে বলরাম নীলবস্ত্র পরিহিত, কনক ভুষণ, তার অস্ত্র লাঙল বা হল। তাই তাঁকে "হলধর" ও বলা হয়। কোনো কোনো মূর্তিতে তাঁর হাতে গদা দেখা যায়। তাঁকে কখনো বিষ্ণুর অবতার আবার কখনো শেষনাগের অবতার বলা হয়।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বলরাম কোনো পক্ষ অবলম্বন করেননি। একজন আদর্শ ভ্রাতা হিসেবে বলরাম তুলনাহীন। বাল্যকাল থেকে কৃষ্ণ তাঁকে কম জ্বালাননি। তবু সবকিছু হাসিমুখে সহ্য করেছেন। বহু বিপদে শ্রীকৃষ্ণকে আগলে রেখেছেন। বলরাম অত্যন্ত পত্নীনিষ্ঠ। স্ত্রী রেবতী তার চাইতে ঢের বড়, একেবারে সত্য যুগের নারী। তার প্রতি বলরামের প্রেম এতটাই দৃঢ় যে, তিনি দ্বিতীয় বিবাহের কথা ভাবেনইনি। তার দুই পুত্র নিশথ ও উল্মুক এবং এক কন্যা বৎসলা। বলরাম পূর্বজন্মে ছিলেন রামের ভ্রাতা লক্ষ্মণ। তিনি ভগবান নারায়ণের কাছে অনুরোধ করেন তাকে যেন তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হিসেবে একজন্ম কাটাতে দেওয়া হয়। তাই তিনি দ্বাপরে কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হয়ে জন্ম নেন। বলরামের অস্ত্র এক বিশাল লাঙল। তিনি এ কারণে 'হলধারী' নামেও পরিচিত। তিনি সর্বদা নীলাম্বরধারী। তিনি তুমুল পানাসক্ত ছিলেন। এই আসক্তি নিয়ে অনেকবার অনেক রকম সমস্যাও হয়। তিনি ভীম এবং দুর্যোধনের গুরু। তারা তার কাছে গদাযুদ্ধ শিখেন।

ইতিহাসে বলরাম

মধ্যযুগের ৮ম-১৩দশ শতাব্দীতে নির্মিত মথুরায় প্রাপ্ত বলরাম এর মূর্তি বলরাম হলেন একজন প্রাচীন দেবতা, ভারতীয় ইতিহাসের মহাকাব্য যুগে প্রত্নতাত্ত্বিক এবং মুদ্রাসংক্রান্ত প্রমাণ দ্বারা তার প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়। তার প্রাপ্ত প্রাচীন মূর্তিগুলোতে নাগ (অনেক মাথাওয়ালা সর্প), একটি লাঙ্গল এবং জল দেওয়ার পাত্র রয়েছে যা প্রাচীন কৃষিভিত্তিক সমাজে তিনি পূজিত হতেন তা নির্দেশ করে। মহাভারতের বিভিন্ন পর্বে তার সম্পর্কে কাহিনী রয়েছে। মহাভারতের বন পর্বে উল্লেখিত হয়েছে- বলরাম হলেন বিষ্ণুর অবতার এবং অন্যদিকে, কৃষ্ণ হলেন সমস্ত অবতার এবং অস্তিত্বের উৎস। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের কিছু শিল্পকর্মে, গুজরাটের মন্দির এবং অন্যত্র প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু বলা হয়েছে- বলদেব হলেন বিষ্ণুর অষ্টম অবতার, যিনি বুদ্ধের (বৌদ্ধধর্ম) এবং অরিহন্তের (জৈনধর্ম) পূর্ববর্তী।

সুভদ্রা

সুভদ্রা হলেন হিন্দু মহাকাব্য মহাভারতের এবং ভাগবত পুরাণের মতো প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলোতে উল্লেখিত একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।

তিনি কৃষ্ণের ভগিনী, অর্জুনের স্ত্রী(পত্নী) এবং অভিমন্যুর মাতা। সুভদ্রা পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ (জগন্নাথ হিসাবে) এবং বলরাম (বা বলভদ্র) সহ পূজিত তিন দেবতার মধ্যে একজন। বার্ষিক রথযাত্রার একটি রথ তাকে উৎসর্গ করা হয়।

ব্যুৎপত্তি এবং এপিথেটস

'সু' ও 'ভদ্র' দুটি শব্দের সমন্বয়ে 'সুভদ্রা' শব্দটি গঠিত। অনেক পণ্ডিত এই নামটিকে 'মহিমান্বিত', 'সৌভাগ্যবান', 'অপূর্ব' বা 'শুভ' ভাষায় অনুবাদ করেছেন।

- চিত্রা- পাঠ্য হরিবংশ তার জন্ম নাম হিসাবে চিত্রা (আক্ষরিক অর্থে: উজ্জ্বল, পরিষ্কার, চমৎকার বা রঙিন) উল্লেখ করেছে।
- ভদ্রা- বলভদ্রের বোন
- বীর সোদ্রি- একজন বীরের বোন (কৃষ্ণ)
- বীর পত্নী- একজন বীরের স্ত্রী (অর্জুন)
- বীর মাতা- একজন বীরের মা (অভিমন্যু)
- বলরাম সোদ্রি- বলরামের বোন

সুভদ্রাকে প্রায়শই বৃষ্ণী দেবী একানংশা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, এবং এইভাবে এটি তার অন্য নাম হিসাবে বিবেচিত হয়।

জন্ম

কৃষ্ণের পিতা বসুদেবের ঔরসে রোহিণীর গর্ভে তার জন্ম হয়। তাই, তিনি ছিলেন বলরামের সহোদরা এবং কৃষ্ণের বৈমাত্রেয় বোন।

বিবাহ

অর্জুন ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করে ঘুরতে ঘুরতে দ্বারকায় আসেন। পরে এক উৎসব উপলক্ষে কৃষ্ণের সাথে ইনি রৈবত পর্বতে যান। সেখানে অর্জুনকে যাদবরা সংবর্ধনা দেন। উক্ত অনুষ্ঠানে অর্জুন সুভদ্রাকে দেখে মুগ্ধ হন। অর্জুনের মনোভাব জানতে পেরে কৃষ্ণ এই বিবাহে সাহায্য করার অঙ্গীকার করেন। সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শেষে সুভদ্রা যখন ঘরে ফিরছিলেন তখন কৃষ্ণের পরামর্শে অর্জুন সুভদ্রাকে অপহরণ করে ইন্দ্রপ্রস্থে নিয়ে আসেন। এতে বলরাম ক্ষুব্ধ হয়ে অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার আয়োজন করলে, কৃষ্ণ তাকে নিবৃত্ত করেন। পরে দ্বারকায় সত্যভামার উদ্যোগে মহাসমারোহে অর্জুনের সাথে সুভদ্রার বিবাহ হয়।

প্রদীপ কুমার সাহা
সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ
সূত্র: ইন্টারনেট

ন্যাশনাল লাইফের আইসিএবি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড অর্জন

২০২৩ সালে সেরা বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য ন্যাশনাল লাইফ ইনস্যুরেন্স ২৪ তম আইসিএবি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে। ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ হোটেল সোনারগাঁও এ আয়োজিত পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ থেকে ন্যাশনাল লাইফের সিইও মোঃ কাজিম উদ্দিন ও সিএফও প্রবীর চন্দ্র দাস এফসিএ উক্ত অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেন।

দেশের জীবন বীমা সেক্টরে একমাত্র ন্যাশনাল লাইফ ইনস্যুরেন্স দ্বিতীয় বারের মতো এই অ্যাওয়ার্ড অর্জন করলো।

ন্যাশনাল লাইফ ইনস্যুরেন্স পিএলসি

নিশ্চিত ভবিষ্যতের সুহৃদ সাথী

HOYA
SURGICAL OPTICS

THE FASTEST GROWING IOL COMPANY IN THE WORLD

Sontosh Chandra Nath

Managing Director & CEO

Alpha Vision Limited

Executive Member
- Switzerland Bangladesh Chamber of Commerce & Industry

Member
- Transparency International Bangladesh -TIB
- Apex Bangladesh Foundation
- The Comilla Club
- Iskcon

- **Secretary General**
  Ophthalmic Products Importers & Owners Association of Bangladesh

শ্রী শ্রী রামঠাকুরের পত্রাবলী

কেশব সেন

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-চতুর্থোঽধ্যায়ঃ / জ্ঞান যোগ

ঠাকুরের অমূল্য উপদেশ ও নির্দেশ প্রচুর পরিমাণে ছড়িয়ে আছে অনুসারী আশ্রিত এবং ভক্তদের নিকট লেখা তাঁর অজস্র চিঠিপত্রে। তাঁর উপদেশ ও শাস্ত্রবচন সম্বল করে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে তাঁর অনুসারী আশ্রিতরা নিশ্চিতভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন জ্ঞানালোকে –কি জাগতিক কি আধ্যাত্মিক কর্মানুষ্ঠানে।

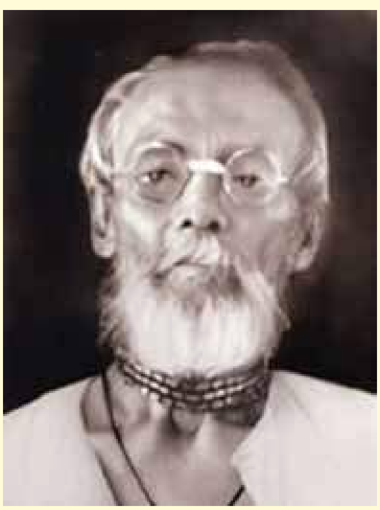

ঠাকুরের ইহলোক ত্যাগের পর আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রেক্ষাপটে একান্ত প্রাসঙ্গিক এমন ৮০৭টি চিঠি 'বেদবাণী' শিরোনামে তিন খন্ডে সংকলন ও প্রকাশ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ডক্টর ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই চিঠিগুলির কোনওটিতে এমন একটি শব্দও নেই যা কোনও ব্যক্তিকে বা কারও বিশ্বাসকে আঘাত করতে পারে। সীমাহীন আনন্দ–ভরা জগতের প্রবেশপথ জানতে আগ্রহী যে কোনও ব্যক্তির পথনির্দেশিকা হতে পারে এই চিঠিগুলো।

তিনি বলতেনঃ 'তোমার ভাগ্যকে অনুসরণ কর। বিশ্বাস রাখ ঈশ্বরের উপর। সত্যনারায়ণের চরণ আশ্রয় করে থাক। জাতি, ধর্ম, মানসিক গঠন যাই হোক না কেন, সমস্ত মানুষ এক ও একটিমাত্র সম্প্রদায়ের অংশ – মানবসম্প্রদায়। সৎপ্রেম ও নিষ্ঠার সঙ্গে তার নিজের ধর্ম অবলম্বন করেই প্রত্যেকেই পারে তাঁর চরণপ্রান্তে পৌঁছে যেতে।' বিশেষ একটি উপলক্ষে তিনি বলেছিলেনঃ 'নাস্তিক হলে অন্যায় কী? আমাদের অপরিহার্য আদর্শ হওয়া উচিত সৎ থাকা এবং নির্ভেজাল বিশ্বাস ও প্রত্যয়কে অটুট রাখা'।

শ্রীশ্রীরামঠাকুর তাঁর সমস্ত আশ্রিতদের কাছে ছিলেন নিকটতম ও প্রিয়তম এক পরমাত্মীয় হয়ে। গুরু–শিষ্য সম্পর্ক গড়ার কোনও ইচ্ছা তাঁর কখনও ছিল না। একজন নিকট ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মতো তিনি তাঁর অজস্র চিঠির মাধ্যমে তাঁর অনুগামী ভক্তদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন–এমন কী যখন তিনি বহু দূরে থাকতেন তখনও। সাংসারিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও অন্যান্য বিষয়ে তাঁর আশ্রিতদের অনেক কিছুই জানার থাকত। শ্রীশ্রীঠাকুর একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে লেখা চিঠিপত্রের মাধ্যমে তাঁর মূল্যবান উপদেশ ও বাণী পাঠিয়ে দিতেন। এই সংগৃহীত চিঠিপত্রের সংকলিত গ্রন্থই বেদবাণী যা তিনখণ্ডে প্রকাশিত।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডক্টর ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বেদবাণী' প্রথম খন্ডের ভূমিকায় লিখেছেনঃ 'প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে আমি এই পত্রাবলী সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করি এবং ব্যক্তিগত কথাগুলি বর্জন করিয়া

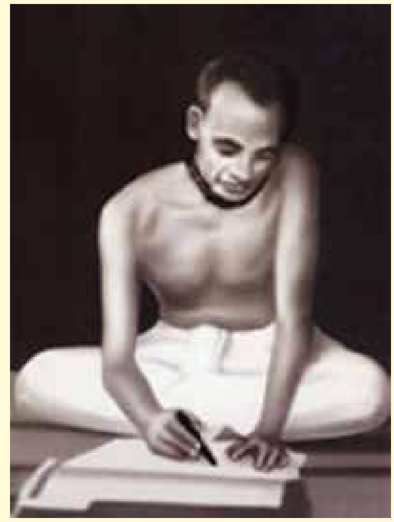

সারাংশসমূহ তাঁহার নিজস্ব ভাষায় লিখিয়া রাখি। যতদূর স্মরণ হয় প্রায় ৩ বৎসর এই কার্যে ব্রতী ছিলাম। এই সংগ্রহ আমি আমার নিজের জন্যই করিয়াছিলাম এবং তখন মনে হইয়াছিল যে, যাহা হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট। ইহা সাধারণে প্রচার করিবার ইচ্ছা আমার আদৌ ছিল না এবং এবিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে কখনও কোন আলোচনা করি নাই। অবশ্য অনেকেই এই সংগ্রহ আমার নিকট হইতে নকল করিয়া নিয়াছেন এবং নকলের নকলও অনেক হইয়াছে বলিয়া জানি।

কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রকট লীলা সম্বরণের পর যে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে এই পত্রাবলী স্থায়ীভাবে সংরক্ষনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি এবং নূতন উদ্যমে এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। অনেকেই অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকট শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত পত্রাবলী পাঠাইতেছেন এবং আরও অনেক পত্র ভবিষ্যতে আমার হাতে আসিবে এরূপ মনে হয়। কিন্তু ইহার জন্য অনির্দ্দিষ্টকাল অপেক্ষা করিয়া থাকা সঙ্গত মনে না হওয়ায় কতকগুলি পত্রের

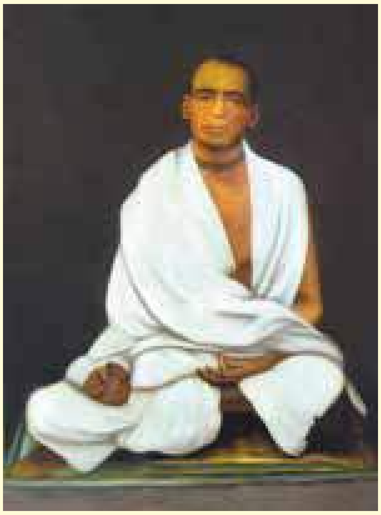

সার সংগ্রহ লইয়া এই প্রথম খন্ড প্রকাশিত হইল। আমি ভরসা করি যে, ভবিষ্যতে এরূপ আরও দুই-তিন খন্ড প্রকাশ করিতে পারিব।'

অবশ্য, তৃতীয় খন্ড প্রকাশ করার যে স্বপ্ন ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছিল তা অসম্পূর্ণ থেকে যায় কারণ ১৯৫৬ সালের ১৩ই নভেম্বর (বঙ্গাব্দ ১৩৬৩-র ২৭শে কার্তিক) মধ্যরাত্রে কৈবল্যলোকের ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁকে চলে যেতে হয়। তাঁর অসম্পূর্ণ মহান স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে এগিয়ে আসে যাদবপুরে শ্রীশ্রীকৈবল্যধাম। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ডঃ গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায় 'বেদবাণী, সাধ্য ও সাধনতত্ত্ব' গ্রন্থের উপক্রমণিকায় বলেছেনঃ "ভারতবর্ষের আধ্যাত্ম-সাধনার মূল উৎস হইল বেদ অর্থাৎ বিশুদ্ধতম অপৌরুষেয় জ্ঞান। সেই বেদ-বাণীই আবার যুগে যুগে, কালে কালে নানা বিশিষ্ট মহাপুরুষের কণ্ঠে উৎসারিত হইয়া আসিতেছে এই পুণ্যভূমিতে এবং তাহার দ্বারাই আজও আমাদের আধ্যাত্ম-বিজ্ঞান সঞ্জীবিত, সুরক্ষিত ও সুবাহিত হইয়া আসিতেছে। বর্তমান যুগে আমাদের এই বঙ্গভূমিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন শ্রীশ্রীরামঠাকুর এবং অগণিত আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী মানুষ ও সেই সঙ্গে কিছু জ্ঞানী মানুষও তাঁহার আশ্রয় লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। বাহিরের দিক দিয়া তাঁহার লেখাপড়া তেমন কিছু ছিল না। জ্ঞানের পরিধিও তেমন বিস্তৃত ছিল না অথচ তিনি ছিলেন জ্ঞানীশিরোমণি।... ...মুল যে অমূল্য বস্তুটি তিনি সকলকে দান করিয়া গিয়াছেন অকাতরে, নির্বিচারে, উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মুর্খ নির্বিশেষে, সেটি হইল তাঁহার এই বেদবাণী। সে-বেদবাণীর মাধ্যমে তিনি শুধু চাহিয়াছেন সকলের বোধের উদ্বোধন, জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন। সজাগ ও সদাসতর্ক হইয়া জীবনের পর্যবেক্ষণ বা পর্যালোচনা।"

বেদবাণী প্রথম খন্ডের ভূমিকায় ডক্টর ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত পরিষ্কার করে বলেছেনঃ

'আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে, শ্রদ্ধা সহকারে এই পত্রাংশগুলি পুনঃপুনঃ পড়িলে ইহার মর্মার্থ ক্রমেই পরিস্ফুট হইয়া উঠে এবং যত বেশী পড়া যায় ততই নূতন নূতন ভাবের উদ্দীপন হইয়া থাকে।'

সংগৃহীত

লেখক : আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ

দেবী সন্তোষী মাতা

মৌসুমী রায়

সন্তোষী মাতাকে "সন্তুষ্টির মা" হিসেবে পূজিত করা হয়। সন্তোষী মাতাকে বিশেষ করে উত্তর ভারত ও নেপালের নারীরা পূজা করেন। একটি ব্রত (আচারিক উপবাস) যাকে বলা হয় সন্তোষী মা ব্রত, পরপর ১৬টি শুক্রবার মহিলাদের দ্বারা সম্পাদিত হয়, দেবীর অনুগ্রহ লাভ করে।

সন্তোষী মাতা ১৯৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে দেবী হিসেবে আবির্ভূত হন। তার প্রার্থনা প্রাথমিকভাবে মুখের কথা, ব্রত-প্যামফলেট সাহিত্য এবং পোস্টার আর্টের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। তার ব্রত উত্তর ভারতীয় মহিলাদের কাছে জনপ্রিয়তা লাভ করে। যাইহোক, এটি ছিল ১৯৭৫ সালের বলিউড ফিল্ম জয় সন্তোষী মা-দেবী এবং তার প্রবল ভক্ত সত্যবতীর গল্প বর্ণনা করে-যা তখনকার এই স্বল্প পরিচিত "নতুন" দেবীকে ভক্তি উৎসাহের উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল। ছবিটিতে দেবীকে জনপ্রিয় হিন্দু দেবতা গণেশের কন্যা হিসাবে চিত্রিত করেছিল এবং তাকে রক্ষা বন্ধন উৎসবের সাথে সম্পর্কিত করেছিল।

সন্তোষী মাতার আবির্ভাব ১৯৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে উত্তর ভারতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে থাকা পাঁচটি মন্দির প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। তার আইকনোগ্রাফিও এই সময়ের মধ্যে স্ফটিক করা হয়েছিল এবং ধীরে ধীরে পোস্টার আর্টের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল। মুখের কথা, প্যামফলেট সাহিত্য এবং পোস্টার আর্টের মাধ্যমে তার ধর্ম নারীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। 'জয় সন্তোষী মা'র পরিচালক বিজয় শর্মার স্ত্রী, যিনি তার স্বামীকে "দেবীর বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার" অনুরোধ করেছিলেন।

"যেহেতু তার চলচ্চিত্র তাকে জীবন্ত করে তুলেছিল, সন্তোষী মা দ্রুত ভারতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যাপকভাবে পূজিত দেবী হয়ে ওঠেন, লক্ষ লক্ষ হিন্দু বাড়ির বেদী কক্ষে পোস্টার-আর্ট আকারে তার স্থান গ্রহণ করেন। তবুও এটা ভাবা কঠিন যে সন্তোষী মা এত লোককে তাৎক্ষণিক তৃপ্তি দিতে পারতেন যদি তিনি দেবীর একটি বৃহত্তর এবং ইতিমধ্যেই সু-সমন্বিত সংস্কৃতির অংশ না হতেন, তার নতুন ভক্তরা অবিলম্বে তার বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিনতে পারতেন গুণাবলী এবং সেগুলি গভীরভাবে অনুভব করে, কারণ সে সেগুলিকে অন্যান্য দেবদেবীর সাথে ভাগ করেছে অনেক আগে থেকেই তাদের সাথে পরিচিত।" সন্তোষী মাতার মূর্তিটি হিন্দু দেবদেবীদের পরিচিত রূপ থেকে উপাদান গ্রহণ করেছে। সন্তোষী মাতার চারিত্রিক ভঙ্গি একটি পদ্মের উপর দাঁড়ানো বা বসা দেবী লক্ষ্মী (শ্রী)-এর প্রতিচ্ছবি। তার ধারণ করা

অস্ত্র-তলোয়ার এবং ত্রিশূল-দেবী দুর্গার ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য। সমাজবিজ্ঞানী বীণা দাসের মতে, জয় সন্তোষী মা থেকে সন্তোষী মাতা এবং সত্যবতীর গল্পটি সতী অনুসূয়ার মতো প্রাচীন হিন্দু কিংবদন্তি থেকে ধার করা হয়েছে, যারা ঈর্ষান্বিত দেবী ত্রয়ী এবং দেবী মনসার প্রবল ভক্তের গর্বকে নত করেছিলেন। —যাকে তার পৃষ্ঠপোষক মনসার পূজা করার জন্য তার পরিবার এবং অন্যান্য দেবদেবীদের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়।

জয় সন্তোষী মা মুক্তির আগে যোধপুরে সন্তোষী মাতাকে উৎসর্গ করা একটি মন্দির বিদ্যমান ছিল, ১৯৬৭ সালের আগে, একই মন্দিরটি লাল সাগর কি মাতা নামক একটি দেবীকে উৎসর্গ করা হয়েছিল-লাল সাগর হ্রদের মা , যার তীরে মন্দিরটি অবস্থিত। যাইহোক, লাল সাগর কি মাতা নিরামিষাশী সন্তোষী মাতা থেকে ভিন্ন, পশু বলি দেওয়া হয়েছিল। চলচ্চিত্রের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার সাথে, হিন্দু মন্দিরে সন্তোষী মাতার মূর্তি এবং উপাসনালয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল এবং কিছু ক্ষেত্রে সন্তোষী মাতাকে যোধপুরের মতো অধিপতি দেবতা হিসাবে স্থাপন করা হয়েছিল, অন্যান্য দেবীকে সেই মর্যাদা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

সন্তোষী মাতা সস্তা কাঁচা চিনি এবং ভাজা ছোলা আশা করেছিলেন- "অ-অভিজাত"-এর সাথে যুক্ত-তার ব্রত এবং তার উদার প্রকৃতি তাকে জনসাধারণের কাছে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। ছবিটি সন্তোষী মাতার উপাসনাকে নিরক্ষরদের কাছে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক ছিল, যারা তখন পর্যন্ত লিখিত ব্রত কথা (ব্রত সম্পর্কিত কিংবদন্তি) জানতে পারেনি।

ব্রত

সন্তোষী মাতা ব্রত বা ভক্তিমূলক উপবাস পরপর ১৬টি শুক্রবার বা নিজের ইচ্ছা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত পালন করা হয়। ভক্তের উচিত সন্তোষী মাতার একটি পূজা করা এবং তাকে ফুল, ধূপ এবং এক বাটি কাঁচা চিনি এবং ভাজা ছোলা (গুড়-চানা) নিবেদন করা উচিত। ভক্ত ভোরে ঘুম থেকে উঠে দেবীকে স্মরণ করে। উপবাসের দিনে শুধুমাত্র একটি খাবার গ্রহণ করা হয়, এবং ভক্তরা তেতো বা টক খাবার খাওয়া এড়িয়ে যায় এবং অন্যদেরকে এগুলি পরিবেশন করে, কারণ টক বা তিক্ত খাবার কিছুটা আসক্তিযুক্ত এবং তৃপ্তিতে বাধা দেয়। যখন ইচ্ছা মঞ্জুর করা হয়, তখন একজন ভক্তকে অবশ্যই একটি উদ্যাপন ("উপসংহারে আনা") অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে, যেখানে আটজন ছেলেকে উৎসবের খাবার পরিবেশন করা হবে।

এই ধরনের উপাসনায়, ভক্তকে ঝগড়া এড়ানো এবং কাউকে আঘাত করার মতো অন্যান্য কঠোরতা অনুসরণ করতে হবে। এই ব্রতের মাধ্যমে মানুষ সম্প্রীতির সাথে বসবাস করতে পারে কারণ মানুষের জীবনে বিশ্বাসকে উপেক্ষা করা, মিথ্যা বলা, অহংকারী আচরণ করা ইত্যাদি খারাপ অভ্যাস দূর করা যায়। এই ব্রত ভক্তকে প্রেম, সহানুভূতি এবং সুখ ছড়িয়ে দিতে শেখায়।

কিংবদন্তি

একজন বৃদ্ধা মহিলার সাতটি পুত্র ছিল, যার মধ্যে কনিষ্ঠটি ছিল দায়িত্বজ্ঞানহীন তাই তিনি তাকে তার ভাইয়ের খাবারের অবশিষ্টাংশ তার প্রতিদিনের খাবার হিসাবে পরিবেশন করেছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্রের স্ত্রী এটি জানতে পেরে তার স্বামীকে জানান, যিনি তার ভাগ্য অন্বেষণে বাড়ি ছেড়েছিলেন। তিনি একজন বণিকের সাথে কাজ অর্জন করেছিলেন এবং ধনী হয়েছিলেন, কিন্তু তার স্ত্রীর কথা ভুলে গিয়েছিলেন। স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রীকে শ্বশুরবাড়ির লোকজন নির্যাতন করত। একবার, তিনি ষোল সপ্তাহের সন্তোষী মা ব্রত সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন এবং তা সম্পাদন করেছিলেন। ফলে সন্তোষী মাতা তার স্বামীর স্বপ্নে আবির্ভূত হন এবং তাকে তার স্ত্রীর দুর্দশার কথা জানান। তিনি ধনী বাড়িতে ফিরে আসেন এবং তার স্ত্রীর সাথে একটি পৃথক পরিবার স্থাপন করেন। ব্রতের উদযাপন অনুষ্ঠানে, শ্বশুরবাড়ির লোকেরা স্ত্রীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল এবং সন্তোষী মাতাকে বিরক্ত করে আট ছেলেকে টক খাবার পরিবেশন করেছিল। ফলে তার স্বামীকে গ্রেফতার করা হয়। স্ত্রী পুনরায় ব্রত উদযাপন করলেন । তার স্বামী কারাগার থেকে মুক্তি পান এবং তিনি শীঘ্রই একটি পুত্রের জন্ম দেন। একবার, দেবী একটি ভয়ঙ্কর আকারে পরিবার পরিদর্শন করেছিলেন; শ্বশুরবাড়ি পালিয়ে যাওয়ার সময় স্ত্রী দেবীকে চিনতে পেরে পূজা করেন। এরপর শ্বশুরবাড়ির লোকজন দেবীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং পুরো পরিবারকে দেবীর আশীর্বাদ করা হয়।

সংগৃহীত

লেখক : সাধারণ সদস্য
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

অঞ্জলী সরকার

শ্রীকৃষ্ণ হলেন সনাতন হিন্দুধর্মে পরম পুরুষোত্তম ভগবান। পুরাণ অনুযায়ী তিনি বিষ্ণুর অষ্টম অবতার। তাঁকে সর্বোচ্চ ঈশ্বর (পরম সত্ত্বা) উপাধিতে ভূষিত করা হয় এবং তিনি ভগবদ গীতা-এর প্রবর্তক। ভদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে তাঁর জন্মোৎসব পালন করা হয়।

সনাতন ধর্মাবলম্বী, বিশেষত বৈষ্ণবদের কাছে জন্মাষ্টমী গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। এই উৎসব নানাভাবে উৎযাপন করা হয়, যেমন- ভগবত পুরাণ অনুযায়ী নৃত্য, নাটক যাকে বলা হয় রাসলীলা বা কৃষ্ণলীলা, মধ্যরাত্রি তে কৃষ্ণের জন্মের মুহূর্তে ধর্মীয় গীত গাওয়া, উপবাস, দহিহাড়ি প্রভৃতি।

অন্যদিকে দহিহাড়ি প্রথায় অনেক উঁচুতে মাখনের হাড়ি রাখা হয় এবং অনেক ছেলে মিলে মানুষের পিরামিড তৈরি করে সেই হাড়ি ভাঙ্গার চেষ্টা করে। তামিলনাড়ুতে এ প্রথা উড়িয়াদি নামে পরিচিত।

জন্মাষ্টমী বিশেষভাবে পালন করা হয় মথুরা এবং বৃন্দাবনে। তাছাড়া মণিপুর, আসাম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে যেখানে প্রচুর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মানুষ থাকেন সেখানে পালন করা হয়।এছাড়াও বাংলাদেশের ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলা ও গ্রাম পর্যায়ে জন্মাষ্টমী পালন করা হয়।

তিনি ধর্মরাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব দানকারী একজন প্রাচীন ভারতীয় রাজপুত্র ও রাজার ভূমিকায় আজ থেকে প্রায় ৫০০০ বৎসর পূর্বে অবতীর্ণ হন। ভিন্ন ধর্মের লোকেরা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করে থাকেন।

কৃষ্ণ শব্দের আক্ষরিক অর্থ কালো বা ঘন নীল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের হরে

কৃষ্ণ মহামন্ত্রে, কৃষ্ণ শব্দটির আভিধানিক অর্থ সর্বাকর্ষক।

ভাগবত পুরাণে কৃষ্ণকে প্রায়শই বংশী-বাদনরত এক কিশোরের রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।] আবার ভগবদ গীতায়, তিনি এক পথপ্রদর্শক রূপে দণ্ডায়মান। সমগ্র মহাভারত কাব্যে, তিনি একজন কূটনীতিজ্ঞ হিসাবে পাণ্ডব পক্ষে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনের রথের সারথিরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। দর্শন ও ধর্মতাত্ত্বিক ঐতিহ্যে শ্রীকৃষ্ণ-সংক্রান্ত উপাখ্যানগুলি বহুধা পরিব্যাপ্ত। তিনি একাধারে দেবগুণা শিশু, রঙ্গকৌতুকপ্রিয়, আদর্শ প্রেমিক, দিব্য নায়ক ও পরম ঈশ্বর। কৃষ্ণ-সংক্রান্ত উপাখ্যানগুলি মূলত লিখিত আছে মহাভারত, হরিবংশ, ভাগবত পুরাণ ও বিষ্ণু পুরাণ গ্রন্থে।

চতুর্থ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকেই বাসুদেব, কৃষ্ণ ও গোপাল প্রভৃতি কৃষ্ণের বিভিন্ন রূপের উপাসনাকারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। খ্রিষ্টীয় নবম শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতে কৃষ্ণভক্তি আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। উত্তর ভারতে কৃষ্ণধর্ম সম্প্রদায়গুলি সুপ্রতিষ্ঠিত হয় মোটামুটি একাদশ শতাব্দী নাগাদ। দশম শতাব্দী থেকেই ভক্তি আন্দোলনের ক্রমবিস্তারের ফলে কৃষ্ণ শিল্পকলার এক মুখ্য বিষয় হয়ে ওঠেন। ওড়িশায় জগন্নাথ, মহারাষ্ট্রে বিঠোবা, রাজস্থানে শ্রীনাথজি, অন্ধ্রপ্রদেশে ভেঙ্কটেশ বালাজী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের রূপগুলিকে কেন্দ্র করে আঞ্চলিক ভক্তিসংস্কৃতিও বিকাশলাভ করে। তার প্রতি নিষ্ঠাযুক্ত ভক্তি ও তার অপ্রাকৃত লীলা থেকে সহজেই উপলব্ধি করতে পারা যায় যে তিনিই পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং।

রূপেও পূজিত হন কৃষ্ণ

সংস্কৃত কৃষ্ণ শব্দটির শাব্দিক অর্থ কালো, ঘন বা ঘন-নীল। শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহগুলোতে তার গায়ের রং সাধারণত কালো এবং ছবিগুলিতে নীল দেখানো হয়ে থাকে।

কৃষ্ণ নামের অর্থ-সংক্রান্ত একাধিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। মহাভারতের উদ্যোগপর্বে বলা হয়েছে কৃষ্ণ শব্দটি কৃষ এবং ণ এই দুটি মূল থেকে উৎপন্ন। কৃষ শব্দের অর্থ টেনে আনা বা কর্ষণ করা; সেই সূত্রে শব্দটি ভূ (অর্থাৎ, অস্তিত্ব বা পৃথিবী) শব্দটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ণ শব্দটিকে নিবৃত্তি শব্দের প্রতিভূ ধরা হয়। মহাভারতের উক্ত শ্লোকটি চৈতন্য চরিতামৃত ও শ্রীল প্রভুপাদের টীকায় ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে ভূ শব্দটির নিহিত অর্থ আকর্ষণীয় অস্তিত্ব; অর্থাৎ কৃষ্ণ শব্দের অর্থ সকল দিক থেকে আকর্ষণীয় ব্যক্তি। ভাগবত পুরাণের আত্মারাম স্তবে কৃষ্ণের গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে। বল্লভ সম্প্রদায়ের ব্রহ্মসম্ভব মন্ত্রে কৃষ্ণ নামের মূল শব্দগুলিকে বস্তু, আত্মা ও দিব্য কারণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পাপের বিনাশশক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত বলে উল্লিখিত হয়েছে।

বিষ্ণু সহস্রনামের ৫৭তম নামটি হল কৃষ্ণ, যার অর্থ, আদি শঙ্করের মতে আনন্দের অস্তিত্ব। কৃষ্ণের একাধিক নাম ও অভিধা রয়েছে। কৃষ্ণের সর্বাধিক প্রচলিত নামদুটি হল গোবিন্দ (গো-অন্বেষক) ও গোপাল (গো-রক্ষাকারী)। এই নামদুটি ব্রজে কৃষ্ণের প্রথম জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কোনো কোনো নামের আঞ্চলিক গুরুত্বও রয়েছে। যেমন, জগন্নাথ নামটি। ওড়িশায় এই নামে একটি বিশেষ বিগ্রহে পূজিত হন কৃষ্ণ। জগন্নাথ রূপ ধারনটিও কৃষ্ণের আরেকটি লীলা।

মূর্তিতত্ত্ব

শ্রীকৃষ্ণের অধিকাংশ বিগ্রহেই তার গায়ের রং কালো দেখা যায়; অন্যদিকে ছবিগুলিতে প্রধানত তার গায়ের রং ঘন নীল। তার রেশমি ধুতিটি সাধারণত হলুদ রঙের এবং মাথার মুকুটে একটি ময়ূরপুচ্ছ শোভা পায়। কৃষ্ণের প্রচলিত বিগ্রহগুলোতে সাধারণত তাঁকে বংশীবাদনরত এক বালক বা যুবকের বেশে দেখা যায়। এই বেশে তার একটি পা অপর পায়ের উপর ঈষৎ বঙ্কিম অবস্থায় থাকে এবং বাঁশিটি তার ঠোঁট পর্যন্ত ওঠানো থাকে। তাঁকে ঘিরে থাকে গোরুর দল; এটি তার দিব্য গোপালক সত্ত্বার প্রতীক। কোনো কোনো চিত্রে তাকে প্রেয়সী রাধা সহ গোপী-পরিবৃত অবস্থাতেও দেখা যায়। রাধা হলেন কৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি।

অষ্টসখি সহ রাধা-কৃষ্ণ কৃষ্ণের অপর একটি পরিচিত চিত্র হল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রে ভগবদ্গীতায় অর্জুনকে পরমার্থ উপদেশ দেওয়ার ছবি। এই চিত্রে তার যে বিশ্বরূপ দর্শিত হয় তার অনেকগুলি বাহু ও মাথা। এর মধ্যে সুদর্শন চক্র-ধারী বিষ্ণুর একটি ছায়া বিদ্যমান। উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুরে ৮০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে অঙ্কিত একটি গুহাচিত্রে অশ্বচালিত রথচালনার চিত্র আছে; সেই চিত্রে একটি চরিত্র রথের চাকা ছুঁড়তে উদ্যত। এই চরিত্রটিকে কৃষ্ণ বলে অভিহিত করা হয়।

মন্দিরে পূজিত কৃষ্ণবিগ্রহগুলো প্রধানত দণ্ডায়মান অবস্থার। কোথাও কোথাও কৃষ্ণ একা; আবার কোথাও কোথাও তার অন্যান্য সঙ্গীরাও তার সঙ্গে পূজিত হন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাধা, বলরাম ও সুভদ্রা অথবা তার প্রধানা মহিষী রুক্মিণী ও সত্যভামা।

কৃষ্ণ কখনও কখনও তার সহচরী গোপিনী রাধার সঙ্গেও পূজিত হন। মণিপুরী বৈষ্ণবরা একা কৃষ্ণের পূজা করেন না; তাদের আরাধ্য রাধা ও কৃষ্ণের যুগলমূর্তি রাধাকৃষ্ণ। রুদ্রও নিম্বার্ক সম্প্রদায়, এবং স্বামীনারায়ণের মতেও এই প্রথা বিদ্যমান। গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা রাধারমণ রূপে রাধাকৃষ্ণের আরাধনা করে থাকেন ।

কোথাও কোথাও শিশুর মূর্তিতেও পূজিত হন কৃষ্ণ। এই মূর্তিতে তাকে হামাগুড়ি দিতে, অথবা নৃত্যরত অবস্থায়, অথবা মাখন হাতে দেখা যায়। অঞ্চলভেদেও কৃষ্ণের বিভিন্ন প্রকার মূর্তি দেখা যায়। যেমন ওড়িশায় জগন্নাথ, মহারাষ্ট্রে বিঠোবা, ও রাজস্থানে শ্রীনাথজি।

শিশু কৃষ্ণকে স্নান করাচ্ছেন যশোদা, ভাগবত পুরাণের পশ্চিম ভারতীয় পুঁথিচিত্র

ভারতীয় মহাকাব্য মহাভারতে কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতাররূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থই প্রাচীনতম গ্রন্থ যেখানে ব্যক্তি কৃষ্ণ বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই গ্রন্থের অনেক উপাখ্যানের কেন্দ্রীয় চরিত্র হলেন কৃষ্ণ। এর ষষ্ঠ পর্বের (ভীষ্ম পর্ব) আঠারোটি অধ্যায় ভগবদ্গীতা নামে পৃথক ধর্মগ্রন্থের মর্যাদা পেয়ে থাকে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রে যোদ্ধা অর্জুনকে প্রদত্ত কৃষ্ণের উপদেশাবলির সংকলনই হল ভগবদ্গীতা। মহাভারতে কৃষ্ণকে পূর্ণবয়স্ক পুরুষ রূপে দেখানো হলেও, কোথাও কোথাও তার বাল্যলীলারও আভাস দেওয়া হয়েছে। মহাভারতের পরবর্তীকালীন পরিশিষ্ট হরিবংশ গ্রন্থে কৃষ্ণের বাল্য ও কৈশোরের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

১৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে রচিত পতঞ্জলির মহাভাষ্য গ্রন্থে এই শ্লোকে বলা হয়েছে: "সঙ্কর্ষণের সহচর কৃষ্ণের শক্তি বৃদ্ধি হউক!" অন্য একটি শ্লোকে বলা হয়েছে, "কৃষ্ণ স্বয়ং যেন চতুর্থ" (তিন সহচর সহযোগে কৃষ্ণের কথা বলা হয়েছে, তিন সহচর সম্ভবত সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ)। অপর এক শ্লোকে রাম (বলরাম) ও কেশবের (কৃষ্ণ) মন্দিরে যে সকল বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়ে থাকে সেগুলির উল্লেখ রয়েছে। পতঞ্জলির রচনা থেকে বাসুদেবের কংসবধ (কৃষ্ণ-কংসোপাচারম্) উপাখ্যানের নাট্যাভিনয় ও মূকাভিনয়ের বিবরণ পাওয়া যায়।

খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে পাঁচজন বৃষ্ণি নায়কের পূজার প্রচলনের প্রমাণ পাওয়া গেছে। এঁরা হলেন বলরাম, কৃষ্ণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও শাম্ব। মথুরার নিকটবর্তী মোরা থেকে পাওয়া একটি শিলালিপিতে মহান সত্রপ রাজুভুলার পুত্রের উল্লেখ এবং এক বৃষ্ণির চিত্র পাওয়া গেছে। ইনি সম্ভবত বাসুদেব এবং পঞ্চযোদ্ধার অন্যতম। ব্রাহ্মী লিপিতে লিখিত এই শিলালিপিটি বর্তমানে মথুরা সংগ্রহালয়ে রক্ষিত আছে।

মহাভারত, হরিবংশ ও একাধিক পুরাণে কৃষ্ণের জীবন কাহিনী বর্ণিত হয়েছে বা তার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে মনে রাখা আবশ্যক যে মহাভারত ও হরিবংশই কৃষ্ণকে জানার সবচেয়ে প্রাচীন ও নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। এর বাইরে ভাগবত পুরাণ ও বিষ্ণু পুরাণ গ্রন্থদ্বয়ে কৃষ্ণের জীবনের বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে এই দুই পুরাণ ঐতিহাসিক প্রামাণ্যতার বিচারে মহাভারত ও হরিবংশের পরে অবস্থিত। মুলত এই দুই পুরাণে বর্ণিত ধর্মতত্ত্বই গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদগুলির মূল ভিত্তি। ভাগবত পুরাণ গ্রন্থের প্রায় এক চতুর্থাংশ জুড়ে রয়েছে কৃষ্ণ ও তার ধর্মোপদেশের স্তুতিবাদ।

খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে লিখিত যক্ষের নিরুক্ত নামক ব্যুৎপত্তি- অভিধানে অক্রুরের স্যমন্তক মণির একটি উল্লেখ পাওয়া যায়, যার মূল সূত্র কৃষ্ণ-সংক্রান্ত একটি সুপরিচিত পৌরাণিক কাহিনি।] শতপথ ব্রাহ্মণ ও ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থদ্বয়ে কৃষ্ণকে বৃষ্ণিবংশজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

হিন্দুদের আদি ধর্মগ্রন্থ ঋগ্‌বেদে কৃষ্ণের কোনো উল্লেখ নেই। তবে রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর ঋগ্‌বেদের একটি শ্লোকে উল্লিখিত দ্রপ্স...কৃষ্ণ (কালো বিন্দু) কথাটিকে দেবতা কৃষ্ণের উল্লেখ বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ কয়েকজন প্রাগৈতিহাসিক দেবতার সঙ্গে কৃষ্ণের মিল খুঁজে পেয়েছেন। ১৯২৭-৩১ সাল নাগাদ ম্যাকে মহেঞ্জোদাড়োতে একটি চিত্রলিপি আবিস্কার করেছিলেন। এই চিত্রে দুজন ব্যক্তি একটি গাছ ধরে আছে এবং বৃক্ষ দেবতা তাদের দিকে বাহু প্রসারিত করে রেখেছেন। আবিস্কারক এই চিত্রটিকে কৃষ্ণের যমলার্জুন- লীলার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

পিতা বসুদেব যমুনা পেরিয়ে কৃষ্ণকে বৃন্দাবনে নিয়ে যাচ্ছেন; মধ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর চিত্রকলা

শাস্ত্রীয় বিবরণ ও জ্যোতিষ গণনার ভিত্তিতে লোকবিশ্বাস অনুযায়ী কৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল ৩২২৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের ১৮ অথবা ২১ জুলাই বুধবার। কৃষ্ণের জন্মদিনটি কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী বা জন্মাষ্টমী নামে পালিত হয়। কৃষ্ণ যাদব-রাজধানী মথুরার রাজপরিবারের সন্তান। তিনি বসুদেব ও দেবকীর অষ্টম পুত্র। তার পিতামাতা উভয়ের যাদববংশীয়। দেবকীর দাদা কংস তাদের পিতা উগ্রসেনকে বন্দী করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। একটি দৈববাণীর মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন যে দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তানের হাতে তার মৃত্যু হবে। এই কথা শুনে তিনি দেবকী ও বসুদেবকে কারারুদ্ধ করেন এবং তাদের প্রথম ছয় পুত্রকে হত্যা করেন। দেবকী তার সপ্তম গর্ভ রোহিণীকে প্রদান করলে, বলরামের জন্ম হয়। এরপরই কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন।

জন্ম

কৃষ্ণের জীবন বিপন্ন জেনে জন্মরাত্রেই দৈবসহায়তায় কারাগার থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বসুদেব তাকে গোকুলে তার পালক মাতাপিতা যশোদা ও নন্দের কাছে রেখে আসেন। কৃষ্ণ ছাড়া বসুদেবের আরও দুই সন্তানের প্রাণরক্ষা হয়েছিল। প্রথমজন বলরাম (যিনি বসুদেবের প্রথমা স্ত্রী রোহিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন) এবং সুভদ্রা (বসুদেব ও রোহিণীর কন্যা, যিনি বলরাম ও কৃষ্ণের অনেক পরে জন্মগ্রহণ করেন)। ভাগবত পুরাণ অনুযায়ী, কোনো প্রকার যৌনসংগম ব্যতিরেকেই কেবলমাত্র "মানসিক যোগের" ফলে কৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, সেযুগে এই ধরনের যোগ সম্ভব ছিল।

বাল্য ও কৈশোর

গোবর্ধন গিরি কনিষ্ঠ আঙ্গুলে কৃষ্ণ নন্দ ছিলেন গোপালক সম্প্রদায়ের প্রধান। তার নিবাস ছিল বৃন্দাবনে। কৃষ্ণের ছেলেবেলার গল্পগুলি থেকে জানা যায়, কীভাবে তিনি একজন রাখাল বালক হয়ে উঠলেন, শৈশবেই কৃষ্ণ এতটাই দুর্ধষ আর অপ্রতিরোধ্য প্রকৃতির ছিলেন যে তিনি তার প্রাণনাশের চেষ্টাগুলিকে চমকপ্রদভাবে বানচাল করে দিতে পারতেন এবং বৃন্দাবনবাসীর জীবনরক্ষা করতেন। কৃষ্ণের প্রাণনাশের জন্য কংস পুতনা সহ অন্যান্য রাক্ষসদের প্রেরণ করলে সকলকে হত্যা করেন কৃষ্ণ।

কৃষ্ণের খোঁজ পাওয়া গেলে কংস পুতনা নামক এক রাক্ষসীকে পাঠান শিশুকৃষ্ণকে হত্যা করতে। মাত্র ৬ মাস বয়সেই পুতনা রাক্ষসীকে হত্যা করেন তিনি যাঁর উচ্চতা ছিল ১৮ কিলোমিটার দীর্ঘ। কালীয় নামে একটি বিরাট সাপ যমুনার জল বিষাক্ত করে রেখেছিল। এই জল পান করে রাখাল ও গরুর মৃত্যু হত প্রায়শই। বালক কৃষ্ণ এই কালীয় নাগকে অপরাধের শাস্তি দেয়। হিন্দু চিত্রকলায় অনেক স্থানেই বহুফণাযুক্ত কালীয় নাগের মাথার উপর নৃত্যরত কৃষ্ণের ছবি দেখা যায়। এধরনের দৈত্যাকৃতির শত্রুদের বিরুদ্ধে তার একক হামলা ও তাদের পরাস্ত করার কৌশলাদি যে কোন চৌকশ মেধাবী সামরিক কর্মকর্তার দুর্ধষতাকে হার মানায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, প্রথাগত বৈদিক ধর্ম ও তাঁর দেবদেবীর বিরুদ্ধে কৃষ্ণের এই অবস্থান, আধ্যাত্মিক ভক্তি আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হয়ে ওঠে।

বৃন্দাবনে গোপীদের নিয়ে কৃষ্ণের লীলাও ভারতীয় সাহিত্যের একটি জনপ্রিয় বিষয়। রাধার সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে গীতগোবিন্দম্ রচয়িতা জয়দেব সহ অসংখ্য কবি প্রণয়মূলক কবিতা রচনা করেছেন। রাধাকৃষ্ণ মূর্তিতে কৃষ্ণের পূজা কৃষ্ণভক্তি আন্দোলনের বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

যৌবরাজ্য

যৌবনে মথুরায় প্রত্যাবর্তন করে কৃষ্ণ তার মামা কংসের অনুগামীদের দ্বারা সংঘটিত বহু হত্যার ষড়যন্ত্র থেকে আত্মরক্ষা করে কংসকে বধ করেন। তিনি কংসের পিতা উগ্রসেনকে পুনরায় যাদবকুলের রাজা হিসেবে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন এবং নিজে সেখানে অন্যতম যুবরাজ হিসেবে অবস্থান করেন।এই সময়ে তার সাথে অর্জুন সহ কুরু রাজ্যের অন্যান্য পাণ্ডব রাজপুত্রদের শখ্যতা গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে তিনি যাদবদের নিয়ে দ্বারকা নগরীতে (অধুনা গুজরাত) চলে আসেন এবং সেখানেই তার রাজত্ব স্থাপন করেন।

যখন যুধিষ্ঠির সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তিনি সমস্ত মহান রাজাদের সেই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানান। যখন তিনি তাদের প্রত্যেককে একে একে সম্মান জ্ঞাপন করতে আরম্ভ করলেন তখন তিনি সর্বপ্রথম কৃষ্ণকে সম্মান জ্ঞাপন করলেন কারণ তিনি কৃষ্ণকেই সমস্ত রাজাদের মধ্যে মহান হিসেবে গণ্য করেছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল রাজারাই তাতে সম্মত হলেও কৃষ্ণের আত্মীয় শিশুপাল তাতে অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং কৃষ্ণের নিন্দা শুরু করেন। কৃষ্ণ শিশুপালের মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি শিশুপালের একশত অপরাধ ক্ষমা করবেন। তাই যখন শিশুপাল একশত অপরাধ অতিক্রম করলেন তখন তিনি তার বিরাট রূপ ধারণ করে সুদর্শন চক্রের দ্বারা শিশুপালকে বধ করলেন। সেইসময় অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রও দিব্যদৃষ্টি লাভ করে কৃষ্ণের সেই রূপ দর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পুরাণ অনুসারে শিশুপাল এবং দন্তবক্র নামে অপর এক ব্যক্তি পূর্বজন্মে ছিলেন স্বর্গে দেবতা বিষ্ণুর দ্বাররক্ষক জয় ও বিজয়। তারা অভিশপ্ত হয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং আবার বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণের দ্বারাই স্বর্গে প্রত্যাগমন করেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ও ভগবদ্গীতা

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে কৃষ্ণ অর্জুনকে তার বিশ্বরূপ দর্শন করাচ্ছেন।

যখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে তখন কৃষ্ণ পাণ্ডব এবং কৌরব উভয়পক্ষকেই সুযোগ দেন তার কাছ থেকে সাহায্য হিসেবে দু'টি জিনিসের মধ্যে যেকোন একটি নির্বাচন করতে। তিনি বলেন যে হয় তিনি স্বয়ং থাকবেন অথবা তার নারায়ণী সেনাকে যুদ্ধের জন্য প্রদান করবেন, কিন্তু তিনি নিজে যখন থাকবেন তখন তিনি হাতে অস্ত্র তুলে নেবেন না। পাণ্ডবদের পক্ষে অর্জুন স্বয়ং কৃষ্ণকে গ্রহণ করেন এবং কৌরবদের পক্ষে দুর্যোধন কৃষ্ণের নারায়ণী সেনা গ্রহণ করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় কৃষ্ণ অর্জুনের রথের সারথির ভূমিকা পালন করেন কারণ তার অস্ত্র ধরার কোন প্রয়োজন ছিল না।

যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন যখন উপলব্ধি করলেন যে যাঁরা তার প্রতিপক্ষ তারা তার আত্মীয়বর্গ এবং অত্যন্ত প্রিয়জন তখন তিনি যুদ্ধের বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি সমস্ত আশা ত্যাগ করে তার ধনুক গাণ্ডীব নামিয়ে রাখলেন। তখন অর্জুনের মোহ দূর করার জন্য কৃষ্ণ অর্জুনকে সেই ধর্মযুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উপদেশ দেন যা ভগবদ্গীতা নামে খ্যাত।

কৃষ্ণ ছিলেন প্রখর কূটবুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষ এবং মহাভারতের যুদ্ধ ও তার পরিণতিতে তার প্রগাঢ় প্রভাব ছিল। তিনি পাণ্ডব এবং কৌরবদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করতে যথাসম্ভব উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু দুর্যোধনের কূপ্রচেষ্টায় তার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে তখন তিনি ক্রূর কূটনীতিকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। যুদ্ধকালে পিতৃ-পিতামহের বিরুদ্ধে সঠিক মনোবল নিয়ে যুদ্ধ না করার জন্য তিনি অর্জুনের উপর ক্রুদ্ধ হন। একবার তাকে আঘাত করার অপরাধে কৃষ্ণ একটি রথের চাকাকে চক্রে পরিণত করে ভীষ্মকে আক্রমণ করতে উদ্যত হন। তখন ভীষ্ম সমস্ত অস্ত্র পরিত্যাগ করে কৃষ্ণকে বলেন তাকে হত্যা করতে। কিন্তু এরপর অর্জুন কৃষ্ণের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন এবং পূর্ণ উদ্যম নিয়ে যুদ্ধ করার প্রতিজ্ঞা করেন। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির ও অর্জুনকে নির্দেশ দেন যাতে তারা ভীষ্মের দেওয়া যুদ্ধজয়ের বর ফিরিয়ে দেয়, কারণ ভীষ্ম স্বয়ং সেই যুদ্ধে পাণ্ডবদের প্রতিপক্ষ হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ভীষ্মকে এ কথা জানানো হলে তিনি এ কথার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে পেরে কীভাবে তিনি অস্ত্র পরিত্যাগ করবেন সে উপায় পাণ্ডবদের বলে দেন। তিনি বলেন যে, যদি কোন নারী যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করে তবেই তিনি অস্ত্রত্যাগ করবেন। পরের দিন কৃষ্ণের নির্দেশে শিখণ্ডী, অর্থাৎ যিনি পূর্বজন্মে অম্বা ছিলেন তিনি অর্জুনের সাথে যুদ্ধে যোগদান করেন এবং ভীষ্ম তার অস্ত্রসকল নামিয়ে রাখেন।

এছাড়াও কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রের জামাতা জয়দ্রথকে বধ করতে অর্জুনকে সহায়তা করেন। জয়দ্রথের কারণেই অর্জুনের পুত্র অভিমন্যু দ্রোণাচার্যের চক্রব্যূহে প্রবেশ করেও বেরিয়ে আসার উপায় অজ্ঞাত থাকায় কৌরবদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়েছিলেন। কৃষ্ণ কৌরবদের সেনাপতি দ্রোণাচার্যের পতনও সম্পন্ন করেছিলেন। তিনি ভীমকে নির্দেশ দিয়েছিলেন অশ্বত্থামা নামক হাতিকে বধ করতে এবং তাৎপর্যপূর্ণভাবে দ্রোণাচার্যের পুত্রের নামও অশ্বত্থামা। এরপর কৃষ্ণের নির্দেশে যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্যকে গিয়ে চতুরতার সাথে বলেন যে অশ্বত্থামা নিহত হয়েছেন এবং তারপর খুব মৃদুস্বরে বলেন যে সেটি একটি হাতি। কিন্তু যেহেতু যুধিষ্ঠির কখনও মিথ্যাচার করতেন না তাই দ্রোণাচার্য তার প্রথম কথাটি শুনেই মানসিক ভাবে অত্যন্ত আহত হন ও অস্ত্র পরিত্যাগ করেন। এরপর কৃষ্ণের নির্দেশে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের শিরশ্ছেদ করেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনের রথচালকের ভূমিকায় কৃষ্ণ কর্ণের সাথে অর্জুনের যুদ্ধের সময় কর্ণের রথের চাকা মাটিতে বসে যায়। তখন কর্ণ যুদ্ধে বিরত থেকে সেই চাকা মাটি থেকে ওঠানোর চেষ্টা করলে কৃষ্ণ অর্জুনকে স্মরণ করিয়ে দেন যে কৌরবেরা অভিমন্যুকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে যুদ্ধের সমস্ত নিয়ম ভঙ্গ করেছে। তাই তিনি নিরস্ত্র কর্ণকে বধ করে অর্জুনকে সেই হত্যার প্রতিশোধ নিতে আদেশ করেন।

এরপর যুদ্ধের অন্তিম পর্বে কৌরবপ্রধান দুর্যোধন মাতা গান্ধারীর আশীর্বাদ গ্রহণ করতে যান যাতে তার শরীরের যে অঙ্গসমূহের উপর গান্ধারীর দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হবে তাই ইস্পাতকঠিন হয়ে উঠবে। তখন কৃষ্ণ ছলপূর্বক তার উরুদ্বয় কলাপাতা দিয়ে আচ্ছাদিত করে দেন। এর ফলে গান্ধারীর দৃষ্টি দুর্যোধনের সমস্ত অঙ্গের উপর পড়লেও উরুদ্বয় আবৃত থেকে যায়। এরপর যখন দুর্যোধনের সাথে ভীম গদাযুদ্ধে লিপ্ত হন তখন ভীমের আঘাত দুর্যোধনকে কোনভাবে আহত করতে ব্যর্থ হয়। তখন কৃষ্ণের ইঙ্গিতে ভীম ন্যায় গদাযুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করে দুর্যোধনের উরুতে আঘাত করেন ও তাকে বধ করেন। এইভাবে কৃষ্ণের অতুলনীয় ও অপ্রতিরোধ্য কৌশলের সাহায্যে পাণ্ডবেরা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ জয় করে। এছাড়াও কৃষ্ণ অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিতের প্রাণরক্ষা করেন, যাকে অশ্বত্থামা মাতৃগর্ভেই ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করে আঘাত করেছিলেন। পরবর্তীকালে পরীক্ষিতই পাণ্ডবদের উত্তরাধিকারী হন।

গার্হস্থ্য জীবন

একমতে শ্রীকৃষ্ণের ১৬১০৮ জন স্ত্রী ছিলেন । যাদের মধ্যে বৈবাহিকসূত্রে প্রধান স্ত্রী ছিলেন আটজন (অষ্টভার্য) এবং বাকি ১৬১০০ জন ছিলেন নরকাসুরের অন্তঃপুর থেকে উদ্ধার হওয়া ধর্মাবতার কৃষ্ণে সমর্পিত ও তার অধিকারপ্রাপ্ত নারী । কিন্তু এদের প্রত্যেককে দেবী লক্ষ্মীর অবতার হিসেবে মনে করা হয়। প্রত্যেকের গর্ভেই শ্রীকৃষ্ণের দশটি পুত্র এবং একটি কন্যার জন্ম হয়েছিল।

রুক্মিণী হলেন কৃষ্ণের প্রধান পত্নী। তিনি বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কন্যা এবং ভীষ্মকপুত্র রুক্মীর ভগিনী। ইনি কৃষ্ণের সহিত বিবাহ করার ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। শিশুপালের সঙ্গে বিবাহের পূর্বলগ্নে কৃষ্ণ রুক্মিনীর সম্মতিতে বিবাহ করেন এবং দ্বারকায় আনয়ন করেন। রুক্মিনী কৃষ্ণের ঔরসে একটি তেজস্বী পুত্রসন্তান লাভ করেন। তার নাম হলো প্রদ্যুম্ন। কৃষ্ণের আরেক মহিষী সত্যভামার গর্ভে কৃষ্ণ যে দশটি পুত্র লাভ করেছিলেন তারা হলেন ভানু, সুভানু, স্বরভানু, প্রভানু, ভানুমান, চন্দ্রভানু, বৃহদ্ভানু, অতিভানু, শ্রীভানু এবং প্রতিভানু।

জাম্ববানের কন্যা জাম্ববতীর গর্ভে কৃষ্ণ যে দশটি পুত্র লাভ করেছিলেন তারা হলেন শাম্ব, সুমিত্র, পুরুজিৎ, শতজিৎ, সহস্রজিৎ, বিজয়, চিত্রকেতু, বসুমান, দ্রাবিড় ও ক্রতু। এই পুত্রেরা কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ও নগ্নজিতির সন্তানরা হলেন বীর, চন্দ্র, অশ্বসেন, চিত্রাগু, বেগবান, বৃষ, অম, শঙ্কু এবং কুন্তী (কৃষ্ণের পিসি ও পাণ্ডবদের মাতা কুন্তী নন)।

শ্রুত, কবি, বৃষ, বীর, সুবাহু, ভদ্র, শান্তি, দর্শ, পূর্ণাংশ এবং সোমক হলেন কৃষ্ণ ও কালিন্দির পুত্র।

লক্ষণা নামক মহিষীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের ঔরসজাত পুত্রেরা হলেন প্রঘোষ, গাত্রবান, সিংহ, বল, প্রবল, উর্ধগ, মহাশক্তি, সাহা, ওজ এবং অপরাজিত।

মিত্রবৃন্দা ও শ্রীকৃষ্ণের মিলনে যে দশ পুত্রের জন্ম হয়, তারা হলেন বৃক, হর্ষ, অনিল, গৃধ্র, বর্ধন, উন্নাদ, মহাংশ, পবন, বহ্নি এবং ক্ষুধী।

ভদ্রার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের পুত্রেরা হলেন সংগ্রামজিৎ, বৃহৎসেন, সুর, প্রহরণ, অরিজিৎ, জয়, সুভদ্র, বাম, আয়ুর ও সাত্যক।

বৈষ্ণব ধর্ম

মণিপুরি শৈলীতে রাসলীলা কৃষ্ণের পূজা হল বৈষ্ণব ধর্মের একটি অঙ্গ। বৈষ্ণব ধর্ম অনুসারে দেবতা বিষ্ণুকে পরমেশ্বর জ্ঞান করা হয়ে থাকে এবং তার অন্যান্য অবতারসমূহ, তাদের পত্নী এবং তৎসম্বন্ধীয় গুরু ও সাধকদের প্রতিও গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। কৃষ্ণকে মূলত বিষ্ণুর পূর্ণাবতার হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু কৃষ্ণের সাথে বিষ্ণুর প্রকৃত সম্বন্ধ অত্যন্ত জটিল ও বৈচিত্রপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন কখনও স্বয়ং কৃষ্ণকেই একমাত্র পরমেশ্বর রূপে আরাধনা করা হয়। বহু আরাধ্য দেবদেবী ও তাদের অবতারদের মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে কৃষ্ণের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কৃষ্ণ এবং বিষ্ণুকেই কেন্দ্র করে বৈষ্ণব ধর্মের ঐতিহ্য চলে এসেছে। অনেক ক্ষেত্রে হিন্দুধর্মের যে শাখায় স্বয়ং কৃষ্ণ প্রধান আরাধ্য রূপে বিবেচিত হন সেই শাখাকে “কার্ষ্ণ্য ধর্ম” এবং যে শাখায় কৃষ্ণকে শুধুমাত্র বিষ্ণুর অবতার রূপে চিহ্নিত করা হয় সেই শাখাকে “বৈষ্ণব ধর্ম” আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।

এশিয়ার বাইরে

১৯৬৫ সাল নাগাদ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ (তার গুরু ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের নির্দেশ অনুসারে) পশ্চিমবঙ্গে

তার জন্মভূমি থেকে নিউ ইয়র্ক সিটিতে ভ্রমণ করার পর কৃষ্ণ-ভক্তি আন্দোলন ভারতের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে । এক বছর পরে ১৯৬৬ সালে, অনেক অনুসারী অর্জনের পরে, তিনি কৃষ্ণ চেতনা জন্য আন্তর্জাতিক সোসাইটি (ইসকন) গঠন করতে সক্ষম হন, যা হরে কৃষ্ণ আন্দোলন নামে পরিচিত।এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজিতে কৃষ্ণ সম্পর্কে লেখা এবং সাধক চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা ছড়িয়ে দিয়ে পশ্চিমা বিশ্বের মানুষের সাথে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন শেয়ার করা। হরে কৃষ্ণ মহা-মন্ত্রেরজপ হরি-নাম সংকীর্তন নামে সেখানে ব্যাপক পরিচিত লাভ করে ।

মহামন্ত্রটি বিটলস খ্যাত জর্জ হ্যারিসন এবং জন লেননের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, এবং হ্যারিসন লন্ডনের রাধা কৃষ্ণ মন্দিরের ভক্তদের দ্বারা মন্ত্রটির একটি ১৯৬৯ সালে রেকর্ডিং তৈরি করেছিলেন। " হরে কৃষ্ণ মন্ত্র " শিরোনাম , গানটি যুক্তরাজ্য মিউজিক চার্টে শীর্ষ বিশ-এ পৌঁছেছিল এবং পশ্চিম জার্মানি এবং চেকোস্লোভাকিয়াতেও সফল হয়েছিল। উপনিষদের মন্ত্র এইভাবে ভক্তিবেদান্ত এবং ইসকনের ধারণাগুলিকে পশ্চিমে কৃষ্ণ সম্পর্কে জানতে সাহায্য করেছিল। ইসকন দক্ষিণ আফ্রিকায়সহ পশ্চিমে অনেক কৃষ্ণ মন্দির তৈরি করেছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

কৃষ্ণ "গোবর্ধন" পর্বত উত্তোলন করেছেন, একটি দা নাং, ভিয়েতনাম, প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান থেকে ৭ম শতাব্দীর একটি শিল্পকর্ম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস এবং শিল্পে অনেক জায়গায় কৃষ্ণকে পাওয়া যায়। পাহাড়ি আগ্নেয়গিরির জাভা, ইন্দোনেশিয়ার প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানগুলিতে তার শৈশব বা রাজা এবং অর্জুনের সঙ্গী হিসেবে পরিচিতি পাওয়া যায়। খ্রিস্টীয় ৯ম শতাব্দীর কৃষ্ণের সবচেয়ে বিস্তৃত মন্দির শিল্পগুলি যোগকার্তার কাছে প্রম্বানান হিন্দু মন্দির কমপ্লেক্সে "কৃষ্ণায়ণ পরিত্রাণ" একটি সিরিজে পাওয়া যায়। ১৪ শতকের মধ্যে কৃষ্ণ জাভানিজ সাংস্কৃতিক ও ধর্মতাত্ত্বিক ফ্যাব্রিকের অংশ ছিলেন, যেমনটি ইসলাম, বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিস্থাপনের আগে পূর্ব জাভাতে হিন্দু দেবতা রামের সাথে ১৪ শতকের পেনাটারান রিলিফ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছিল।

ভিয়েতনাম এবং কম্বোডিয়ার মধ্যযুগীয় শিল্পকলায় কৃষ্ণের অস্তিত্ব রয়েছে। প্রাচীনতম টিকে থাকা ভাস্কর্যগুলি ৬ষ্ঠ এবং ৭ম শতাব্দীর এবং এর মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মের মূর্তিও রয়েছে। মেট্রোপলিটিন মিউজিয়াম অফ আর্ট -এর দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় শিল্পকলার কিউরেটর ও পরিচালক জন গাই-এর মতে, দানাং-এ ৬ষ্ঠ/৭ম শতাব্দীর ভিয়েতনামের কৃষ্ণ গোবর্ধন শিল্প, এবং ৭ম শতাব্দীর কম্বোডিয়া আঙ্কোর বোরেয়ের নম দা গুহায়, এই যুগের সবচেয়ে বেশি অনুশীলন লক্ষ্যণীয়।

থাইল্যান্ডে সূর্য ও বিষ্ণুর সাথে কৃষ্ণের মূর্তিও পাওয়া গেছে। উত্তর থাইল্যান্ডের ফেচাবুন অঞ্চলের সি থেপ এবং ক্লাংনাই সাইটে প্রচুর সংখ্যক ভাস্কর্য এবং আইকন পাওয়া গেছে। ফানান এবং ঝেনলা উভয় যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান থেকে এগুলো প্রায় ৭ম ও ৮ম শতাব্দীর।

তথ্যসূত্র

1. ↑ Diana L. Eck (2012). India: A Sacred Geography| Harmony. পৃষ্ঠা ৩৮০-৩৮১। Quote: "Krishna was shot through the foot, hand, and heart by the single arrow of a hunter named Jara. Krishna was reclining there, so they say, and Jara mistook his reddish foot for a deer and released his arrow. There Krishna died."

2. ↑ Naravane, Vishwanath S. (1987). A Companion to Indian Mythology: Hindu, Buddhist & Jaina (ইংরেজি ভাষায়)। Thinker's Library, Technical Publishing House.

3. ↑ Sinha, Purnendu Narayana (1950). A Studz of the Bhagavata Purana: Or, Esoteric Hinduism (ইংরেজি ভাষায়)। Library of Alexandria.

4. ↑ ভট্টাচার্য, বিভূতিসুন্দর। "বাংলায় জন্মাষ্টমীর ইতিহাস"। www.anandabazar.com. সংগ্রহের তারিখ ২০২১-০৮-৩০।

5. ↑ Ritesh (2017-08-14). "দেশের গণ্ডী পেরিয়ে বিদেশে কীভাবে পালিত হয় কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী, দেখুন ফটোফিচারে"। bengali.oneindia.com. সংগ্রহের তারিখ ২০২১-০৮-৩০।

6. ↑ The Encyclopedia Americana. [s.l.]: Grolier. ১৯৮৮। পৃষ্ঠা ৫৮৯।

7. ↑ Benton, William (1974). The New [[Encyclopaedia Britannica]]| Encyclopaedia Britannica. পৃষ্ঠা ৮৮৫। ৯৭৮০৮৫২২৯২৯০৭। আইএসবিএন= এর মান পরীক্ষা করুন: invalid character (সাহায্য)। ইউআরএল-উইকিসংযোগ দ্বন্দ্ব (সাহায্য)

8. ↑ Wendz Doniger (2008). "Britannica: Mahabharata". encyclopedia| Encyclop "dia Britannica Online." সংগ্রহের তারিখ ২০০৮-১০-১৩।

লেখক : সাধারণ সদস্য
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট-এর
গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহ

- ভূমির যৌক্তিক ব্যবহার ও সুষম মাত্রার সার প্রয়োগ করে ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে সারদেশে ৪০টি ফিল্ড অফিসের মাধ্যমে দেশের সকল উপজেলার জন্য পর্যায়ক্রমে ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা ও ইউনিয়ন সহায়িকা প্রণয়ন।

- মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষা করে টেকসই কৃষি উৎপাদনের লক্ষ্যে সারাদেশে ২৩ টি গবেষণাগারের মাধ্যমে মাটি পরীক্ষা ও সার সুপারিশ সেবা প্রদান।

- তৃণমূল পর্যায়ে মাটি পরীক্ষার মাধ্যমে সুষম সার প্রয়োগে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে সারা দেশে ১০ টি ভ্রাম্যমান মৃত্তিকা পরীক্ষাগারের মাধ্যমে সার পরীক্ষা সেবা প্রদান।

- সারের গুণগত মান যাচাইয়ের লক্ষ্যে সারাদেশে ১০ টি গবেষণ
মাধ্যমে সারের বিশ্লেষণ সেবা প্রদান।

- সুষম সার প্রয়োগসহ অম্লীয় মাটি, লবণাক্ত মাটি, পিট মাটি ও
মাটি ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ফিল্ড ট্রায়ালের মাধ্যমে কৃষকদের উদ্বু

- লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্র, বটিয়াঘাটা খুলনা এব
সংরক্ষণ ও পানি বিভাজিকা কেন্দ্র, বান্দরবান-এ গবেষণার মা
উদ্ভাবন।

- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, অ
সংস্থা, বেসরকারী সংস্থা ও কৃষি উদ্যোক্তাদের কারিগরি সহায়
প্রদান।

- ভূমি ও মৃত্তিকার উপর উপজেলা ভিত্তিক সৃজিত তথ্যভান্ডার ব
কৃষকদের জন্য অনলাইন সার সুপারিশ সেবা প্রদান।
(www.ofrs.gov.bd), (www.srdi.gov.bd)

SRDI
SOIL RESOURCE DEVELOPMENT INSTITUTE

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট
কৃষি মন্ত্রণালয়

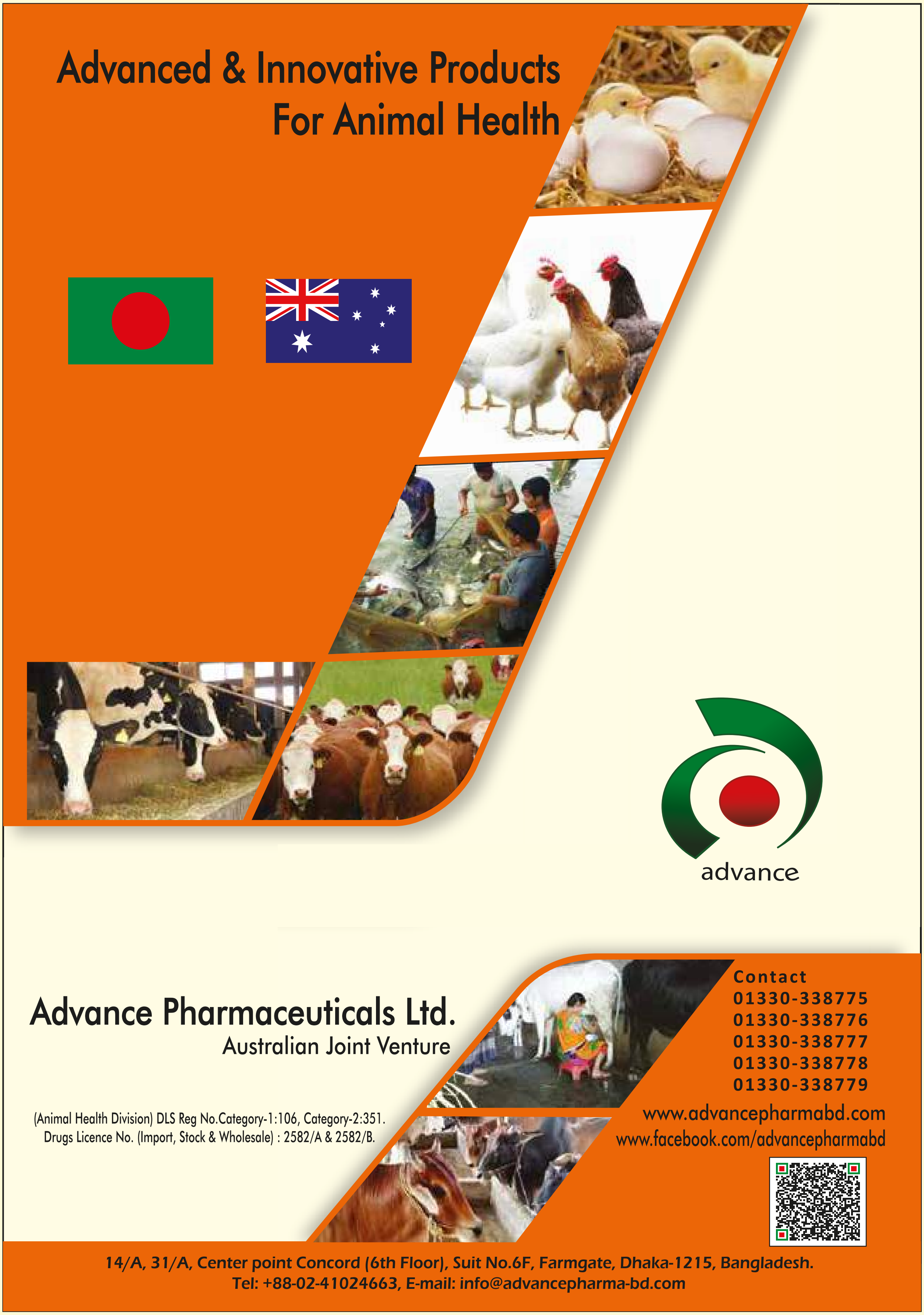
Advanced & Innovative Products
For Animal Health
advance
Advance Pharmaceuticals Ltd.
Australian Joint Venture
(Animal Health Division) DLS Reg No.Category-1:106, Category-2:351.
Drugs Licence No. (Import, Stock & Wholesale) : 2582/A & 2582/B.
Contact
01330-338775
01330-338776
01330-338777
01330-338778
01330-338779
www.advancepharmabd.com
www.facebook.com/advancepharmabd
14/A, 31/A, Center point Concord (6th Floor), Suit No.6F, Farmgate, Dhaka-1215, Bangladesh.
Tel: +88-02-41024663, E-mail: info@advancepharma-bd.com

হিন্দুদের তেত্রিশ কোটি দেবতা ও দেবদেবীর তালিকা

দীপক লাল কর্মকার

হিন্দুধর্মের বেদে যে ৩৩ কোটি দেবতার কথা বলা হয়, তা হল ৩৩ প্রকারের উচ্চকোটি সম্পন্ন অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ দেব-দেবী। শাস্ত্রে ৩৩ দেবতার শ্রেণির উল্লেখ পাওয়া যায়। ৩৩ কোটি দেবতাদের শ্রেণীতে রয়েছেন ৮ বসু, ১১ রুদ্র, ১২ আদিত্য, ইন্দ্র ও প্রজাপতি। কেউ কেউ আবার ইন্দ্র ও প্রজাপতির স্থানে ২ অশ্বিনী কুমারকে গণ্য করেন।

তেত্রিশ দেবতা

তেত্রিশ দেবতা বা তেত্রিশ কোটি দেবতা হিন্দুধর্মে দেবতাদের প্রকারভেদ অনুযায়ী সমষ্টিবদ্ধ সংখ্যা। তেত্রিশ কোটি দেবতা বলে প্রচলিত দেবতাসমূহ প্রকৃতপক্ষে তেত্রিশ প্রকার গুণ সম্পন্ন বৈদিক দেবতাকে বোঝানো হয়। হিন্দুদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদ, শতপথ ব্রাহ্মণ সহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থেও এই দেবতাদের বিষয়ে ধারণা পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে এই তেত্রিশ দেবতা লোকমুখে "তেত্রিশ কোটি দেবতা" হিসেবে প্রচলিত হয়। তবে হিন্দুধর্মে কোনও নির্দিষ্ট সংখ্যক দেবতার ধারণার পরিবর্তে একই দেবতার একাধিক রূপ প্রচলিত।

বিবরণ

তেত্রিশ কোটি দেবতা সম্পর্কে বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার "দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম, অন্যান্য রচনাবলিতে" বলেছেন হিন্দুর মুখে তো শুনি, হিন্দুর দেবতা তেত্রিশ কোটি। কিন্তু দেখি বেদে আছে দেবতা মোটে তেত্রিশটি।

ভারতের প্রথম প্রামাণ্য ভাষাবিদ যাস্কাচার্যের মতে, বেদে দেবতাগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত রয়েছে, যথা "মর্ত্যবাসী অগ্নি, শূণ্যবাসী বায়ু ও আকাশবাসী সূর্য"। এই তিন দেবতার ভিন্ন ভিন্ন কর্ম ও বিশেষণ নিয়ে অন্যান্য দেবগণের নামকরণ হয়েছে। বেদের প্রাচীনতম অংশ সংহিতায় তেত্রিশ দেবতার কথা বলা রয়েছে, ত্রিলোকে একাদশজন করে দেবতা রয়েছে। এরা হলেন দ্বাদশ আদিত্য (সূর্যের ১২টি বিশেষণ), একাদশ

রুদ্র (বায়ুর ১১টি বিশেষণ), অষ্টবসু (অগ্নির ৮টি বিশেষণ) এবং বেদের ব্রাহ্মণ অংশে দুই অশ্বিন শতপথ ব্রাহ্মণ এই ১২ জন আদিত্য, ১১ জন রুদ্র এবং ৮ জন বসু নিয়ে গঠিত ৩১ জন দেবতার একটি দল অন্তর্ভুক্ত করে, অপর দুইজন দেবতার মাধ্যমে ৩৩ জন পূরণ হয়, তবে সেই দুজন দেবতার পরিচয়ে ভিন্নতা দেখা যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেবতার সংখ্যা বিষয়ে শাকল্যের প্রশ্নের উত্তরে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য প্রথমে তেত্রিশ, তারপর পর্যায়ক্রমে ছয়, তিন, দুই, অর্ধ্যধ (দেড়) এবং সবশেষে এক বলে উত্তর দেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক ব্যাখ্যা করা ৩৩ বৈদিক দেবতাগণ হলেন–দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অষ্টবসু, ইন্দ্র ও প্রজাপতি এছাড়া ঋগে্বদ, যজুর্বেদ এবং অথর্ববেদেও তেত্রিশ প্রকার দেবতা বিষয়ে উল্লেখ পাওয়া যায়।

"ঋগে্বদে বলা হয়েছে, যে দেবগণ স্বর্গে একাদশ, পৃথিবীর উপরেও একাদশ, যখন অন্তরীক্ষে বাস করেন তখনো একাদশ, তারা নিজ মহিমায় যজ্ঞ সেবা করেন।"
— ভাষ্যকার রমেশচন্দ্র দত্ত।

দশপ্রাণ ও আত্মা নিয়ে গঠিত সৌরজগতে এগারোটি দেব রয়েছেন। একইভাবে এই পৃথিবীতে রয়েছে এগারটি আর জলেও রয়েছে এগারটি দেব। এরা দশ ইন্দ্রিয় এবং মন সৃষ্টি করেন। হে জ্ঞানীগণ! দেবতাদের জানুন এবং তারপরে যজ্ঞ শুরু করুন।
— ভাষ্যকার ধর্মদেব বিদ্যামার্তণ্ড।

তেত্রিশ দেবতার তালিকা

হিন্দু ধর্মগ্রন্থে তেত্রিশ দেবতার নাম বৈচিত্র্যময়। এর মধ্য থেকে নিম্নে ভাগবত পুরাণ অনুসারে দ্বাদশ আদিত্য, ভাগবত পুরাণ অনুসারে একাদশ রুদ্র (প্রথম কলাম) ও মতান্তরে একাদশ রুদ্র (দ্বিতীয় কলাম), মহাভারত অনুসারে অষ্টবসু, এবং দুই অশ্বিন।

তেত্রিশ কোটি (প্রকার) দেবতার নাম

দ্বাদশ আদিত্য	একাদশ রুদ্র		অষ্টবসু	দুই অশ্বিন
• বিবস্বান	• মন্যু	• প্রাণ (নিঃশ্বাস)	• ধরা (পৃথিবী)	• নাসত্য
• অর্যমা	• মনু	• অপান (প্রশ্বাস)	• অনল (অগ্নি)	• দস্র
• পূষা	• মহীন	• ব্যান	• অনিল (বায়ু)	
• ত্বষ্টা	• হর	• সমান	• অপ (জল)/সবিতা	
• সাবিত্র	• শম্ভু	• উদান	• প্রত্যূষ (সূর্য)	
• ভগ	• ঋতুধ্বজ	• নাগ	• প্রভাস (আকাশ)	
• ধাতা	• উগ্ররেতা	• কূর্ম	• সোম (চন্দ্র)	
• বিষ্ণু	• ভব	• কৃকল	• ধ্রুব	
• বরুণ	• কাল	• দেবদত্ত		
• মিত্র	• বামদেব	• ধনঞ্জয়		
• ইন্দ্র	• ধৃতব্রত	• আত্মা		
• অংশুমান				

দ্বাদশ আদিত্য

আদিত্য বলতে অদিতির সন্তানকে বোঝায়। সাধারণত, আদিত্যগণ সংখ্যায় বারো। এদের একত্রে দ্বাদশ আদিত্য বলা হয়। এরা হলেন, বিবস্বান (সূর্য), অর্যমা, পূষা, ত্বষ্টা, সাবিত্র, ভগ, ধাত্র, বিষ্ণু, বরুণ, মিত্র, ইন্দ্র, অংশুমান। মহাভারত ও পুরাণে ঋষি কশ্যপকে তাদের পিতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

একাদশ রুদ্র

শম্ভু (শিব), একাদশ রুদ্রের অন্যতম। একাদশ রুদ্র দ্বারা হিন্দু দেবতা রুদ্রের (শিব) অনুসারী এগারো দেবতাকে বোঝায়। তাদেরকে কখনও কখনও মরুত (শিবের পুত্রগণ) বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে এবং কখনও কখনও সম্পূর্ণ আলাদা রূপে উপস্থাপন করা হয়। বামন পুরাণসহ আরও কিছু গ্রন্থে একাদশ রুদ্রকে ঋষি কশ্যপ ও তার সহধর্মিণী অদিতির সন্তান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

অষ্টবসু

অগ্নি, অষ্টবসুর আরেকজন

অষ্টবসু বলতে হিন্দুধর্মে প্রকৃতির মৌলিক দিকগুলি (পঞ্চভূত) এবং মহাজাগতিক প্রকৃতির প্রতিনিধিত্বকারী আটজন দেবতাগণকে বোঝায় যেমন: সূর্য, চন্দ্র (সোম) ইত্যাদি। তারা হলেন দক্ষের কন্যা ও ধর্মদেবের সহধর্মিণী বসুর সন্তান। কিছু পুরাণ ও রামায়ণে তাদেরকে ঋষি কশ্যপ ও অদিতির সন্তান এবং মহাভারতে মনু বা ব্রহ্মার সন্তান বলা হয়েছে।

দুই অশ্বিন

দুই অশ্বিন বলতে সূর্য ও তার পত্নী শরণ্যু (সংজ্ঞা, সঞ্জনা বা সন্ধ্যা) এর দুইজন যমজ পুত্রকে বোঝানো হয়ে থাকে। তারা হলেন স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, ভোর ও বিজ্ঞানের দেবতা। ঋগ্বেদে তাদেরকে তরুণ অশ্বারোহী, দুর্বলদের সহায়তাকারী রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। ঋগ্বেদ অনুসারে সূর্য ও সঞ্জনা অশ্বরূপে মিলিত হবার ফলে দুই অশ্বিনের জন্ম হয়। মহাভারত অনুসারে নকুল ও সহদেব দুই অশ্বিনের মানসপুত্র ছিলেন। তাদের নাম যথাক্রমে নাসত্য (জ্যেষ্ঠ) ও দস্র (কনিষ্ঠ)।

বৈদিক দেবতা

বৈদিক দেবতা হচ্ছে বৈদিক যুগে রচিত হিন্দুধর্মশাস্ত্র বেদে বর্ণিত দেবতা সমূহ। বেদে বহুদেবতার উদ্দেশ্যে স্তুতি দৃষ্ট হয়। বৈদিক সাহিত্যে প্রধানত দুইটি গ্রন্থে– আচার্য শৌনক রচিত 'বৃহদ্দেবতা' ও যাস্ক বিরচিত 'নিরুক্ত'– তে বেদের দেবতাতত্ত্বের আলোচনা করা হয়েছে। যাস্ক বলেছেন, বেদে দেবতাগণ এক সর্বব্যাপী পরমাত্মার বহুরূপ অর্থাৎ বহুদেবতা রূপে কীর্তিত হয়েছে। বেদের প্রতি মন্ত্র এক এক দেবতার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত। ঋগ্বেদ হল বিভিন্ন দেবতার স্তোত্রের সংকলন।

অন্যান্য দেবতারা হলেন বিষ্ণু, রুদ্র (পরবর্তীকালে শিবের সমার্থক), প্রজাপতি (পরবর্তীতে ব্রহ্মা) প্রভৃতি। বৈদিক দেবীর সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে উষা, পৃথিবী, অদিতি, সরস্বতী, সাবিত্রী, বাক, রাত্রি, অরণ্যানী ইত্যাদি ঋগে্বদে বর্ণিত। শ্রী বা লক্ষ্মীও পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে আছেন। প্রকৃতপক্ষে, বেদে প্রত্যেক দেবতা এক একটি বিশেষ জ্ঞান বা পার্থিব প্রাকৃতিক শক্তির প্রকাশক। বৈদিক দেবমণ্ডলীতে দেব ও অসুর নামে দুটি শ্রেণীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্তুত দেবতারা হলেন ইন্দ্র, অগ্নি এবং সোম। ইন্দ্রকে শাকরাও বলা হয়, তিনি দেবতাদের অধিপতি। দেবতার মধ্যে অগ্নি অগ্রণী। জলদেবতা বরুণ ও বিশ্বদেব নামে এক দেবমণ্ডলীও প্রধান ছিলেন। ইন্দ্র–অগ্নি, মিত্র–বরুণ, সোম–রুদ্রের মতো জোড়া দেবতাদের কিছু উৎসর্গ

এখানে দ্বিগুণ গণনা করা হয়েছে। বিশ্বদেব-কে ঋগ্বেদে ৭০ বার উল্লেখ করা হয়েছে। আবার একই দেবতা ভিন্ন নামেও পরিচিত হয়।

শ্রেণী
বৈদিক দেবতা সূর্যের উপাসনা

বৈদিক দেবতাদের ত্রিলোকের ভিত্তিতে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে :
পৃথিবী বা ভূলোকের দেবতা : অগ্নি, অপ্ (জল), পৃথিবী, সোম প্রভৃতি।
অন্তরীক্ষলোকের দেবতা : ইন্দ্র, বায়ু, রুদ্র, মরুৎ প্রভৃতি।
দ্যুলোকের দেবতা : সূর্য, মিত্র, বরুণ, দ্যুঃ, পূষা প্রভৃতি।
এই দেবতাগণের নিবাসস্থল 'ভূ', 'ভুব' ও 'স্বঃ' এই তিন ব্যাহৃতিরূপে বর্ণিত হয়েছে। ত্রিলোকে একাদশ দেবতা করে মোট তেত্রিশ দেবতাকে প্রধান হিসেবে ধরা হয়। এরা হলেন একাদশ দেবতা বা দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অষ্টবসু এবং বেদের ব্রাহ্মণ অংশে অশ্বিনীকুমারদ্বয়। আবার ঋগ্বেদের দুটি মন্ত্রে দেবতার সংখ্যা তিনহাজার তিনশত উনচল্লিশ (৩৩৩৯) জন বলা হয়েছে।

ভূলোকের দেবতার মধ্যে অগ্নি, অন্তরীক্ষের দেবতার মাঝে বায়ু ও দ্যুলোকের দেবতার মাঝে সূর্যই মুখ্য দেবতা। অগ্নি দেবতা হচ্ছে সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী এবং সূর্য সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী দেবতা। অন্যান্য দেবতা এই দুই দেবতার অন্তর্ভুক্ত। অগ্নি, বায়ু ও সূর্য এই ত্রিদেবই মূল দেবতা যারা ভিন্ন ভিন্ন কর্মে ও বিশেষণে ত্রিলোকে অবস্থান করেন। যেমন,

— অগ্নি : বৈশ্বানর, জাতবেদা, নারাশংস, সুসমিদ্ধ ও তনূনপাৎ প্রভৃতি।
— বায়ু : মাতরিশ্বা, রুদ্র, ইন্দ্র, অপাং নপাৎ, মরুৎ প্রভৃতি।
— সূর্য : আদিত্য, বিষ্ণু, মিত্র, বরুণ, পূষা, ভগ, উষা, অশ্বিযুগল, সবিতা প্রভৃতি।

অগ্নিদেবকে সমগ্র মানবজাতির মিত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যাস্কের মতে ত্রিলোকের সকল দেবতার মূলরূপ হচ্ছে অগ্নি। পার্থিব অগ্নির তেজই অন্তরীক্ষে ইন্দ্ররূপ, বিদ্যুৎরূপ এবং দ্যুলোকে সূর্যরূপে প্রকটিত। আবার দ্যুলোকের বিভিন্ন দেবতা সূর্যের বিভিন্ন রূপ এবং অন্তরীক্ষের বিভিন্ন দেবতা ইন্দ্রের বিভিন্ন রূপের প্রকাশ। কাত্যায়নের মতে সকল দেবতা সূর্য বা আদিত্যের মূলরূপ। কারণ সকল দেবতার ধারণার উৎপত্তির মূল বীজ সূর্যের লক্ষণে এবং বর্ণনায় পাওয়া যায়।

হিন্দু দেবদেবীর তালিকা
হিন্দুধর্মের ভারতীয় উপমহাদেশের বৃহত্তম ধর্ম এবং বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম ধর্ম। হিন্দুধর্মের মধ্যে পাঁচটি প্রধান সম্প্রদায় রয়েছে, বৈষ্ণব সম্প্রদায় , শৈবধর্ম সম্প্রদায় , শাক্তধর্ম সম্প্রদায় , গাণপত্য সম্প্রদায় এবং সূর্যবাদ যাদের অনুসারীরা যথাক্রমে বিষ্ণু, শিব, আদি পরাশক্তি, গণেশ এবং সূর্যকে সর্বোচ্চ দেবতা বলে মনে করে। স্মার্তবাদ উপরের পাঁচটি দেবতাকে সমান বলে মনে করে। হিন্দু দেবতাদের অধিকাংশই এই পাঁচটি প্রধান দেবতার বিভিন্ন রূপ (অবতার) বা তাদের সাথে সম্পর্কিত। হিন্দুধর্মকে বিশ্বের "প্রাচীনতম ধর্ম" বলা হয়েছে এবং অনেক অনুশীলনকারী হিন্দুধর্মকে "শাশ্বত আইন" (সনাতন ধর্ম) বলে উল্লেখ করেছেন। নীচে প্রধান হিন্দু দেবতার একটি তালিকা দেওয়া হল এবং তারপরে ছোট হিন্দু দেবতা এবং দেবদেবীদের একটি তালিকা দেওয়া হলো :

প্রধান দেবতা
ত্রিমূর্তি বা ত্রিদেব সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, রক্ষাকর্তা বিষ্ণু এবং ধ্বংসকারী ও পুনর্জন্মকারী মহেশ্বর (শিব) নিয়ে গঠিত। তাদের পত্নী প্রতিরূপ হলেন: ব্রহ্মার পত্নী সরস্বতী, বিষ্ণুর পত্নী লক্ষ্মী এবং শিবের পত্নী পার্বতী (বা দুর্গা)। বিষ্ণু ও শিবের অনুসারীরা দুটি প্রধান সম্প্রদায় গঠন করে।

ব্রহ্মা
হিন্দুধর্ম অনুসারে, ব্রহ্মা হলেন সমগ্র মহাজাগতিক মহাবিশ্বের নির্মানকর্তা। তিনি বৈদিক দেবতা পরম প্রজাপতির সাথে চিহ্নিত। জ্ঞান ও সঙ্গীতের দেবী সরস্বতী ব্রহ্মার স্ত্রী, যিনি সৃষ্টির জন্য জ্ঞান দিতে আবির্ভূত হন। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার কিছু বিকল্প নাম হল :

• চতুর্মুখ * বেদানাথ * প্রজাপতি * হিরণ্যগর্ভ * বেদগর্ভ * কৌশল

বিষ্ণু
• বিষ্ণু হলো এই মহাবিশ্বের পালনকর্তা। বৈষ্ণবরা তাকে শাশ্বত, সর্বশক্তিমান এবং পরমেশ্বর বলে মনে করেন। পালনকর্তা বিষ্ণুর কিছু বিকল্প নাম হল :

• আদি নারায়ণ * নারায়ণ * থিরুমল * পেরুমাল * জগন্নাথ *হয়গ্রীব * অচ্যুত * মাধব * ভেঙ্কটেশ্বর * গুরুভায়ুরাপ্পান * বৈকুণ্ঠ চতুর্মূর্তি * বৈকুণ্ঠ কমলজ * মোহিনী * লক্ষ্মীনারায়ণ * কৃষ্ণ * বিশ্বরূপ * রঙ্গনাথ * মধুসূদন * পদ্মনাভ * অনন্তশায়ী বিষ্ণু * হরি * উপুলভান, শ্রীলঙ্কায় বিষ্ণুর আরেকটি নাম * পুরুষোত্তম * বাসুদেব * গোবিন্দ * চুর্ব্যুহ * গোপাল * কেশব

শিব
• শৈব ধর্ম অন্যতম প্রধান হিন্দু সম্প্রদায়। শৈব ধর্মের অনুসারীরা বিশ্বাস করেন যে দেবতা শিব হলেন পরম সত্তা। শিব হলেন ত্রিমূর্তিগুলোর মধ্যে ধ্বংসের দেবতা, এবং তাই কখনও কখনও ভয়ঙ্কর দেবতা ভৈরব হিসাবে চিত্রিত করা হয়। শৈবপন্থীরা অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায়ের অনুসারীদের তুলনায় তপস্যার প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয় এবং তাদের আত্মশুদ্ধির আচার-অনুষ্ঠানে শরীরে ভস্মলেপন করতে দেখা যায়। শিবের কিছু বিকল্প রূপ (ভৈরব) নীচে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে :

• অর্ধনারীশ্বর * নটরাজ * পশুপতি * রুদ্র * দক্ষিণামূর্তি * রাবনানুগ্রহ * বৈধীশ্বর * বিরূপাক্ষ * লিঙ্গোদ্ভব * ভিক্ষাটন * শ্রী মঞ্জুনাথ

• জ্যোতির্লিঙ্গ রূপ, ভগবান শিবের ১২টি ঐশ্বরিক প্রতিনিধিত্ব * ভোলেনাথ * মহেশ্বরা

• বুধাকেদার বৃদ্ধা (প্রাচীন) শিবের রূপ যিনি পাণ্ডবদের স্বর্গরোহিণীর দিকে পরিচালিত করেছিলেন।

দেবী

ভারতে দেবী পূজার সম্প্রদায়গুলো প্রাচীন। ঋগ্‌বেদ সবচেয়ে আলোচিত দেবী হলেন উষা, যিনি হলেন ভোরের দেবী। আধুনিক হিন্দুধর্মে, দেবীকে ব্যাপকভাবে সম্মান করা হয়। শাক্তধর্ম হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান সম্প্রদায়। শাক্তধর্মের অনুসারীগণ বিশ্বাস করেন যে দেবী হলেন সেই শক্তি যা নারী নীতির অন্তর্নিহিত, এবং পরম ব্রহ্মের সাথে এক এবং অভিন্ন। শক্তির (দেবী) অনেক রূপ, প্রকাশ এবং দেবী রয়েছে যা তার অংশ, যেমন লক্ষ্মী, দুর্গা, পার্বতী এবং সরস্বতী। বিশ্বাস করা হয় যে, দেবী শান্তিপূর্ণ রূপে প্রকাশ পায়, যেমন লক্ষ্মী বিষ্ণুর সহধর্মিণী। এছাড়াও কালী ও দুর্গার মতো দেবী হচ্ছেন উগ্র রূপের প্রকাশ। শক্তিধর্মে, আদি পরাশক্তিকে পরম ঈশ্বর বা পরব্রহ্ম হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সে নিরাকার অর্থাৎ মূল সত্ত্বা হচ্ছে নির্গুণ কিন্তু অনেক রূপ নিতে পারে বলে সগুণ। দুর্গা এবং ললিতা ত্রিপুরাসুন্দরীকে যথাক্রমে কালীকুল এবং শ্রীকুল সম্প্রদায়ে সর্বোচ্চ দেবী হিসাবে বিবেচনা করা হয়। শাক্তধর্ম তান্ত্রিক হিন্দুধর্মের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, যা মন ও শরীরের শুদ্ধির জন্য আচার ও অনুশীলন শেখায়। শক্তি (দেবী) মাতৃদেবীর কিছু ভিন্ন অংশ হল :

- দুর্গা (পার্বতীর রূপ), দুর্গমাসুর এবং মহিষাসুরের বধকারী,
- কালী (পার্বতীর রূপ) ভদ্রকালী হিসাবে, কালীর একটি শুভ রূপ এবং পার্বতীর হিংস্র রূপ হিসাবে ভৈরবী / চামুন্ডেশ্বরী প্রায়শই চণ্ডী নামে পরিচিত,
- অন্নপূর্ণা (দেবী পার্বতীর অবতার), অন্নের দেবী
- সতী (শিবের স্ত্রী), পূর্বজন্মে পার্বতী।
- লক্ষ্মী এবং তার অষ্টলক্ষ্মী, সম্পদের দেবী এবং বিষ্ণুর স্ত্রী
- সীতা, লক্ষ্মীর অবতার, রামের স্ত্রী, ত্রেতাযুগে বিষ্ণুর অবতার। তিনি রামায়ণের সবচেয়ে বিশিষ্ট দেবী।
- রাধা, প্রেমের দেবী। কৃষ্ণের সহধর্মিণী। তাকে লক্ষ্মীর অবতার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তিনি কৃষ্ণের সাথে গোলোকে (স্বর্গ, চিরস্থায়ী আবাস) অবস্থান করেন।
- রুক্মিণী, দ্বাপরযুগে বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণের স্ত্রী। তিনি লক্ষ্মীর একটি বিশিষ্ট অবতার।
- সরস্বতী, জ্ঞান ও সঙ্গীতের দেবী এবং ব্রহ্মার স্ত্রী।
- সাবিত্রী (সরস্বতীর একটি রূপ), ব্রহ্মার স্ত্রী, ব্রহ্মার বাম দিক হতে জন্মগ্রহণ করেন, চার বেদের মাতা।
- গায়ত্রী (গায়ত্রী মন্ত্রের একটি রূপ)।
- বিরজা জগন্নাথ এর স্ত্রী,
- বিমলা পুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী,
- গঙ্গা, গঙ্গা নদীর দেবী মূর্তি, তিনি পরে রাজা শান্তনুকে তার প্রথম স্ত্রী হিসাবে বিয়ে করেছিলেন এবং মহাভারত যুগে ভীষ্ম পিতামহকে জন্ম দিয়েছিলেন।
- যমী, পবিত্র নদী যমুনা এবং জীবনের দেবী,
- নর্মদা, শিবের কন্যা, নর্মদা নদীর দেবীও,
- ষষ্ঠী, দেবসেনা নামেও পরিচিত, কার্তিকেয়ের স্ত্রী এবং সন্তান ও প্রজননের দেবী।
- স্বাহা, ভস্ম এবং বিবাহের দেবী হিসাবে বিবেচিত, দক্ষিণ কন্যা এবং অগ্নির স্ত্রী।
- মনসা, ঋষি কাশ্যপের কন্যা, বাসুকীর বোন, ঋষি জরৎকারুর স্ত্রী, ঋষি আস্তিকের মাতা এবং সর্প ও উর্বরতার দেবী।
- দক্ষিণা, যজ্ঞের দেবী, রাধার লোমকূপ থেকে জন্মগ্রহণ করেন, দেবী লক্ষ্মী থেকে পুনর্জন্ম এবং যজ্ঞের স্ত্রী।

সম্পর্কিত দেবতা

- গণেশ, শিব ও পার্বতীর পুত্র এবং তাকে গণপতিও বলা হয়। গাণপত্য সম্প্রদায়ে গণেশকে প্রধান দেবতা হিসেবে পূজা করা হয়। তিনি জ্ঞানের দেবতা এবং সমস্ত বিঘ্ন দূরকারী। তিনি দেবতাদের মাঝে সবার আগে পূজিত হন।
- কার্তিকেয়, শিব ও পার্বতীর পুত্র এবং তাকে মুরুগা, সুব্রমণ্য, কার্তিক, কুমার বা শানমুখও বলা হয়। কৌমরাম সম্প্রদায়ে সুব্রামণ্যকে প্রধান দেবতা হিসেবে পূজা করা হয়। তিনি গণেশের ভাই।
- আয়াপ্পান, শিব ও মোহিনীর (বিষ্ণুর অবতার) পুত্র এবং কান্তে মণি (গলায় রুদ্রাক্ষ) থাকায় তাকে মণিকান্তও বলা হয়।
- হনুমান, শিবের অন্যতম অবতার এবং রামের ভক্ত এবং তাকে অঞ্জনেয়াও বলা হয়, কারণ তার মাতার নাম অঞ্জনা।
- গঙ্গা, হিন্দু ধর্মের সবচেয়ে পবিত্র নদীর দেবী। তিনি সমস্ত পাপ মুছে ফেলা এবং একজন ব্যক্তিকে শুদ্ধ করে বলে মনে করা হয়।
- যমুনা, হলেন কন্যা সূর্য দেবতা এবং সঞ্জনা (মেঘের দেবী) এবং কৃষ্ণের স্ত্রী। তিনি জীবন শক্তি প্রতিনিধিত্ব করে।
- হংস, হলেন একনিষ্ঠ রাজহাঁস যিনি ব্রহ্মা এবং সরস্বতীর বাহন।
- গরুড়, হলেন একনিষ্ঠ ঈগল যিনি বিষ্ণুর বাহন এবং সমস্ত পাখির রাজা।
- নন্দী, হল একনিষ্ঠ ষাঁড় যা শিবের বাহন।
- শনি, সূর্য ও ছায়ার পুত্র। তিনি ন্যায়ের দেবতা।
- শীষ, নাগদের রাজা।

লেখক : সহ-সভাপতি
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ

General Sales Agent:
TAS group
AirAsia
Happy
DURGA PUJA
May Maa Durga shower her divine blessings on you, bringing strength, peace, and prosperity.
Fly directly from DHAKA to
MALAYSIA & THAILAND
& Beyond
DHAKA - KUALA LUMPUR - LANGKAWI - BANGKOK - PHUKET - KRABI - CHIANG MAI - TOKYO - MELBOURNE
SYDNEY - PERTH - SINGAPORE - HONG KONG - BALI - BRUNEI - PNOM PENH - HO CHI MINH - MANILA - HANOI
CALL TO ENQUIRE
+88 09678 742 752
3 2 1 take off
airasia.com
WORLD'S BEST

কৃষির আধুনিক ও লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য

কৃষি তথ্য সার্ভিস বিভিন্ন সেবা প্রদানের মাধ্যমে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে

মাসিক **কৃষিকথা** পড়ুন। কৃষিকথা'র গ্রাহক হোন। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫.০০ টাকা বার্ষিক সডাক ৫০.০০ টাকা। কৃষিকথায় কৃষি বিষয়ক মানসম্মত লেখা দিন। লেখা পাঠাবার ই-মেইল ঠিকানাঃ editor@ais.gov.bd, dirais@ais.gov.bd

কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান নিয়মিত শুনুন- বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ বেতারের আঞ্চলিক অনুষ্ঠানসমূহ নিয়মিত শুনুন। বরগুনা জেলার আমতলিতে স্থাপিত কৃষি রেডিও এফএম ৯৮.৮ প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে ১১টা এবং বিকাল ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সম্প্রচার উপভোগ করুন।

বাংলাদেশ টেলিভিশনের জনপ্রিয় কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান বাংলার কৃষি প্রতিদিন সকাল ৮ টার বাংলা সংবাদের পূর্বে ৭.৪০ মিনিটে ও মাটি ও মানুষ বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার সন্ধা ৬.২০ মিনিটে সম্প্রচার করা হয়। নিয়মিত এই অনুষ্ঠান দেখুন।

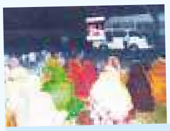

কৃষি তথ্য সার্ভিস-এর ভ্রাম্যমাণ চলচ্চিত্র ইউনিটের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রচারিত কৃষি বিষয়ক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নিজে দেখুন, অন্যকে দেখতে উৎসাহিত করুন।

সরাসরি **কৃষি কল সেন্টার** হতে কৃষি বিষয়ে সকাল ৯.০০টা হতে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত তথ্য সেবা ও পরামর্শ পেতে যে কোন মোবাইল হতে **১৬১২৩** নম্বরে কল করুন। (শুক্রবার ও অন্যান্য সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত)

কৃষিবিষয়ক আধুনিক ভিডিও চিত্রের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নিতে ভিজিট করুন এআইএসটিউব (aistube.com)

কৃষি যোগাযোগ ও তথ্য সেবা কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন অফিস সময়ে সেবা চালু রয়েছে।

যোগাযোগের ঠিকানা : পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
ফোন : ০২-৫৫০২৮২৬০
ই-মেইল : (dirais@ais.gov.bd, ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd

কৃষি তথ্য সার্ভিস
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

জ্যোতির্ময়ী আলোয় শুদ্ধ

কামরান চৌধুরী

মা জগৎ সংসারে পাপ তাপ মোহমায়া কষ্টব্যথা
জন্ম থেকে মৃত্যু আষ্টে পিষ্টে আছে তব যশোগাথা।
অনন্তর তাকিয়ে তোমার মুখে, ভুলেই চলি শত দুখ
অনির্বাণ মধুচোখ শান্ত করে, অসুরের নিত্য অসুখ।
তুমি শুধু মৃন্ময়ী নও তুমি সদা জাগ্রত চিন্ময়ী
তোমার আরাধনায় জেগে ওঠে আধ্যাত্মিকতা জ্যোতির্ময়ী।
তোমার মাঝে জাগে সুর, তোমাতে যে বিনাশ অসুর
তোমাতে তেজ তোমাতে দীপ্তি, নিত্য শান্তি পরিতৃপ্তি।
আকাশে বাতাসে আগমনী গান, ধরায় জাগিছে মহাপ্রাণ
শিউলী-কাশের ছোঁয়া, নৃত্যে ধূপের ধোয়া, দৃষ্টিতে রোষ স্নিগ্ধ
পরশ।
ত্রিনয়নী ত্রিকালদর্শী, তুমি ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান
তোমার চোখে রেখে চোখ, চিনেছি নিজ প্রাণ দীপ্যমান।
তোমার মুখে স্নিগ্ধ হাসি মহামুক্তি মহাত্রাণ
সব মনে ঢালো, সুখ সমৃদ্ধি অনন্ত কল্যাণ।
দশ হাতে দশ অস্ত্রে সজ্জিতা দেবী, হৃদয়ে আঁকো শুদ্ধতা ছবি
ত্রিশুলে ধরো ত্রিগুণ তমঃ রজঃ সত্য
শঙ্খনাদে উৎপন্ন প্রাণ, সৃষ্টিকর্তা রূপে অধিষ্ঠান
চক্রে আবর্তন, তোমাকে ঘিরেই বিশ্ব ঘূর্ণন।
গদা কালদণ্ডে আনুগত্য ভালোবাসা ভক্তির বিকাশ
পদ্ম- জন্ম পাঁকে, তবু সে সুন্দর, অন্ধকারে আলোর প্রকাশ।
বজ্র হাতে অশনি দৃঢ়তা সংহতি রূপ
সাপ- সেতো বিশুদ্ধ চেতনার স্বরূপ।
খড়্গ বুদ্ধিতে বৈষম্য অন্ধকার কর জয়
তীর-ধনুকে লক্ষ্য অর্জন অন্তর্নিহিত শক্তির বিজয়।
অগ্নিতে জ্ঞান-বিদ্যায় পরাভূত অন্যায়
লোভ-মোহ, হিংসা-দ্বেষ, কাম-ক্রোধ, মিথ্যা-নিন্দা, কার্পণ্য-অহঙ্কার
বিদায়।
দশঅস্ত্র অন্তরে করি ধারণ, আশিসে আশিসে করো মা বরণ
জগতের যতো কষ্ট, না করি যেন ভয়, অসুর দানব করি
ক্ষয়;
তোমার রঙে মিশে, যেন পাই মহামুক্তি জয়
তোমাতেই শুদ্ধতা ঋদ্ধতা, তোমাতেই মুগ্ধতা পূর্ণতা।
চিরন্তনী তুমি সাকার আকারে বসেছো অন্তরে
শান্তি সুধা ঢেলে দাও মন্তরে মন্তরে।।

তারিখ : ২৭.০৯.২০২৪, শ্যামলী, ঢাকা।।

শুভাগত ভালো আছে

সুমন সুবহান

সেই যে তুই আকাশের তারা হয়ে গেলি
তারপর থেকে... কতোটা দিন-মাস বছর।
তোদের ওদিকটাতে আর যাওয়া হয়নি,
ছাতিম গাছের নিচে তোদের দোচালা ঘর
ভাসা অরুণাভ ডালিমে নুয়ে পড়া গাছ
পাশে পাতকুয়ো আর অদূরে নিকোনো উঠোন,
তুলসী-শালগ্রাম শিলা সবমিলিয়ে
ক্যাম্বিসে আঁকা একটা জলছবি যেন!
এমনকি মাসিমার বানানো নাড়ুর লোভেও
যাওয়া হয়নি, শুনেছি ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে-
তিনি আজো নিয়মিত চন্ডী পাঠ করেন,
তার চোখের ছানি কাটা হয়নি আজো।

শুভাগত মনেপড়ে! পুজোর ছুটিতে-
দশোহরার মেলায় যেতাম একসাথে!
মাসি আঁচলের গেরো খুলে আধুলি-সিকি দিতেন
আর তা দিয়ে আমরা বাতাসা-সন্দেশ-গজা
কীসব কিনে খেতাম, বায়োস্কোপ দেখে
লেবেঞ্চুস খেতে খেতে আমরা ঘরে ফিরতাম,
ধর্মের পরিচয় কখনো বাঁধা হয়নি আমাদের বন্ধুত্বে
দাদা-দিদা, ভাই-বোন, সবার স্নেহ গায়ে মেখে-
আমরা তাই একসাথে বেড়ে উঠেছিলাম,
আমরা তখন সত্যিকারের মানুষ ছিলাম।
তারপর বড় হতে হতে আমরা যেনো ক্রমশঃ
গুটিয়ে গেলাম, ক্ষুদ্র হয়ে গেলো আমাদের গন্ডি!

চারপাশে এতো যে পরিচিতি মানুষের মুখ-
তারাও কেমন যেন ছায়া, ধোঁয়াশে হয়ে গেলো
আমি তাদের স্পর্শ করি কিন্তু নাগাল পাই না।
সেই-যে আমার ছোটবেলা! আমাদের বন্ধন!
মাসিমার নাড়ু-বায়োস্কোপ-লেবেঞ্চুস
সব স্মৃতি কেমন ফিকে-পানসে হয়ে গেলো।
আমরা যে একইরকম, রক্ত-মাংসের মানুষ
এই পরিচয়টা তবে কোথায়। তবে কি
ধর্মের পরিচয়টাই আজ বড় হয়ে গেলো।
শুভাগত মরে গিয়ে তুই বরং ভালোই আছিস
তোকে দেখতে হলোনা কীকরে আমরা-
বড় হতে হতে একসময় ছোট হয়ে গেলাম!

সৃষ্টি

সুপ্রিয় বণিক (আনন্দ প্রিয়)

এসেছি এই পৃথিবীর মুক্ত আকাশে বাতাসে,
দেখবো সূর্যোদয়, বলবো চাঁদ মামার কাছে—
স্নিগ্ধ আলোয় ভরে দাও প্রাণ,
বিভেদ ভুলে গাইবো সবে সাম্যের গান।
যে পথে নেই শোষণ, বঞ্চিত মানুষের হাহাকার,
নেই ক্রন্দন ধ্বনি, নিপীড়িত-নির্যাতনের অত্যাচার,
লড়াই লড়াই রক্তের লড়াই, চাইনা যুদ্ধ সমাজ,
গহীণ আঁধার, ক্ষুধিত ক্রমশ দিন চাইনাকো আজ।
দৃঢ় প্রত্যয়ে হাতে হাত রেখে করো সবে পণ—
অন্যায়ের কাছে করবোনা মোরা আত্মসমর্পণ।
এসেছে নবজাতক, সৃষ্টি করো নতুন সমাজ-আনন্দ
বলেরে—
জঞ্জাল সরিয়ে সুখের প্রদীপ জ্বালো, 'মঙ্গল করে—
নির্মল করে'।

নারী শক্তি

সুপ্রিয় বণিক (আনন্দ প্রিয়)

মায়াবতী, তোমার রূপ রস দুরন্ত শক্তি,
সরল মুখচ্ছবি, দুই নয়নে চেয়ে দেখি,
যেনো তুমিই প্রভাত রবি,
তুমি নারী আলোর শিখা,
দুঃখ তাপে হও সাথী,
তুমি সুখতারা আমি পুরুষ-অন্য পুরুষ
নীরবে চেয়ে দেখি হইত দিশেহারা দিলে তুমি জন্মসুধা,
রজনীযোগে রঞ্জকা, দাও স্নেহ-প্রেম-মায়া,
এসছো মাধুরী মিশায়ে,
বলো কেমনে দিব নির্মল ছায়া।
তুমি প্রেমময়ী, মাতৃরূপী ক্তিরূপে রূপসী-
এই সমাজে নির্যাতিতা,
যৌতুকের বলি-বিদেশতে দাসী।
আঁধারে অন্ধগতি, আন্দোলনে রাজপথে,
স্বপ্ন ভাঙা তরী সুখের আশায় নিভে যায় বাতি,
হে প্রিতমা নারী।
তবুও তুমি মমতাময়ী,
দুঃখকে বুকে চেপে করিছো সব জয়,
আনন্দ বলে,
অন্যায়ের বিরুদ্ধে করো প্রতিবাদ,
নাহী ভীতি ভয়।

মঙ্গল চিহ্ন তথা শিব লিঙ্গম

সঞ্জীব কুমার দাস

ওঁ
সত্যম্-শিব্ম-সুন্দরম্

নির্গুণ ব্রহ্মের বেদগুহ্য নাম শিব। নিখিল বিশ্বের পরমারাধ্য দেবতা শিব। শিব শব্দের আভিধানিক অর্থ মঙ্গলময়, সুন্দরময়। জগতের সকলেই মঙ্গল চায়, সুন্দর চায়, অমঙ্গল, অসুন্দর কেউ চায় না। মঙ্গল কামনায় অধিকারী-অনধিকারীর ভেদাভেদ নেই। সকলেই মঙ্গলের অধিকারী। শিবলিঙ্গম অর্থ মঙ্গল চিহ্ন। তিনি মঙ্গলময় পরমাত্মার প্রতীক।

এই মঙ্গল অর্জিত হয় মঙ্গলময়ের পূজায়। সুন্দর জীবন গড়া যায় সুন্দরতমের আরাধনায়। জগতের যিনি সর্বমঙ্গলের খনি, সর্বসুন্দরের মুকুটমণি তাঁর পূজা হয় তাঁর প্রতীকে। এ এক মহান শাস্ত্র নির্দেশ, সুমধুর ঋষি সমাচার। সনাতন ধর্ম ঋষি শাসিত ধর্ম। ঋষিরা মন্ত্র দ্রষ্টা, সত্যদ্রষ্টা। তাঁরা যার অনুষ্ঠান করতে বলেছেন আমরা জ্ঞানে বা অজ্ঞানে তাঁর অনুষ্ঠান করে আসছি। যে চিত্রটি, যে ধ্যানগম্য ভাবময় রূপটি যে ভাবে অঙ্কিত করলে অধ্যাত্ম তত্ত্বরাজি সন্নিবিষ্ট হতে পারে, ঋষিরা সেই চিত্রটিই মাত্র অঙ্কিত করেছেন। উহাকেই অভীষ্ট মূর্তি বা প্রতীকরূপে গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রতীক বা প্রতিমার সাহায্যে আরাধনা করতে যাওয়া চিত্ত সংযত করার উন্নততর আবিষ্কৃত সহজ ও সৎ প্রণালী বিশেষ। শুধু অন্তরের অন্তঃস্থলের দিব্য আত্মানুভূতির অবিকল ও অকৃত্রিম সংবেদন প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে তাঁর অনুবেদনবাহী প্রতীক গ্রহণ করেছেন। আমাদের মত স্বল্প বুদ্ধি মানবের হিতার্থে সেই জ্ঞান রত্নাকর ঋষিগণ। এইভাবে প্রতীকতত্ত্ব আবিষ্কার পূর্বক ঋষিরা আত্মবিদ্যা প্রচার ও প্রকাশ করে যে সুমহান কর্তব্য পালন করে গিয়েছেন জগতে তা অতুলনীয়। এরই নাম ঋষি শিল্প। অতএব বলা যায়, ঋষি শিল্প ভাবের রূপায়ন। ঋষিশিল্প মহান আত্মজ্ঞান লাভের পথ। মন্ত্র অনুধ্যানে

দেখা যায়-

"আত্মানাং বিদ্ধি"

শাস্ত্রের আদেশ ও ঋষির অনুশাসন-আত্মাকে জান। আমাদের আত্মবিদ হতেই হবে। আত্মবিদ হতে না পারলে জন্ম মৃত্যুর কঠোর পেষণে পুনঃ পুনঃ নিষ্পেষিত হতে হবে। আত্মজ্ঞান না হলে পশুতে ও মানুষে কোন ভেদাভেদ থাকে না। অতএব আত্মদর্শন হওয়া চাই। আত্মদর্শনের-আত্মপরিচয়ের এক অভিনব চিত্র অংকন করলেন শিল্পীর তুলিকায়। যাতে রয়েছে লিঙ্গ ও যোনির একত্র সমাবেশ। চিত্র দ্বারা দেখতে দিলেন লিঙ্গ ও যোনির অবিনাভাব-পরস্পরের সহিত পরস্পরের সংযোগ। সংযোগে জগৎ তথা জগতের অধিবাসী প্রতিটি জীবের উৎপত্তি ও স্থিতি।

কবি যেমন ছন্দোবদ্ধ কাব্যের আকারে অতীন্দ্রিয় ভাবকে আকরিত করেন, শিল্পীর তুলিতে যেমন অরূপভাব রূপায়িত হয়ে মনোমত রূপে ধরা দেয় ঠিক তেমনি অবাঙমানস গোচর ব্রহ্মও কল্পিত স্থূল বিগ্রহ আকারে ধরা দিয়েছেন সাধকের পূত দৃষ্টিতে। তাইতো শাস্ত্রে বলা হয়েছে-

"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা"

একবার যাদের অসীম ব্রহ্মে ধ্যান ধারণা জনিত অনুভব জন্মে গিয়েছে, স্থূল বিগ্রহের পূজা তাঁদের কাছে নিতান্তই গৌণ কিন্তু যাঁদের সেই ধারণা জন্মেনি তাদের এই স্থূল রূপের ভিতর দিয়ে সূক্ষ্মে পৌঁছার জন্য ঋষিরা মূর্তি পূজা নামক এক অনবদ্য শিল্প সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন। ঋষি শিল্পে 'শিবলিঙ্গ' পূজাই অবিদ্যতত্ত্ব অধ্যয়ন করার উপযোগী প্রতীক হিসেবে গ্রহন করা হয়েছে। ঋষির এই আদর্শকে হৃদয়ে ধারণ করে আমরা সনাতন ধর্মালম্বী মানুষ সুদীর্ঘকাল থেকে গভীর নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সাথে 'শিব লিঙ্গে' শিব পূজা করে আসছি সত্য কিন্তু সকলের অন্তরের তলায় অজানা কারণে একটি প্রশ্ন নিত্য দোলায়মান। তা হলো সনাতন ধর্মে প্রায় সকল দেবদেবীর পূজার প্রতীক প্রতিমা কিন্তু শিব পূজার প্রতীক কেন শিব লিঙ্গ? লিঙ্গ মূলতঃ শিবের নিরাকার রূপ বা প্রতীক। পৃথিবীব্যাপী পুরুষকে- এই প্রতীকে এবং নারীকে- এই প্রতীকে চিহ্নিত করা হয়। সনাতনী চিন্তায় শিবকে নবসৃষ্টির উৎসমূল লিঙ্গ প্রতীকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

"লিঙ্গতে চিহ্নতে অনেনেতি লিঙ্গম্।"

লিঙ্গ শব্দের অর্থ প্রতীক বা চিহ্ন। যা দ্বারা বস্তু চিহ্নিত হয়। বস্তুর সত্য পরিচয় ঘটে। অন্যভাবে আমরা লিঙ্গ শব্দের শুধু একটি অর্থ জানি, তা হল জননেন্দ্রিয় তথা পুংস্তত্ব বা পিতৃ লিঙ্গ- সন্তান উৎপাদনকারী; স্ত্রীত্ব বা মাতৃচক্র সন্তান প্রসবকারিনী জ্ঞাপক অর্থ কিন্তু এ শব্দের আরও একটি অর্থ হলো "সূক্ষ্মদেহ"- তা নিয়ে আমরা চিন্তাও করি না। এই সূক্ষ্মদেহ অষ্টাদশ তত্ত্ব যথা পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাদ, পানি, পায়ু, উপস্থ); পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক) পঞ্চতন্মাত্রা (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ) ও মন, বুদ্ধি, অহংকার ইত্যাদি নিয়ে গঠিত। সকল সৃষ্টির সূক্ষ্মদেহ আছে। লিঙ্গ পূজা মানে সূক্ষ্মদেহ পূজা, সকল দেব-দেবীর সূক্ষ্মশরীর আছে যা বীজমন্ত্রে প্রকাশ। শিব মঙ্গলময় আদি দেবতা। তিনি বীজধারক বলেই প্রকৃতি দ্বারা সৃষ্ট এই বিশ্বের মূল সৃষ্টি রহস্য এই লিঙ্গ শরীরে বোঝানো হয়েছে। এখানে প্রকৃতি ক্ষেত্রে বীজ প্রোথিত অবস্থায় লিঙ্গরূপে দেখানো হয়েছে।

আবার শাস্ত্র অধ্যয়নে দেখা যায়—
"লীনং বা গচ্ছতি, লয়ং বা গচ্ছতি ইতি লিঙ্গং"। যাহা লয় প্রাপ্ত হয় তাহাই লিঙ্গ। কেহ বলেন যাহাতে সমস্ত লয় প্রাপ্ত হয় তাহাই লিঙ্গ। আবার কেহ বলেন, যাহা চিদ্ জ্যোতি রূপে দেহে লীন থাকে, যাহা না থাকিলে দেহ পঞ্চভূতে (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) লয় প্রাপ্ত হয়ে যায় তাহাই লিঙ্গ। আবার কেহ এইরূপ অভিমতও পোষণ করেন যে, বীজে অংকুর শক্তির ন্যায় এই বিশ্বচরাচর যাহাতে লীন হয়ে রয়েছে তাহারই নাম লিঙ্গ। ভূমাব্রহ্মের পরিচায়ক বলে আত্মজ্যোতির নাম ঋষি শিল্পে "শিবলিঙ্গ"। স্কন্দ পুরাণ বলে-

"আকাশং লিঙ্গ মিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্য পীটিকা লয়নাৎ লিঙ্গমিত্যাহু লিঙ্গম নাম পরম পদম্"। আকাশই লিঙ্গ পৃথিবী তার পীঠিকা অর্থাৎ যোনী। আ-অর্থ সর্বতো ভাবে। কাশ-ধাতুর অর্থ প্রকাশ করা। যাহা সর্বতোভাবে প্রকাশ করে। ব্যোমরূপ আকাশ বা প্রকাশই লিঙ্গ। পৃথিবী তার পীঠ। "আলয়ং সৃর্ব্ব দেবানাম্"-ইহা সর্বদেবতার আলয় বা স্থান, আত্মজ্যোতি। সমস্ত কিছুর লয় হয় আত্মা জ্যোতিতে। লয়ের হেতু বা লয়স্থান বলে লিঙ্গ নাম। আকাশ লয় স্থান। সমস্ত ভূতাদি আকাশে লয় হয়। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় আকাশে হচ্ছে। জীব জগত ভূত সমূহের আকাশে উদ্ভব হয়- আকাশেই বিলীন হয়। আকাশ তত্ত্বের নাম ব্যোম। এই ব্যোম তত্ত্বে পৌঁছলে সাধকের কাম, ক্রোধ, লোভ মোহাদির লয় হয় বলে ইহাকে "লয়নাৎ লিঙ্গ মিত্যাহু" লিঙ্গ বা লয় স্থান বলে। পঞ্চভূতের দ্বারা জগত সৃষ্ট। পাঞ্চ ভৌতিক সৃষ্টির মধ্যে আকাশ সর্বোপরি। আমরা ক্ষিতি তত্ত্বের উপরে আছি বলে ক্ষিতি বা পৃথিবীকে উহার পীঠ বা যোনি স্থান বলা হয়েছে।

শাস্ত্রেও বলা হয়েছে-
"তালুমূলে চ যৎ পদ্মং সহস্রার পুরোদিতং তৎপদ্মে যোনীরেকাস্তি পশ্চিমাভিমুখীমত"।

অর্থাৎ মস্তক তালুমূলে সহস্রার পদ্ম বিরাজমান। উক্ত পদ্মে পশ্চিম বা পৃষ্ঠাভিমুখী এই যোনি রয়েছে। এই সহস্রার পদ্মকে চতুর্দশ ভুবনের মধ্যে সর্ব উচ্চস্থান সত্যলোক বলা হয়েছে এবং এই সত্যলোকই আত্মজন্ম লাভের মহাযোনি বা পীঠস্থান। বাস্তবিক পক্ষে শিবলিঙ্গ চুরাশি লক্ষ যোনির লিঙ্গ নয়। চুরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণের লিঙ্গাদি জীবের কাম লিঙ্গ। শিবলিঙ্গ কাম লিঙ্গ নয়। শিব লিঙ্গের প্রণামে আছে-
"নিমঃ কামাঙ্গ নাশায় নমঃ কল্মষ হারিণে"

অর্থাৎ কামাঙ্গ নাশী ও কল্মষ হারী পাপরাশি নাশী শিবকে নমস্কার।

অন্যভাবে বলতে গেলে যোনি বলতে বুঝায় যাহা হতে সৃষ্টি প্রসব হচ্ছে ও চলছে তাহাই যোনি। দেহস্থ কাম, ক্রোধ,

লোভ, মোহ হতে সৃষ্টি ক্রিয়া চলছে। জীব দেহের গুহ্য বা মূলাধার হতে কণ্ঠ বা বিশুদ্ধ চক্র পর্যন্ত স্থান কাম ক্রোধাদির সৃষ্টি স্থান এবং ইহাই ভোগের স্থান। ইহাকেই যোনি পীঠ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই যোনি স্থানের উপরেই বান লিঙ্গের অবস্থান। চুরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ শেষ করে জীবাত্মা ব্রহ্ম জন্ম লাভ করে। এই ব্রহ্ম জন্ম যা দ্বারা হয় উহাকে ব্রহ্ম যোনি বলে। শাস্ত্রেও চুরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণের কাহিনীর শেষে বলা হয়েছে- "সর্ব্ব যোনিং পরিত্যজ্য ব্রহ্ম যোনিং ততোহভ্যাগাৎ" অর্থাৎ জন্মজরার সমস্ত যোনি যখন পরিত্যক্ত হয়ে যায় ও অতিক্রম হয় তখন ব্রহ্মযোনি প্রাপ্তি ঘটে। ইহাই শিবযোনি। এই ব্রহ্ম যোনি প্রাপ্তিতে জন্ম মৃত্যু রোধ এবং উহাই অমর হওয়ার স্থান।

উপরোক্ত বর্ণনা হতে দেখা যায় যোনি দুই প্রকার। একটি দেহধারী জীবের দেহের নিম্নস্থানের স্থুল লিঙ্গযোনি। ইহা দ্বারা স্থুল দৈহিক জন্ম। অপরটি দেহের উর্দ্ধে ব্রহ্মযোনি। যা দ্বারা আত্মজন্ম হয়। নিম্নে অধোদিকের মাতৃ যোনিতে জগত প্রপঞ্চের উৎপত্তি হয়। উর্ধ্বে সহস্রারে ব্রহ্মযোনিতে গেলে জগত প্রপঞ্চের লয়। উহা লয় স্থান। লয় স্থান বলেই এর নাম লিঙ্গ। বস্তুতঃ এই লিঙ্গ কাম চিহ্ন বা শিশ্ন নয়। এই লয়কারী লিঙ্গ জ্যোতির্ম্ময় রূপে দেহের উর্দ্ধভাগে উর্দ্ধদিকে মস্তকে সহস্রারে রয়েছে বলে এর নাম উর্দ্ধলিঙ্গ। নিম্ন লিঙ্গে পূজা অর্চনার ব্যবস্থা নাই। পুজোর ব্যবস্থা উর্ধ্ব লিঙ্গে। শিবকে উর্ধ্ব লিঙ্গ বলা হয়।

মস্তকে সহস্রারে অজর অমর ব্রহ্মযোনি ও তদুপরি শিব লিঙ্গ পদ বিরাজমান। যোনি অর্থে রন্ধ্রও। সাধনায় সাধকের মন প্রাণ শক্তি মস্তকে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে পরমাত্মার আশ্রয় লাভ করে। ও মিলিত হয়ে সেই রন্ধ্র মার্গকে যোনি বলা হয়েছে। উহাই সব কিছুর উৎপত্তি স্থল। উৎপত্তি স্থল বলে ইহা বিশ্বযোনি। এই যোনির সঙ্গে লয়স্থান অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত। এই রন্ধ্র দিয়ে সাধকের স্থুল জন্মের ও জীবের চুরাশি লক্ষ যোনি জন্মের লয় হয় এবং ভাগবতী জন্মের উদ্ভব হয়। তখন আত্মা স্থুলদেহ অতিক্রম করে দিব্য দেহ বা ভাগবতী তনু লাভ করে। তাই ইহা তাঁর ভাগবতী তনুর বা আত্ম জন্মের যোনিস্থান। এই রন্ধ্রও স্থানকে লয়ে লয় স্থান অর্থাৎ শূন্যাকৃতি লিঙ্গস্থান (যাহা সাধনায় নিজ বোধগম্য) পরস্পর যুক্ত ও অবিচ্ছিন্ন রয়েছে। যেমন- সমুদ্র ও নদীর সঙ্গম স্থান পরস্পর যুক্ত- ইহাও তদ্রুপ।

(সংগৃহিত)

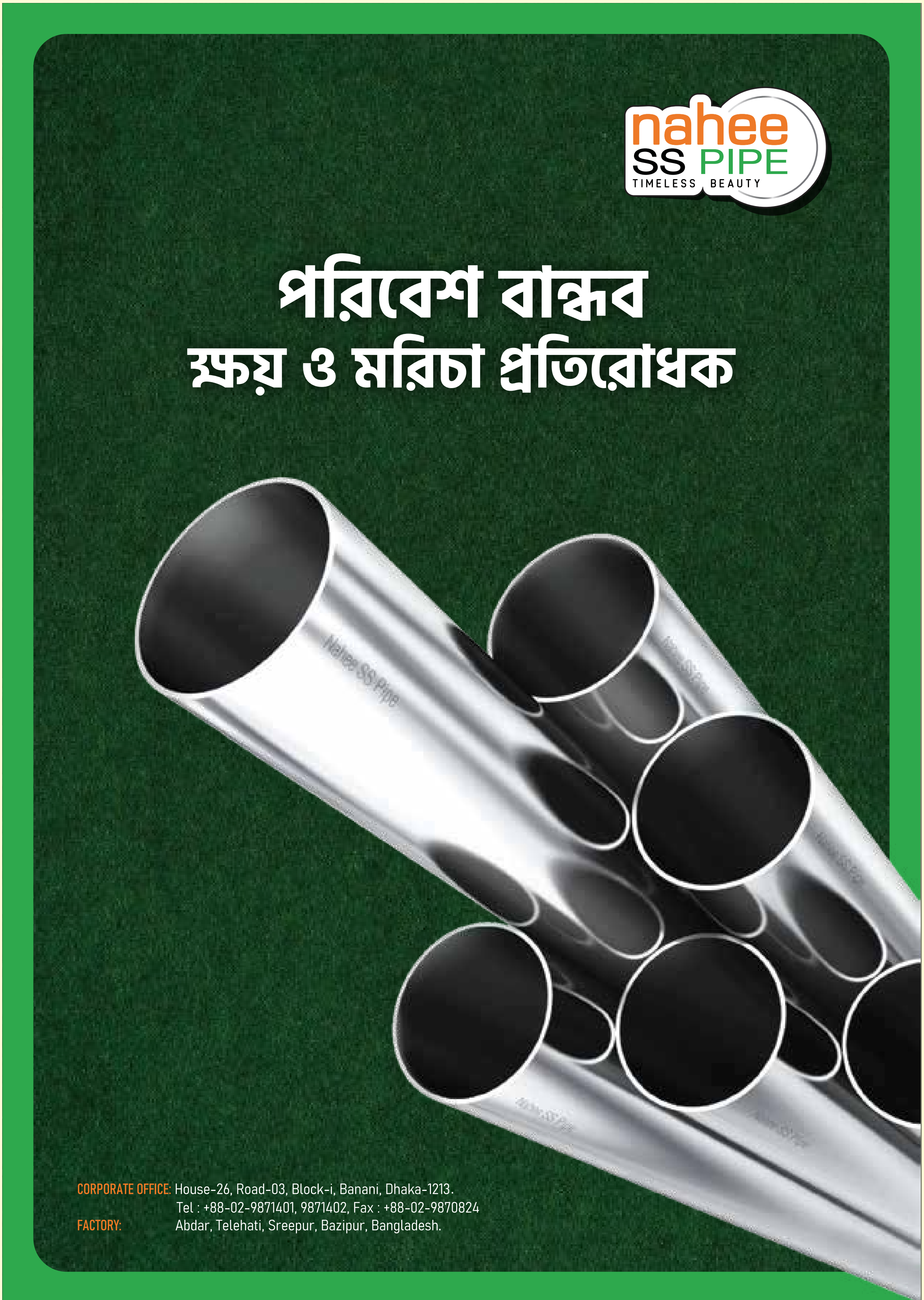
nahee
SS PIPE
TIMELESS BEAUTY
পরিবেশ বান্ধব
ক্ষয় ও মরিচা প্রতিরোধক
Nahee SS Pipe
CORPORATE OFFICE: House-26, Road-03, Block-i, Banani, Dhaka-1213.
Tel : +88-02-9871401, 9871402, Fax : +88-02-9870824
FACTORY: Abdar, Telehati, Sreepur, Bazipur, Bangladesh.

রাখীবন্ধন

শাশ্বতী নন্দী

রাখীবন্ধন উৎসব বা রাখীপূর্ণিমা ভারতীয় উপহাদেশের একটি উৎসব।এই উৎসব ভাই ও বোনের মধ্যে প্রীতিবন্ধনের উৎসব। হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ ও শিখরা এই উৎসব পালন করে। এই দিন দিদি বা বোনেরা তাদের ভাই বা দাদার হাতে রাখী নামে একটি পবিত্র সুতো বেঁধে দেয়। এই রাখীটি ভাই বা দাদার প্রতি দিদি বা বোনের ভালবাসা ও ভাইয়ের মঙ্গলকামনা এবং দিদি বা বোনকে আজীবন রক্ষা করার ভাই বা দাদার শপথের প্রতীক। হিন্দু পঞ্জিকা অনুসারে, শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই উৎসব উদযাপিত হয়। (তবে আমাদের মনে রাখতে হবে ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই অনুষ্ঠানের পুনঃসূচনা করেছিলেন বাংলার মানুষের মনে ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে।)

অনুষ্ঠান

রাখীবন্ধন উৎসবের দিন দিদি বা বোনেরা তাদের ভাই বা দাদার হাতের কবজিতে রাখী নামে একটি পবিত্র সুতো বেঁধে দেয়। পরিবর্তে ভাই বোনকে উপহার দেয় এবং সারাজীবন তাকে রক্ষা করার শপথ নেয়। এরপর ভাই-বোন পরস্পরকে মিষ্টি খাওয়ায়। উত্তর ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ে সহোদর ভাইবোন ছাড়াও জ্ঞাতি ভাইবোন এবং অন্যান্য আত্মীয়দের মধ্যেও রাখীবন্ধন উৎসব প্রচলিত। অনাত্মীয় ছেলেকেও ভাই বা দাদা মনে করে রাখী পরানোর প্রচলন রয়েছে। ছড়া কেটে বলে :

ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা
যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা
যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা
আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা।

পৌরাণিক রাখীবন্ধন

কৃষ্ণ ও দ্রৌপ

মহাভারতে আছে, একটি যুদ্ধে কৃষ্ণের কবজিতে আঘাত লেগে রক্তপাত শুরু হলে পাণ্ডবদের স্ত্রী দ্রৌপদী তাঁর শাড়ির আঁচল খানিকটা ছিঁড়ে কৃষ্ণের হাতে বেঁধে দেন। এতে কৃষ্ণ অভিভূত হয়ে যান। দ্রৌপদী তাঁর অনাত্মীয়া হলেও, তিনি দ্রৌপদীকে নিজের বোন বলে ঘোষণা করেন এবং দ্রৌপদীকে এর প্রতিদান দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। বহু বছর পরে, পাশাখেলায় কৌরবরা দ্রৌপদীকে অপমান করে তাঁর বস্ত্রহরণ করতে গেলে কৃষ্ণ দ্রৌপদীর সম্মান রক্ষা করে সেই প্রতিদান দেন। এইভাবেই রাখীবন্ধনের প্রচলন হয়।

বলিরাজা ও লক্ষ্মী

অন্য একটি গল্পে রয়েছে, দৈত্যরাজা বলি ছিলেন বিষ্ণুর ভক্ত। বিষ্ণু বৈকুণ্ঠ ছেড়ে বলির রাজ্য রক্ষা করতে চলে এসেছিলেন। বিষ্ণুর স্ত্রী লক্ষ্মী স্বামীকে ফিরে পাওয়ার জন্য এক সাধারণ মেয়ের ছদ্মবেশে বলিরাজের কাছে আসেন। লক্ষ্মী বলিকে বলেন, তাঁর স্বামী নিরুদ্দেশ। যতদিন না স্বামী ফিরে আসেন, ততদিন যেন বলি তাঁকে আশ্রয় দেন। বলিরাজা ছদ্মবেশী লক্ষ্মীকে আশ্রয় দিতে রাজি হন। শ্রাবণ পূর্ণিমা উৎসবে লক্ষ্মী বলিরাজার হাতে একটি রাখী

বেঁধে দেন। বলিরাজা এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে লক্ষ্মী আত্মপরিচয় দিয়ে সব কথা খুলে বলেন। এতে বলিরাজা মুগ্ধ হয়ে বিষ্ণুকে বৈকুণ্ঠে ফিরে যেতে অনুরোধ করেন। বলিরাজা বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেন। সেই থেকে শ্রাবণ পূর্ণিমা তিথিটি বোনেরা রাখীবন্ধন হিসেবে পালন করে।

ঐতিহাসিক রাখীবন্ধন

মহামতি আলেকজাণ্ডার ও পুরু রাজা

একটি কিংবদন্তি অনুযায়ী, ৩২৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মহামতি আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করলে আলেকজাণ্ডারের স্ত্রী রোজানা রাজা পুরুকে একটি পবিত্র সুতো পাঠিয়ে তাঁকে অনুরোধ করেন আলেকজাণ্ডারের ক্ষতি না করার জন্য। পুরু ছিলেন কাটোচ রাজা। তিনি রাখীকে সম্মান করতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি নিজে আলেকজাণ্ডারকে আঘাত করেননি।

রানি কর্ণবতী ও সম্রাট হুমায়ুন

একটি জনপ্রিয় গল্প অনুযায়ী, চিতোরের রানি কর্ণবতী ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাট হুমায়ুনকে একটি রাখী পাঠান। গুজরাতের সুলতান বাহাদুর শাহ চিতোর আক্রমণ করলে বিধবা রানি কর্ণবতী অসহায় বোধ করেন এবং তিনি হুমায়ুনকে একটি রাখী পাঠিয়ে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন। কর্ণবতীর রাখী প্রেরণে অভিভূত হয়ে হুমায়ুন চিতোর রক্ষা করার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। তবে হুমায়ুনের সেনা পাঠাতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। বাহাদুর শাহ রানির দুর্গ জয় করে নিয়েছিলেন। শোনা যায়, বাহাদুর শাহের সেনাবাহিনীর হাত থেকে সম্ভ্রম রক্ষা করার জন্য ১৫৩৫ সালের ৮ মার্চ রানি কর্ণবতী ১৩,০০০ পুরস্ত্রীকে নিয়ে জহর ব্রত পালন করে আগুনে আত্মাহুতি দেন। চিতোরে পৌঁছে হুমায়ুন বাহাদুর শাহকে দুর্গ থেকে উৎখাত করেন এবং কর্ণবতীর ছেলে বিক্রমজিৎ সিংকে সিংহাসনে বসান। সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের লেখা থেকে রাখী প্রেরণের কথা অবশ্য জানা যায় না। কোনো কোনো ঐতিহাসিক রাখী পাঠানোর গল্পটির সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন। তবে মধ্য-সপ্তদশ শতকের রাজস্থানী লোকগাথায় এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাখী বন্ধন

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ করার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাখী বন্ধন উৎসব পালন করেছিলেন। তিনি কলকাতা, ঢাকা ও সিলেট থেকে হাজার হাজার হিন্দু ও মুসলিম ভাই ও বোনকে আহ্বান করেছিলেন একতার প্রতীক হিসাবে রাখী বন্ধন উৎসব পালন করার জন্য।

সেই সময় দেশে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা চরম পর্যায়ে ছিল। ১০০ বছরেরও বেশি সময় আগে হিন্দু ও মুসলিম এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা আনার জন্য রাখী বন্ধন উৎসব পালন করা হয়েছিল।

উনিশ শতকে আমাদের বাংলায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চরম পর্যায়ে ছিল যা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাছে অপরিমিত ভয়ের কারণ। এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দমন করার জন্য ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত নেয় তারা বাংলাকে দুই ভাগে ভাগ করবে। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ সহ গোটা ভারতের বিভিন্ন নেতা এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছিল এবং বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে।

১৯০৫ সালের জুন মাসে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত নেয় এবং ১৯০৫ সালের আগস্ট মাসে বঙ্গভঙ্গ জন্য আইন পাশ করা হয়। এই আইন কার্যকরী হয় ১৬ই অক্টোবর, ১৯০৫।

শ্রাবণ মাসে হিন্দু ভাইবোনদের মধ্যে রাখী বন্ধন উৎসব পালন করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বোধ জাগিয়ে তোলা এবং ব্রিটিশদের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সবাইকে রাখী বন্ধন উৎসব পালন করার জন্য আহ্বান করেন। রবীন্দ্রনাথ এই দিনটির উদ্দেশে একটি গান লিখেছিলেন।

"বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ু বাংলার ফল-
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।
বাংলার ঘর, বাংলার হাট, বাংলার বন, বাংলার মাঠ-
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক হে ভগবান।
বাঙালির পণ, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা-
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান।
বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন-
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।"

সংগৃহীত

লেখক : সাধারণ সদস্য
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ

মানুষ, মানবতা ও অধিকার

ড. নিখিল চন্দ্র সরকার

বর্তমান তথ্য-প্রযুক্তির যুগে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন আবিষ্কার মানবজাতির চাহিদা পূরণ খুবই সহজলভ্য করে দিয়েছে। বিজ্ঞানের এ অগ্রযাত্রায় সারাবিশ্ব এখন হাতের মুঠোয়। কিন্তু মানবজাতির দুর্ভাগ্য নীতি-নৈতিকতা অতীতের চেয়ে বর্তমানে বহুলাংশেই অবক্ষয় ঘঠেছে। অপরদিকে একশ্রেণির মানুষ ধর্মান্ধতার কারণে প্রকৃত ধর্মের আদর্শকে লালন না করে ধর্মান্ধতার দোহাই দিয়ে মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প সৃষ্টি করে বিভাজন ব্যাপক আকার ধারণ করছে। যার ফলে সারাবিশ্বে কম-বেশি সাম্প্রদায়িকতার ধুম্রজাল সৃষ্টি করে সমাজে সম্প্রীতি বিনষ্ট করছে।

পণ্ডিত চণ্ডীদাসের ভাষায়, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের ভাষায়, 'মিথ্যা শুনিনি ভাই, এ হৃদয়ের বড় কোন মন্দির-কাবা নাই'। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিশ্বের মধ্যে যত প্রাণী যুগে যুগে জন্মেছে বা জন্মাবে তার মধ্যে মানুষই শ্রেষ্ঠ। মানুষ শব্দটিকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যার মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ, আত্মসম্মান, গুণগত মহিমা, সচেতনতা, বিবেক, বুদ্ধি, বোধ বিদ্যমান সেই হলো প্রকৃত অর্থে মানুষ। এসকল গুণে গুণান্বিত মানুষেরা এ সুন্দর পৃথিবীটাকে আরো সুন্দরময় করে গড়ে তুলতে পারে। এ চেতনা সমৃদ্ধ মানুষ দ্বারা সর্বময় সমন্বয় করে মানবতা, মনুষ্যত্ব, মানবপ্রেম ও সম্প্রীতির ব্যাপ্তি সহজতর হয়। ফলে মানুষের প্রতি মানুষের হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, হানাহানি নানা রকমের সংঘাত তখন কমে যাবে। তখনই উপকৃত হবে সমাজ, দেশ, জাতি ও সারাবিশ্ব। আজকের বিশ্বায়নের যুগে এটাই মানুষের মনের একান্ত প্রত্যাশা। মানব সভ্যতার ইতিহাসে মানুষের অভিনব সৃষ্টি যা জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা সম্ভব। এ গুণ পুরুষ ও নারী বলে বিভাজিত করা যাবে না। বিশ্বের মধ্যে একটি জাতি আছে তা হলো মানবজাতি। প্রকৃত মানুষেরা সারাবিশ্বকে এক শান্তি সুধায় পরিণত করতে পারে। কবি সত্যেন্দ্রনাথের 'মানুষ জাতি' কবিতার তিনটি পঙক্তি এখানে গ্রহণযোগ্য। তাহলো-

'জগত জুড়িয়া এক জাতি আছে,
সে জাতির নাম মানুষ জাতি;
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত
একই রবি শশী মোদের সাথী।'

এই মহান উক্তিটির মাধ্যমে স্পষ্টতঃ বুঝা যায়, মানুষের গুণগত মানের মূল্যায়ন যেমন ফুটে উঠেছে তেমনি মানুষের মধ্যে যে বিভেদ নেই এটাই প্রমাণ মেলে। কিন্তু আমরা বিবেকমান বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ হয়েও মানুষে মানুষে বিভাজন, বিবাদ ও সাম্প্রদায়িক বিভাজন করতে দ্বিধাবোধ করছি না।

চারণ কবি পণ্ডিত চণ্ডীদাস বলেছেন, 'শোনরে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন, 'গাহি সাম্যের গান, মানুষের চেয়ে নহে কিছু মহান, নহে কিছু মহিয়ান।' গৌতম বুদ্ধ বলেছেন, 'মানব জীবন মাত্রই দুর্লভ। কিন্তু অতি দুর্লভ হলো মনুষ্য অর্জন করা।' তিনি আরো বলেছেন, 'মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় জন্মে কিংবা বংশে নয়, প্রজ্ঞা ও কর্মের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্বনিহিত।' কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন 'প্রতিটি ঘরে ঘরে মানুষের জন্ম হয়, কিন্তু মনুষ্যত্বের জন্ম হয় না।' বিভিন্ন ধর্মীয় মহামানব, জ্ঞানী-গুণী, সাধক-সাধিকাগণ মানুষকে মর্যাদার আসনে আসীন করেছেন। মানুষের গুণ মহিমা অসাধারণ ও অতুলনীয়। একদিকে মানুষের অসীম ক্ষমতা ও অন্যদিকে প্রজ্ঞাশক্তি অদ্বিতীয়। মানুষের সহায়ক শক্তি হলো, সম্যক জ্ঞান, আত্মদর্শন ও আত্মশুদ্ধি। সুখ-শান্তি অর্জনে মানুষের মধ্যে একমাত্র অপ্রেমেয় প্রভাব লক্ষণীয়।

এভাবে মহান ব্যক্তি ও মনীষীগণ নানাভাবে মানুষকে মূল্যায়ন করেছেন। প্রকৃত অর্থে মানুষের মত মানুষ হতে না পারলে আপনার/আমার জনম সার্থক হতে পারে না। যদি ভাল মনের মানুষ হতে পারি তাহলে সুন্দর, আন্তরিকতা, আত্মবিশ্বাস, শ্রদ্ধাবোধ অবশ্যই জাগ্রত হতে বাধ্য। তখন মানুষের অন্তর থেকে অমনুষ্য স্বভাব, অমানবিক চিন্তা-ভাবনা, নিষ্ঠুরতা, হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি, লোভ ও মোহ ক্রমান্বয়ে কমে যেতে বাধ্য হবে। পরস্পরের প্রতি করুণাভাব প্রবল হয়। এ মানবিক নীতি আদর্শের মানুষ হয়ে ওঠে সহানুভূতিশীল, উদার ও পরমবন্ধু। অপরদিকে মানবিক চেতনা সমৃদ্ধ মানুষ কারো উপকার করতে না পারলেও ক্ষতি করতে পারে না। এমনকি কু-পরামর্শ ও কু-বুদ্ধি দিয়ে মানুষকে বিপদগ্রস্থ করে না। আত্মকল্যাণ ও পরকল্যাণের উপরই মানুষের উত্তম মাঙ্গলিক কর্ম নিহীত। ফলে মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের জাগরণ সহজ হয়। বর্তমান একবিংশ শতাব্দীর যুগে বিজ্ঞানের অধিক অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেলেও যেভাবে নৈতিক ও মানবিক অবক্ষয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে এ থেকে মুক্তির জন্য নীতি- নৈতিকতা ও চরিত্র গঠনের বিকল্প নেই। কেননা প্রতিটি মানুষের কল্যাণ ও মুক্তি অপরের হাতে নয় নিজের মুক্তি নিজেকেই অর্জন করতেই হবে।

মানবতা মানুষ মাত্রই আদর্শের অনন্য প্রতীক। যে মানুষের মধ্যে মানবতা নেই সেই মানুষ মানুষ নামের অভিশাপ। লোভী, ভোগসত্ত্বকারী, কৃপণ ও স্বার্থবাদী মানুষের কোন মানবতা নেই। তারা প্রতিহিংসা পরায়ন হয়, ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য করতে পারেনা এমন কোন কাজ নেই। অবোধ পশু যতটা না ক্ষতি করতে পারে মানুষ হয়েও এর চাইতে অধিক ক্ষতি করতে দেখা যায়। আসুন সকলে মিলে মিশে প্রতিবেশী, দুর্বল, অসহায়, অক্ষম, অঙ্গহীন, এমনকি শিক্ষা, চিকিৎসা বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা-প্রচেষ্টায় আত্মনিবেদিত হই। বিশ্বায়নের যুগে এটাই বেশী প্রয়োজন। মানবসেবা, মানবপ্রেম,

মানবকল্যাণ ও মানবমুক্তির পথ দেখানোর জন্য রাজপুত্র সিদ্ধার্থ গৌতম রাজকীয় ঐশ্বর্য ত্যাগ করে বনচারী ও ধ্যান সাধনার দ্বারা জগতে বুদ্ধ হয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন-"জীবে প্রেম করে যে জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর" অর্থাৎ জীব সেবায় ঈশ্বরের প্রাপ্তি ঘটে থাকে।

'মানুষ মানুষের জন্য একটু সহানুভূতি, মানুষ কি পেতে পারে না বন্ধু'- এ গানটির মাধ্যমে একজন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী ভূপেন হাজারিকা যে আহ্বান জানিয়েছেন তা অতুলনীয়। তার এ আহ্বানে সাড়া দিলে সর্বত্র শান্তি নেমে আসবে ও পূর্ণতা পাবে। ধর্মান্ধ ও সাম্প্রদায়িকতা মানুষের জীবনে বিষবাষ্প সমতুল্য। ধর্ম মানবতা ও মনুষ্যত্বের চেতনাকে ধারণ ও লালন করে থাকে। জীবনদর্শন জানতে ধর্ম হলো ব্রহ্মাস্ত্র তুল্য। অপরের ক্ষতি করা নয় বরং উপকার ও জীবন বাঁচানোর মধ্যেই ধর্মের নির্যাস নিহিত। তাই কবিগুরু বলে গেছেন 'অন্তর মম বিকশিত করো, অন্তর তর হে, নির্মল কর, সুন্দর কর উজ্জ্বল কর হে।' কবি প্রত্যেককে তার নিজের মনকে সুন্দর ও উজ্জ্বল করার আহ্বান জানিয়েছেন। আমরা সকলে শান্তিময় জীবন কামনা করে থাকি। তাই সবাইকে বুঝতে হবে আমি-আপনি শান্তির জনক ও অশান্তির হোতা। তাই নিজেকে আত্মশুদ্ধি করতে হবে। শান্তি লাভ করতে হলে সংযম, ধৈর্য্য, উদারতা, নৈতিকতা, আত্মবিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ এসকল মানবিক গুণাবলী থাকতে হবে। যতদিন মানুষ মানুষের প্রতি সদয়, প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, মমত্ব, সম্প্রীতি জাগাতে পারবে না ততদিন লোভ, বিদ্বেষ, মোহ ও অজ্ঞানতা থাকবে ততদিন সামাজিক অস্থিরতা বন্ধ করা অসম্ভব।

এদেশের পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব প্রয়াত কবির চৌধুরী বলেছেন 'সাধারণত সাম্প্রদায়িকতা বলতে আমরা ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকে বুঝি। যদিও ধর্মের অঙ্গন ছড়িয়ে ধর্মের অপব্যাখ্যাকে অবলম্বন করে তা যে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও নীতির অঙ্গনকেও বিষাক্ত করে তোলে তা আপনাদের অজানা নয়।' মানবজাতির ইতিহাসে আমিও মানুষ আপনিও মানুষ। এখানে সম্প্রদায় বলে কোন কথা নেই। আমার ও আপনার মূল পরিচয় হলো মানুষ হিসেবে। যার মাধ্যমে মানবতা, মানবপ্রেম, মানবকল্যাণ, মানবসেবা ও মানবহিতৈষী মুক্ত চিন্তা-চেতনার মধ্যে মানুষের মূল্যায়ন ও মর্যাদা ফুটে উঠে। এসকল মানুষের মানসিকতার মধ্যে সম্প্রীতি ও ভালবাসার ভাব খুবই আন্তরিক ও গভীর হয়। এ সকল চেতনা সমৃদ্ধ মানুষের মধ্যে বিন্দুমাত্র ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতার লেশ থাকতে পারে না। মানবিক গুণের মানুষকে মানবতাবাদী, বিবেকবান, সুখী চেতনা ও মনুষ্যত্বের ভাবাদর্শে সমৃদ্ধ হতে হবে। মানব জাতির ইতিহাসে মানুষ সহজাতভাবে শান্তিকামী কিন্তু মানুষের সহজাত শান্তি-প্রত্যাশাকে নস্যাৎ করার অজস্র প্রয়াস কলঙ্কিত করেছে মানজাতির ইতিহাসের অনেক অধ্যায়কে। বিশ শতকে দুইটি বিশ্ব-যুদ্ধের ভয়াবহ মরণযজ্ঞের প্রেক্ষাপটে শান্তিকামী বিশ্ববাসী বুঝতে সক্ষম হয়েছে- যুদ্ধ মানে মানুষের অস্তিত্বের অবসান ও সভ্যতার বিনাশ। তাই বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ ও দেশের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে জাতিসংঘ। সারাবিশ্বে স্লোগান উঠছে- যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই।

বাংলাদেশে সংবিধানের জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র- এ চারটি মূল স্তম্ভ। এ সংবিধান ১৯৭২ সালে প্রণীত হয়েছে। এ সংবিধানে ধর্ম-বর্ণ- নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। এটি ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করে। যা কোন ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ সমর্থন করে না। অপরদিকে সকল শ্রেণির মানুষকে স্বাধীনভাবে যার যার ধর্মপালনের অধিকার নিশ্চিত করে। বাংলাদেশের সংবিধানে কোথাও সংখ্যা লঘু ও সংখ্যা গুরু উল্লেখ নেই। এটি কারো কারো মনের কথা সংবিধানের কথা নয়। কারণ সংবিধানে সকলের সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। তাই নিজেকে সংখ্যা লঘু হিসেবে ভাবার কোন অবকাশ নেই। তাই সকল হিন্দু সমাজকে প্রতিবাদী হয়ে তার সম অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। ভয় ও আবেগকে চিরতরে বিদায় করতে হবে। প্রয়োজনে সবাইকে তার অধিকার আদায় করতে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। অন্যথায় এদেশ থেকে হিন্দু জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কারণ এ দেশের জনসংখ্যা জরিপ অনুযায়ী ১৯০১ সালে মোট জনগোষ্ঠির হিন্দু সংখ্যা ছিল ৩৩%, ১৯৬১ সালে ১৮.৫০%, ১৯৭৪ সালে ১৩.৫০% ও ২০২২ সালে ৭.৯৫%। লক্ষণীয় যে, ১৯০১ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ১২২ বছরে এ দেশে জনসংখ্যার হার যেখানে বৃদ্ধি পাওয়ার কথা কিন্তু তা না হয়ে জনসংখ্যার হার ৩৩% থেকে কমে ৭.৯৫% এ দাঁড়িয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে আগামী এক যুগের মধ্যে এদেশে হিন্দু জাতির জনসংখ্যার শতকরা হার এক-এ নেমে আসবে। তাই সকল হিন্দু সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তা প্রতিহত করতে হবে। আমরা এ দেশে জন্ম গ্রহণ করেছি। জন্মসূত্রে আমরা এদেশের নাগরিক কারো দানে ও কৃপায় নয়। তাই আমাদের অধিকার আমাদেরকে আদায় করে নিতে হবে। আমরা কারো কৃপায় কিংবা দয়া দাক্ষিণ্যে এদেশে বসবাস করতে চাই না। এটি আমাদের জন্মগত অধিকার।

লেখক : উপদেষ্টা

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ

www.runnerbd.com

ISO 9001 | 14001 | 45001

BRANDS OF
RUNNER®

- *Pioneer Motorcycle Manufacturer and exporter having 100,000+ capacity per year in Bangladesh*
- *First ever Three-Wheeler Manufacturing Plant in Bangladesh having 30,000+ Capacity per year*
- *Started Assembly for commercial vehicles for the local Market*

Network Point 806 Happy Customer 470,000+

জাতীয় পতাকার রূপকার : শিব নারায়ণ দাশ

প্রকাশ আদিত্য

জাতীয় সংগীতের সুরে সুরে যখন লাল সবুজের পতাকাটা নির্মল বাতাসে ঢেউ তুলে ওড়াওড়ি করে তখন চোখ ভরে দেখি। পরম দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চারদিকে রূপ রস বর্ণময় সৌদর্য্যটুকু মন ভরে শুষে নিই। রংপুরে মশিউর রহমান অপার বিস্ময়ে পৃথিবী দেখে।

মেঘনার বুকে উত্তালপাতাল ঢেউ ভেংগে রূপালী ইলিশের দেহে গোলাপী আভা ছড়িয়ে যায়। জীবনের সকল আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকে চাঁদপুরের আবুল কালাম। অসম্ভবরকম এ পাওয়া তাদের এ মুক্তির জন্য সৃষ্টিকর্তাকে নতুন জীবনের স্বাদ পাওয়া মশিউর ও আবুল কালাম সৃষ্টিকতার পাশাপাশি কনিয়া দান করা ব্যক্তিকে কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করে।

অন্ধকারাচ্ছন্ন দুজনের জীবনে আলোর বারতা নিয়ে এসেছে একজন মহান মানুষের দান করা কর্ণিয়া। যারা দেশকে দিতে চান ওঁরা কিছু না পেয়েও দিয়ে যান। এ মহাপুরুষ আর কেউ নন, তিনি আমার এবং অনেকের প্রিয় সম্মানিত শিব নারায়ন দাশ। জীবনে আর মরণেও নিভৃতচারী প্রচার বিমুখ এ লোকটা কেবল দিয়েই গেলো। জীবন হলো জয় আর ব্যর্থতার যুগলবন্ধী। উনার না পাওয়ার দীর্ঘ তালিকা এখনও সচেতন মানুষকে লজ্জিত করে তুলে। যথাযোগ্য সম্মান জানাতে না পারা আমাদের বাংলাদেশের মানুষের ব্যর্থতা।

বাংলাদেশের মানুষের স্বভাবজাত অভ্যাস হলো যোগ্য ব্যক্তিকে অসম্মান করা যা শিব নারায়ণ দাশকে স্পর্শ করতে পারেনি। প্রকট অভিমান নিয়ে চলে গেছেন শিবুদা, নিকট দূরত্বে থাকা মনিপুরী পাড়ায় সরল নিস্তরঙ্গ অন্তর্মুখী যাপিত সংসার থেকে।

স্বীকৃতি, পদক, পদবী, ভাস্কর্য স্থাপনের অসংযমী প্রতিযোগীতায় মত্ত ছিল দেশের সরকারি ব্যবস্থাগুলো। চড়া দামে পুরস্কার, পদবীর সওদা চলেছে এদেশে। কিন্তু নিভৃতচারী এ শিব নারায়ণ দাশকে স্পর্শ করার শক্তি সাহস দেশের তথাকথিত বুদ্ধিজীবি, রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং সংস্কৃতি কর্মীদের মনন, চিন্তা এবং

ভাবনার হাওয়াতে নাড়া দিতে পারে না। এ ব্যর্থতা সরকার, সংস্কৃতি সেবী, চাটুকার, বর্ণিক শ্রেণী এবং আমাদের মতো সাধারণ মানুষকে কেবল লজ্জিত করে নাই। তীব্র ঘৃনার সৃষ্টিও করেছে। এক রকম আত্মগ্লাণিতে কলুষিত করে রাখে। ধিক্কার জানায় ফুলেল শোকবার্তাকে তারপরও যদি, মরনোত্তর রাষ্ট্রীয় সম্মননা জানানোর প্রচলিত সংস্কৃতিকেও আদৌ তাঁর পরিবার পরিচিতজন ভালোভাবে নেবেন না বলে আমার ব্যক্তিগত অভিমত।

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার হয়ে কুমিল্লা থেকে ফিরে শাহবাগের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের এনাটমি বিভাগে গবেষণার টেবিলে শিব নারায়ণ নিথরভাবে শুয়ে আছে আমাদেরকে, এ বাংলাদেশকে বলবে– তোরা সম্মান দিতে পারিস নাই, এটা তোদের ব্যর্থতা। কিন্তু শিব নারায়ণ জীবনের এ পাড়ে যেমন নির্ভয়ে-নিঃশব্দে দিয়ে গেছেন-জীবনের পরেও দধীচির মত নিজেকে উৎসর্গ করলেন।

যোগ্যব্যক্তিকে যোগ্য সম্মান দিতে না পারা আমাদের অযোগ্যতাকে চোখে আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে দেয়। উইকিপিডিয়া সূত্রমতে শিব নারায়ণ দাশ বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় পতাকার অন্যতম এবং মূল নকশাকার। প্রথম দিকে বিস্তৃত সবুজ পটভূমির মাঝখানের লাল বৃত্তের মাঝে বাংলাদেশের মানচিত্র অলংকৃত ছিল। যা পরবর্তীতে পটুয়া কামরুল হাসানের সংশোধনীর মাধ্যমে সরলীকৃত হয়ে আজকের রূপে এসেছে।

৭ জুন ১৯৭০ এ ঢাকার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত ছাত্রদের এক সামরিক কুচকাওয়াজে মতান্তরে 'ফেব্রুয়ারি ১৫ বাহিনী' এর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রথম পতাকা উত্তোলনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

৬ জুন ১৯৭০ এ উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ইকবাল হল বর্তমানে সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের ১০৮ নং কক্ষে আ.স.ম আবদুর রব, শাহজান সিরাজ, কাজী আরেফ আহমেদ, মনিরুল ইসলাম পতাকার পরিকল্পনা নিয়ে বৈঠকে বসেন। এ বৈঠকে আরো উপস্থিত ছিলেন স্বপন কুমার চৌধুরী, নজরুল ইসলাম, শিব নারায়ণ দাশ, হাসানুল হক ইনু ও ইউসুফ সালাউদ্দীন।

এ বৈঠকেই কাজী আরেফের প্রাথমিক প্রস্তাবনার উপর ভিত্তি করে সবার আলোচনার প্রেক্ষিতে সবুজ জমিনের উপর লাল সূর্যের মাঝে হলুদ রঙের বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা তৈরির সিদ্ধান্ত হয়। তখন ঢাকা নিউ মার্কেটের এক বিহারী দর্জির দোকান থেকে কামরুল আলম খান (খসরু) বড় একটা টুকরা সবুজ কাপড়ের মাঝে লাল একটি বৃত্ত সেলাই করে আনলেন। তারপর বুয়েটের কায়েদ আজম হল (বর্তমানে তিতুমীর হল) এর ৩১২ নং কক্ষে এনামুল হকের কাছ থেকে এটলাস নিয়ে টেসিং কাগজে আঁকা হল পূর্ব পাকিস্তানের মানচিত্র। এরপর শিব নারায়ণ দাশ নিপুন হাতে মানচিত্রটা আঁকলেন লাল বৃত্তের মাঝে। এমনি করে রচিত হলো ফেব্রুয়ারি ১৫ বাহিনীর পতাকা। যা পরবর্তীতে বাংলাদেশের প্রথম পতাকা হিসেবে স্বীকৃত হয়।

২ মার্চ ১৯৭১ পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় এক বিশাল সমাবেশ ডাকা হয়। মঞ্চে আ.স.ম আবদুর রব বক্তৃতা করছিলেন। এ সময় রোকেয়া হলের দিক থেকে শেখ জাহিদ হোসেন একটি বাঁশের মাথায় পতাকা বেঁধে মঞ্চের নিকট মিছিল নিয়ে আসেন। তখনই রব প্রথম জনসমক্ষে এ পতাকা তুলে ধরেন।

২৩ মার্চ ১৯৭১ সালে পাকিস্তান দিবসে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় পাকিস্তানের জাতীয় পতাকার পরিবর্তে শিব নারায়ণ দাশের নকশা করা বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল।

স্বাধীনতা উত্তর ১৯৭২ সালে শেখ মুজিবুর রহমান সরকার, শিব নারায়ণ দাশের নকশা করা পতাকার মাঝে মানচিত্রটি বাদ দিয়ে পতাকার মাপ, রঙ ও তার ব্যাখ্যা সংবলিত একটি প্রতিবেদন প্রদান করার জন্য কামরুল হাসানকে দায়িত্ব প্রদান করেন। পরবর্তীতে পরিমার্জিত রূপটিই বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা।

এবার সংক্ষেপে জেনে নেওয়া যাক শিব নারায়ণ দাশকে।

১৬ ডিসেম্বর ১৯৪৬ বৃটিশ ভারতের কোলে প্রেসিডেন্সির টঙ্গিবাড়িতে তাঁর জন্ম। পিতা কুমিল্লার আয়ুর্বেদ চিকিৎসক সতীশ চন্দ্র দাশ এবং মাতা যোগামায়া দাশ। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পাক হানাদার বাহিনীর হাতে তাঁর পিতা শহীদ হন। ভাষা সৈনিক ধীরেন্দনাথ দত্তের হাত ধরে রাজনীতিতে আসেন শিব নারায়ণ দাশ। তাঁর দাম্পত্য সংগী গীতশ্রী চৌধুরীও একজন মুক্তিযোদ্ধা। সন্তান অর্ণব আদিত্য দাশ। শিবুদার শিক্ষা জীবন শুরু হয় কুমিল্লা জিলা স্কুল থেকে। আওয়ামীলীগের ছাত্র সংগঠন দিয়ে রাজনীতির পথচলা। পরবর্তীতে কুমিল্লা জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক হন এবং পরে কেন্দ্রীয় ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। পুরো মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তাঁর নিবেদিত অংশগ্রহণ ছিল স্মরণ করার মতো। সমস্ত রণাঙ্গণে এ পতাকা সম্মান, অহংকার আর প্রেরণার বার্তা নিয়ে বয়ে চলেছিল মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে হাতে।

দেশ স্বাধীন হলো। নানা জন নানাভাবে উপকৃত হলো, সম্মানিত হলো, পতাকা লাগানো গাড়িতে চড়ে বাংলাদেশের এ পাড় ও পাড় ছুটে বেড়ালো। রাজনৈতিক, আর্থিক সুযোগ সুবিধা নিয়ে অলংকৃত করে বাংলাদেশের নানা মসনদ, স্থান করে নিল।

কিন্তু প্রকট অভিমান নিয়ে এ নিভৃতচারী মহান মানুষটা আমাদের লজ্জার শায়রে ভাসিয়ে দিয়ে ১৯ এপ্রিল ২০২৪ চলে গেলেন অন্য ভুবনে চির প্রশান্তির দেশে।

বিশ্ব ইতিহাসে শিব নারায়ণ দাশ শ্রদ্ধাভরে

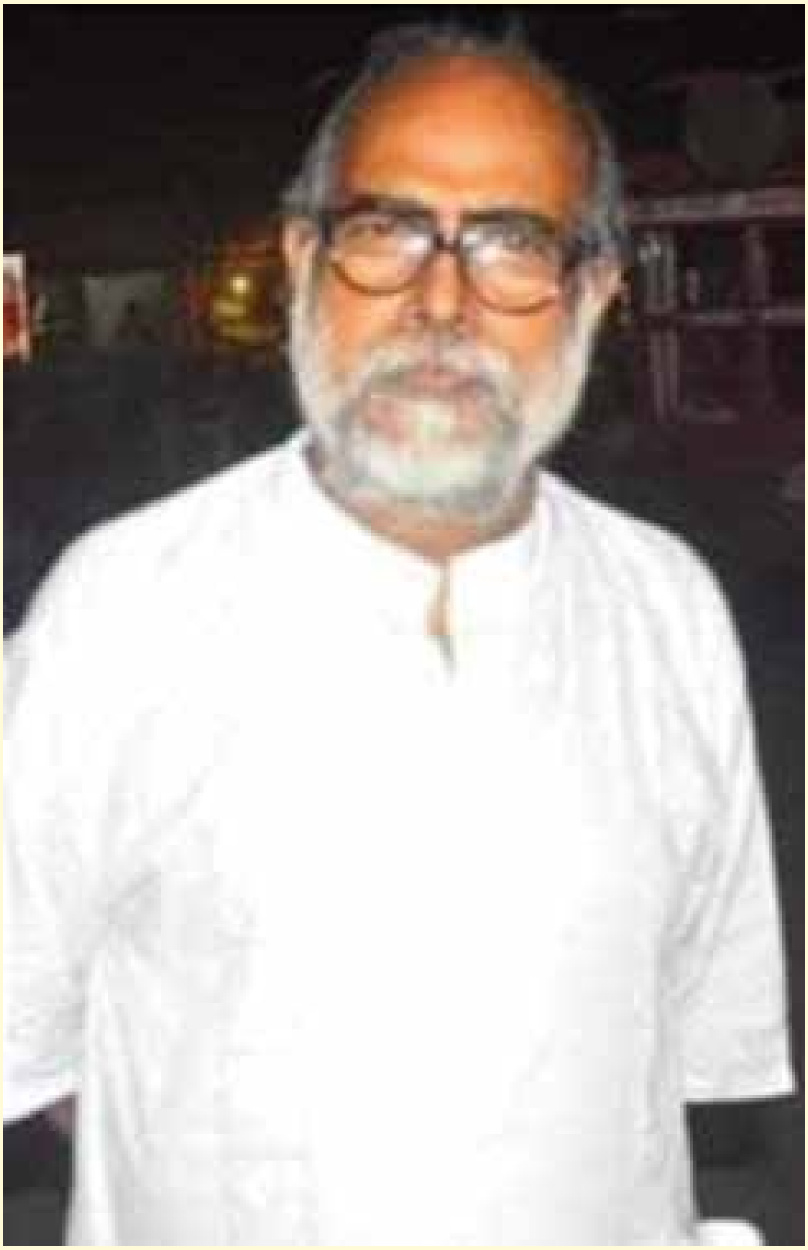

স্মরিত হন। উইকিপিডিয়া পৃথিবীর ১৬৭ জন ফ্ল্যাগ ডিজাইনার এর তালিকায় বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ডিজাইনার হিসেবে আমাদের প্রিয় শিব নারায়ণ দাশ এর নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্ম ৫৩ বছর হতে চললো। নানা প্রকারের নানা ধরণের শাসন ব্যবস্থা আমরা দেখেছি। অট্টালিকা, ভৌত অবকাঠামো অনেক নির্মিত হয়েছে। সাংস্কৃতিক বলয় নির্মিত হয়েছে। গালভরা কত একাডেমি হলো, প্রবর্তিত হলো অনেক পুরস্কার, যোগ্যতা যত না লালিত হয়েছে, বিবেচিত হয়েছে, তার অধিক সুযোগ নিয়েছে চাটুকারীতা, রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব এবং অসাধু আর্থিক যোগাযোগ।

এত দুঃখ ছাপিয়ে বলতে হয় স্বাধীনতার বয়সের অর্ধেকটা সময় মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি বলে দাবী করা আওয়ামী লীগ সরকারে দায়িত্বে ছিল। সাংস্কৃতিক বিকাশে এ দলের লোকজন গলা উচিয়ে অহংকার করে। ভাস্কর্য্য নির্মান, নাটক, গান বাজনা, চিত্রকলা, লোকজ সংস্কৃতির অনেক উন্নয়ন করেছে। মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন স্তরে অবদানের জন্য দেশ-বিদেশের প্রচুর মানুষকে সম্মানিত করেছে। কিন্তু দরজার কাছে রয়ে যাওয়া এ মহান শিল্পীকে, রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্বকে বাংলাদেশের পূর্বাপর কোন সরকার যথাযথভাবে মূল্যায়ন করেনি। ক্ষমা করবেন আমাকে, আমাদেরকে এ দেশকে, কিন্তু যারা আপনার এ উদ্যোগের সংগে তখন সহযোগী ছিল, সহযাত্রী ছিল তাদেরকেও। বড় দুভাগ্য এ জাতি। কষ্ট আর বেদনার জড়াজড়ি করে হয়ত আমরা একদিন শিবুদাকে ভুলে যাব। কিন্তু শিব নারায়ণ দাশ ইতিহাস হয়ে থাকবেন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিমঙ্গলে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে উড়ে বেড়াবে আপনার মহান কীতি।

প্রত্যাখানের যন্ত্রণা ছিল, তাই নিভৃতচারী জীবন বেঁচে নিয়েছিলেন। সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর আর্থিক এবং পেশীশক্তির বিস্তার এতটাই প্রকট হয়ে উঠছিল যে– সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ বড়ই নিস্পব হয়ে উঠেছিল।

ভেদাভেদহীন সংস্কৃতি এখন বেশ জনপ্রিয় ও বহুল জনশ্রুত ধারনা, কিন্তু সে সময়ে সহযোগী সুহৃদ সতীর্থরাও শিব নারায়ণ দাশকে সঠিক সম্মানের ব্যবস্থ করতে পারে না।

এটা নিতান্ত দুঃখজনক। আগামী প্রজন্ম ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে তীব্র ঘৃণা ছড়াবে তাদের উত্তরসূরীদের প্রতি এ বিষয়ে।

তবুও বলবো আমাদের প্রিয় শিবুদা সকলের মাঝে ভালোবাসায় ভালো লাগায়, সম্মানে শ্রদ্ধায় বেঁচে থাকবেন।

লেখক : গ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক
তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদ

Hinduism in Bangladesh

Wikipedia, the free encyclopedia

Hinduism is the second largest religion in Bangladesh, as according to the 2022 Census of Bangladesh, approximately 13.1 million people responded that they were Hindus, constituting 7.95% out of the total population of 165.15 million people. In terms of population, Bangladesh is the third-largest Hindu populated country of the world, after the neighboring countries of India and Nepal. Hinduism is the second-largest religion in 61 out of 64 districts of Bangladesh, but there is no Hindu majority district in Bangladesh.

In October 2022, the Government of Bangladesh proclaimed that it is dedicated to ensuring the safety and security of the Hindu minority community, after attacks on Hindu temples during religious pujas, Hindu communities, temples, mandirs, and pandals.

Culture

In nature, Bangladeshi Hinduism closely resembles the forms and customs of Hinduism practiced in the neighboring Indian state of West Bengal, with which Bangladesh (at one time known as East Bengal) was united until the partition of India in 1947. The vast majority of Hindus in Bangladesh are Bengali Hindus.

Goddess (Devi) – usually venerated as Durga or Kali – is widely revered, often alongside her consort Shiva. The worship of Shiva has generally found adherents among the higher castes in Bangladesh. Worship of Vishnu (typically in the form of his Avatars or incarnation Rama or Krishna more explicitly cuts across caste lines by teaching the fundamental oneness of humankind in spirit. Vishnu worship in Bengal expresses the union of the male and female principles in a tradition of love and devotion. This form of Hindu belief and the Sufi tradition of Islam have influenced and interacted with each other in Bengal. Both were popular mystical movements emphasizing the personal relationship of religious leaders and disciples instead of the dry stereotypes of the Brahmins or the Ulama. As in Bengali Hindu practice, worship of Vishnu frequently occurs in a small devotional society (shomaj). Both use the language of earthly love to express communion with the divine. In both traditions, the Bengali language is the vehicle of a large corpus of mystical literature of great beauty and emotional impact.

In Bangladeshi Hinduism, ritual bathing, vows, and pilgrimages to sacred rivers, mountains, and shrines are common practices. An ordinary Hindu will worship at the shrines of Muslim pirs, without being concerned with the religion to which that place is supposed to be affiliated. Hindus revere many holy men and ascetics conspicuous for their bodily mortifications. Durga Puja, held in September–October, is the most important festival of Bangladeshi Hindus and it is widely celebrated amongst Bangladeshi Hindus. Thousands of pandals (mandaps) are set up in various cities, towns, and villages to mark the festival. Other festivals are Kali Puja, Janmashtami, Holi, Saraswati Puja, Shivratri and Rathayatra, the most popular being the century- old Dhamrai Rathayatra.

The Priestly Caste Brahmin (pronounced Brahmon in Bengali) Bangladeshi Hindus, unlike their counterparts elsewhere in South Asia, eat fish and chicken. This is similar to the Indian state of West Bengal, where Hindus also consume fish, eggs, chicken, and mutton. There are also some vegetarians as well. There are also non-Bengali Hindus in Bangladesh, majority of the Hajong, Rajbongshi people and Tripuris in Bangladesh are Hindus.

Demographics

Percentage and population of Hinduism in Bangladesh

Year	Percentage (%)	Hindu Population	Total population	Notes
1901	33.00%	9,546,240	28,927,626	Eastern Bengal region
1911	31.50%	9,939,825	31,555,363	Before partition
1921	30.60%	10,176,030	33,254,607	
1931	29.40%	10,466,988	35,604,189	
1941	28.00%	11,759,160	41,999,221	
1951	22.05%	9,239,603	42,062,462	During Pakistani rule
1961	18.50%	9,379,669	50,804,914	
1974	13.50%	9,673,048	71,478,543	After independence of Bangladesh
1981	12.13%	10,570,245	87,120,487	
1991	10.51%	11,178,866	106,315,583	
2001	9.60%	11,822,581	123,151,871	
2011	8.54%	12,299,940	144,043,697	
2022	7.95%	13,130,109	165,158,616	
Source: Census of India 1901-1941, Census of East Pakistan 1951-1961, Bangladesh Government Census 1974-2022				

According to the 2001 Bangladesh census, there were around 11.82 million Hindus in Bangladesh constituting 9.6% of the population, which at the time was 123.15 million. The Bangladesh 2011 census states, that approximately 12.73 million people responded that they were Hindus, constituting 8.54% of the total 149.77 million. While 2022 Census of Bangladesh, put the number of Hindus in Bangladesh at 13.1 million out of total 165.1 million population, thus constituting 7.95% of the population. According to a report published by a local daily newspaper of Bangladesh, the Hindu population in the country has reduced by nearly one million between 2001 and 2011 period. The reduction mainly happened in nine districts– Bhola, Barisal, Jhalokati, Pirojpur, Bagerhat, Narail, Gopalganj, Rajbari and Manikganj. The United States Commission on International Religious Freedom have said that Hindus constitute merely 7% of the population in Bangladesh as per as the latest 2016 figures. Hindus in Bangladesh in the late 2000s were almost evenly distributed in all regions, with large concentrations in Gopalganj, Dinajpur, Sylhet, Sunamganj, Mymensingh, Khulna, Jessore, Chittagong and parts of Chittagong Hill Tracts. In the capital city of Dhaka, Hindus are the second-largest religious community after the Muslims and the largest concentration of Hindus can be found in and around Shankhari Bazaar of the old city.

In 2013, Amnesty International reported that the rise of more explicitly Islamist political formations in Bangladesh during the 1990s had resulted in many Hindus being intimidated or attacked, and that fairly substantial numbers were leaving the country for India.

In 1901, Hindus constituted 33% of the population of what is now Bangladesh. In 1941, about 28% of the population were Hindus. Their proportion declined to 22% in 1951 after the Partition of India in 1947, as Hindus migrated from East Bengal to India. Wealthy Hindus who migrated lost their land and assets through the East Bengal Evacuees Act. Poor and middle- class Hindus who were left behind were targets of discriminatory new laws. At the outbreak of the 1965 India-Pakistan war, the Defense of Pakistan Ordinance, and later the Enemy (Custody and Registration) Order II, labeled Hindus as the "enemy" and expropriated their property. The 1974 census of Bangladesh showed that the population of Hindus had fallen to 13.5%. Even after independence, the Hindus were branded "Indian stooges" and untrustworthy citizens.

Since 1971, the Hindu percentage has continued to decline, forming 8.5% of the population as of 2011. The fall in the share of total population has been attributed to outward migration, and the fertility rate for Hindus remaining consistently lower than Muslims (2.1 versus 2.3 as of 2014). The Bangladesh genocide of 1971 also disproportionately targeted Hindus.

Hinduism in Bangladesh by decades[4]

Year	Percent	Increase
1901	33%	-
1911	31.5%	▼ -1.5%
1921	30.6%	▼ -0.9%
1931	29.4%	▼ -1.2%
1941	28%	▼ -1.4%
1951	22%	▼ -6%
1961	18.5%	▼ -3.5
1974	13.5%	▼ -5
1981	12.1%	▼ -1.4
1991	10.5%	▼ -1.6
2001	9.6%	▼ -0.9%
2011	8.54%	▼ -1.06%
2022	7.95%	▼ -0.59%

The Hindu population in what is now Bangladesh has consistently decreased as a percentage of the population, from 28% in 1941 to 13.5% at the time of Bangladesh's founding in 1974, and reducing further to 7.9% in 2022. Bangladesh Census authority have found that since from the last 50 years, about 7.5 million (75 lakhs) Hindus have left the country due to religious persecution and discrimination. As per as 2016 official figures, it is estimated that Hindu population have came down to a mere 7%.

1971 genocide

Between the 1961 and 1974 censuses, the Hindu population increased by only 300,000, from 9.3 million to 9.6 million, while the Hindu percentage declined from 18.5% to 13.5%. The Hindu population was significantly impacted by the 1964 East Pakistan riots and 1971 East Pakistan genocide, which primarily targeted Bengali Hindus. An estimated 10 million East Pakistanis

sought refuge in India, with 80% being Hindus. Approximately 8 million Hindus fled to various parts of India during the 1971 Bangladesh Liberation War to escape persecution by Pakistani armies and Islamic militias. After Independence, it was discovered that 1.5 million Hindus remained in India, while the remaining 6.5 million returned to Bangladesh. Additionally, an estimated 3.1 million Hindus who were already residing in Bangladesh chose to remain during the turmoil and survived the atrocities. It is estimated that between 300,000 to 3 million people were killed during the Bangladesh Liberation War, with 300,000 to 400,000 Bengali women being raped, with the majority of victims being Hindus.

From 1964 to 2013, around 11.3 million Hindus left Bangladesh due to religious persecution and discrimination, as stated by Dhaka university economist Abul Barkat. On average 632 Hindus left the country each day and 230,612 annually as reported by him.

From his 30-year-long research, Barkat found that the exodus mostly took place during military governments after independence. Barkat also state's: that there should have been 28.7 million Hindus in the year 2013 instead of 12.2 million", Or, to put it another way, Hindus should have accounted for 16-18% of Bangladesh's population, not 9.7% as they do currently. According to the United States Commission on International Religious Freedom, Hindus constitute merely 7% of the population in Bangladesh as per as the latest 2016 figures.

According to the Pew Research Center, Bangladesh will have 14.47 million Hindus by 2050 who will comprise 7.3% of the country's population. Another theory suggest that Bangladesh will have at least 180-200 million population by 2050, out of which there will be around 8.51-9.25 million Hindus living in this nation, thus constituting only 4% after the beginning of half-century. On average, annually 230,612 Hindus were leaving Bangladesh for India permanently. So between (2024-2050), It is estimated that 5,995,912 Hindus will leave the country if current immigration rates continue further.

Bangladesh Liberation War atrocities (1971)

The Bangladesh Liberation War resulted in one of the largest genocides of the 20th century. While estimates of the number of casualties were 200,000–3,000,000, it is reasonably certain that Hindus bore a disproportionate brunt of the Pakistan Army's onslaught against the Bengali population of what was East Pakistan. The Pakistani Army killed many Bengali Hindus during the Liberation War, and most of the Bengali Hindu-owned businesses were permanently destroyed. The historic Ramna Kali Temple in Dhaka and the century-old Rath at Dhamrai were demolished and burned down by the Pakistani Army.

Early post-independence period (1972–75)

In the first constitution of the newly independent country, secularism and equality of all citizens irrespective of religious identity were enshrined. [124] On his return to liberated Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman in his first speech to the nation, specifically recognized the disproportionate suffering of the Hindu population during the Bangladesh Liberation War. On a visit to Kolkata, India in February 1972, Mujib visited the refugee camps that were still hosting several million Bangladeshi Hindus and appealed to them to return to Bangladesh and to help to rebuild the country.

Despite the public commitment of Sheikh Mujibur Rahman and his government to re-establishing secularism and the rights of non-Muslim religious groups, two significant aspects of his rule remain controversial as relates to the conditions of Hindus in Bangladesh. The first was his refusal to return the premises of the Ramna Kali Mandir, historically the most important temple in Dhaka, to the religious body that owned the property. This centuries-old Hindu temple was demolished by the Pakistan army during the Bangladesh Liberation War, and around one hundred devotees were murdered. Under the provisions of the Enemy Property Act, it was determined that ownership of the property could not be established as there were no surviving

members to claim inherited rights, and the land was handed over to the Dhaka Club.

Secondly, state-authorized confiscation of Hindu owned property under the provisions of the Enemy Property Act was rampant during Mujib's rule, and as per the research conducted by Abul Barkat of Dhaka University, the Awami League party of Sheikh Mujib was the largest beneficiary of Hindu property transfer in the past 35 years of Bangladeshi independence. This was enabled considerably because of the particular turmoil and displacement suffered by Bangladeshi Hindus, who bore the disproportionate burnt of the Pakistan army's genocide, as well documented by international publications such as Time magazine and the New York Times, and by the declassified Hamoodur Rahman Commission report. This caused much bitterness among Bangladeshi Hindus, particularly given the public stance of the regime's commitment to secularism and communal harmony.

Zia and Ershad regimes
(1975–1990)
President Ziaur Rahman abandoned the constitutional provision for secularism and began to introduce Islamic symbolism in all spheres of national life (such as official seals and the constitutional preamble). Zia brought back the multi-party system thus allowing organizations such as Jamaat-e-Islami Bangladesh (an offshoot of the Islamist Jamaat-e-Islami in Pakistan) to regroup and contest elections. In 1988, President Hussein Mohammed Ershad declared Islam to be the State Religion of Bangladesh. Although the move was protested by students and left-leaning political parties and minority groups, to this date neither the regimes of the BNP or Awami League has challenged this change and it remains in place.

In 1990, the Ershad regime was widely blamed for negligence (and some human rights analysis allege active participation) in the anti-Hindu riots following the Babri Mosque incident in India, the largest communal disturbances since Bangladesh independence, as a means of diverting attention from the rapidly increasing opposition to his rule. Many Hindu temples, Hindu neighbourhoods and shops were attacked and damaged including, for the first time since 1971, the Dhakeshwari temple. The atrocities were brought to the West's attention by many Bangladeshis, including Taslima Nasrin and her book Lajja which translated into English means "shame".

From Wikipedia

ঘড়ি
শ্রেষ্ঠ
এর পক্ষ থেকে শারদীয় দূর্গা পূজার
শুভেচ্ছা
12
9
3
GHARI
শ্রেষ্ঠ
সিনথেটিক ডিটারজেন্ট পাউডার
আগে ব্যবহার করুন, পরে বিশ্বাস করুন
সাশ্রয়ী মূল্যে
দারুন পরিষ্কার
নিট ওজন: ৫০০ গ্রাম
RSPL
EVOLUTION IS CONSTANT

REQUIRE
INSURANCE ?
OUR SERVICE
• Fire Insurance
• Motor Insurance
• Marine Insurance
• Aviation Insurance
• Engineering Insurance
• Personal Accident
• Overseas Mediclaim
• Miscellaneous
Our Credit Rating AAA
CONTACT US :
SKS Tower (12th Floor), 7 VIP Road, Mohakhali,
Dhaka -1206 , Bangladesh.
Phone + 88 02 55058455-7 Fax:+88 02 55058458
Email : info@senakalyanicl.com
Website : www.senainsurance.com
SENA INSURANCE PLC
SENA INSURANCE PLC
Your Trusted Risk Manager

JMI GROUP

... your trusted partner in health & service sector

Subsidiaries & Joint Ventures

- JMI Syringes & Medical Devices Ltd.
- JMI Hospital Requisite Mfg. Ltd.
- JMI Marketing Limited
- JMI Vaccine Ltd.
- JMI Printing & Packaging Ltd.
- JMI Builders & Construction Ltd.
- JMI Export Import Co. Ltd.
- JMI Engineering Ltd.
- JMI Industrial Research & Toxicology Ltd.
- JMI Industrial Gas Ltd.
- JMI LPG Petroleum Ltd.
- JMI Sonlu Appliance Ltd.
- JMI Cylinders Ltd.
- JMI Sankur Auto Tank Ltd.
- JMI Sankur Valve & Bung Ltd.
- JMI CNG Dispensing Co. Ltd.
- JMI Safe Transportation Ltd.
- NIPRO JMI Pharma Ltd.
- NIPRO JMI Company Ltd.
- NIPRO JMI Dialysis Centre Ltd.

Linjenta 5
Linagliptin 5 mg Tablet

The latest
The best

Doxiva
Doxophylline INN
400 mg Tablet

Simply better than Theophylline

JMI Sterile Latex Surgical Gloves

Blood Glucose Monitoring System (CareU SMART)

JMI Industrial Gas

12 kg 35 kg

Blood Tubing Set

EN ISO 13485:2012
ISO 9001:2008
CE EUROPE
World Health Organization
PERFORMANCE QUALITY SAFETY
...Certified

JMI Group

Corporate Office : Unique Heights, (Level-11), 117, Kazi Nazrul Islam Avenue, Ramna, Dhaka-1217, **Tel:** +88-02-55138723-24, **Fax:** +88-02-55138725
Registered Office : 7/A, Shantibag, Dhaka-1217, Bangladesh, **Tel:** +88-02-48318375, 9333102
Email: info@jmigroup-bd.com, **Web:** www.jmigroup-bd.com

কৃষিই সমৃদ্ধি

জাতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের গবেষণা সমন্বয়ের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়। কাউন্সিল সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের গবেষণা কার্যক্রম সমন্বয় করে উন্নত জাত, লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে টেকসই খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় সরকারের কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রমে সহায়তা করে। কাউন্সিলের সাম্প্রতিক উল্লেখ্যযোগ্য সাফল্যসমূহ নিম্নরূপ:

- জাতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের শীর্ষ সংস্থা হিসেবে কৃষি গবেষণায় নীতি-নির্ধারণের জন্য গবেষণা অগ্রাধিকার ও ভিশন ডকুমেন্ট ২০৩০ প্রণয়ন
- মাটি, জলবায়ু ও এলাকা উপযোগী ফসল নির্বাচন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্রপ জোনিং ম্যাপ প্রণয়ন
- জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমের বিজ্ঞানীদের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ এর জন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০২৫ প্রণয়ন
- জাতীয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ রোডম্যাপ ২০২১, ২০৩১ ও ২০৪১ প্রণয়ন।
- বিএআরসি কর্তৃক জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির মাধ্যমে বিগত ১০ বছরে এনএআরএস প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত ১৭০টিরও বেশি জাত ছাড়করণের সুপারিশ করা হয়েছে।
- ফসলের সারের মাত্রা সুপারিশ করে সার সুপারিশমালা হাতবই-২০১৮ বাংলা ও ইংরেজিতে প্রণয়ন করা হয়েছে, যা অনলাইন সেবা হিসেবে বিএআরসি'র ওয়েবসাইটে আপলোড করা আছে।
- জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি প্রকল্প-১ এর মাধ্যমে ২০০৭-২০১৪ মেয়াদে এনএআরএস প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীদের দেশে ৭৮টি ও বিদেশে ৩০টি পিএইচডি প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং ফসল, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের ৫০টিরও অধিক নতুন জাত ও উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে।
- জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি প্রকল্প-২ প্রকল্পটি ২০১৫-২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উক্ত প্রকল্পের অর্থায়নে ২০১৬-১৭ অর্থ বছর থেকে ১৯০টি Competitive Research Grants ও ৫১টি Program Based Research Grants উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ ছাড়া এ প্রকল্পের আওতায় এনএআরএস প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীদের দেশে ৮০টি ও বিদেশে ৬০টি পিএইচডি প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন আছে।
- বাংলাদেশের ব্লু ইকোনোমি প্রসারে সামুদ্রিক শৈবাল কৃত্রিমভাবে চাষাবাদ করার লক্ষ্যে বিএআরসি'র সমন্বয়ে ২০১৬ সাল হতে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
- কৃষি গবেষণা ও উন্নয়নে সহোযোগিতামূলক কর্মকাণ্ড জোরদার করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশ, বিশ্ববিদ্যালয় ও আন্তর্জাতিক কৃষি গবেষণা সংস্থার সাথে ৪০টির অধিক সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
নূতন বিমান বন্দর সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
ফোন: +৮৮০-২-৯১৩৫৫৮৭, +৮৮০-২-৯১১০৮৪২
ই-মেইল: ec-barc@barc.gov.bd, info@barc.gov.bd

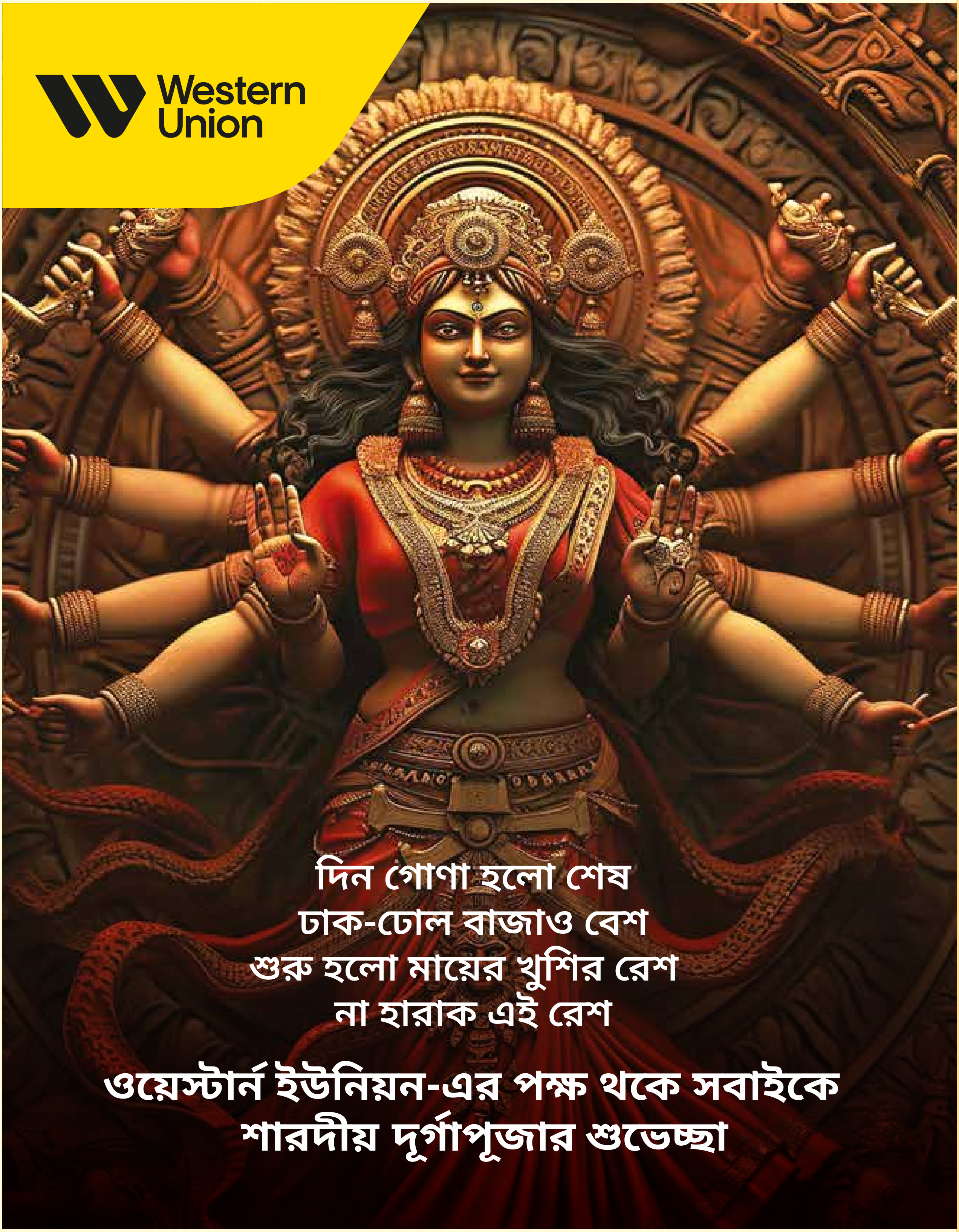
Western Union
দিন গোণা হলো শেষ
ঢাক-ঢোল বাজাও বেশ
শুরু হলো মায়ের খুশির রেশ
না হারাক এই রেশ
ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন-এর পক্ষ থকে সবাইকে
শারদীয় দূর্গাপূজার শুভেচ্ছা

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আলোকচিত্র

বাণী বন্দনা
শ্রী শ্রী সরস্বতী পূজা-২০২৪

বাণী বন্দনা
শ্রী শ্রী সরস্বতী পূজা-২০২৪

বাণী বন্দনা
শ্রী শ্রী সরস্বতী পূজা-২০২৪

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন
শ্রী প্রদীপ কুমার সাহা

বাণী চিরন্তন

এই মুহূর্তের জন্য খুশি হও। এই মুহূর্তটি আপনার জীবন।

-ওমর খৈয়াম

আপনি মানবতার উপর বিশ্বাস হারাবেন না। মানবতা একটি সমুদ্র; সাগরের কয়েক ফোঁটা জল নোংরা হলে সাগর নোংরা হয় না।

-মহাত্মা গান্ধী

প্রত্যেককে বিশ্বাস করা বিপজ্জনক, কিন্তু কাউকে বিশ্বাস না করা আরো বেশী বিপজ্জনক।

-আব্রাহাম লিংকন

যারা কাপুরুষ তারাই ভাগ্যের দিকে চেয়ে থাকে, পুরুষ চায় নিজের শক্তির দিকে। তোমার বাহু, তোমার মাথা তোমাকে টেনে তুলবে, তোমার কপাল নয়।

-ডঃ লুৎফর রহমান

কোনকালে একা হয়নিকো জয়ী পুরুষের তরবারী; প্রেরণা দিয়েছে, শক্তি দিয়াছে, বিজয়ালক্ষ্মী নারী।

-কাজী নজরুল ইসলাম

বিদ্বানের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও দামি।

-আল হাদিস

ধনপিশাচদের মুখাপেক্ষী না হওয়ার জন্য জ্ঞানীরা ধন সঞ্চয় করে।

-এরিস্টটল

মনুষ্যত্বের শিক্ষাটাই চরম শিক্ষা আর সমস্তটাই তার অধীন।

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যদি তুমি মানুষকে বিচার করতে যাও তাহলে ভালবাসার সময় পাবে না।

-মাদার তেরেসা

সুশিক্ষিত মানুষ মাত্রই স্বশিক্ষিত।

-প্রমথ চৌধুরী

আমি ব্যর্থতাকে মেনে নিতে পারি কিন্তু আমি চেষ্টা না করাকে মেনে নিতে পারিনা।

-মাইকেল জর্ডান

আমরা যতই অধ্যয়ন করি ততই আমাদের অজ্ঞতাকে আবিষ্কার করি।

-শেলী

মৃত্যুর যন্ত্রণার চেয়ে বিরহের যন্ত্রণা যে কতো কঠিন, কতো ভয়ানক তা একমাত্র ভুক্তভুগিই অনুভব করতে পারে।

- কাজী নজরুল ইসলাম

সুশিক্ষার লক্ষণ হলো তা মানুষকে অভিভূত না করে, তাহা মানুষকে মুক্তিদান করে।

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মা হলো স্নেহের ভাণ্ডার যা কখনও নিঃশেষ হয় না।

-রেদোয়ান মাসুদ

আমাকে শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাকে শিক্ষিত জাতি দিবো।

-নেপোলিয়ন বোনাপার্ট

Proprietor

Coma Creation

A Confident Customs Clearing and Forwarding Agent

SHAHIK SYNDICATE

Agents, Indenter, Importer, Exporter, Contractor and Supplier

Fleet Freight

Global Logistic Service Provider

Corporate Office:
Center Point Concord, Unit # 7/A, Level-7, 14/A & 31/A
Tejkunipara, Farmgate, Tejgaon, Dhaka-1215
Tel: 88-02-41024421, 41024422, Fax: 88-02-41024423
Mob: 88-01796387515, Web: comacreation.com
E0mail: comacreation94@gmail.com, khayrul66@gmail.com

Khayrul Bashar
General Secretary
Dhaka Customs Agents Association
Cell: 01713033999

CTG Office: Chaity Plaza, 1st Floor, 11 Sk. Mujib Road, Barik Building More, Agrabad C/A Chittagong-4100, Tel: 023333 15749, Fax: 023333 15604 Cell: 01773354977, E-mail: comacreation@gmail.com	**Khulna Office:** 48, Khan Jahan Ali Road, Imam Uddin Plaza (3rd Floor), Khulna-9100 Tel & Fax: 88-041-810773, Cell: 01726-747387 E-mail: comacreation94@gmail.com
Benapole Office: Shanjahan Building (1st Floor), Opposite to 2 No. Warehouse Gate, Beneapole Bazar, Jessore, Phone: 01716-659011 E-mail: comacreationbpl@gmail.com	**Other Office: ICD Kamalapur, ICT Pangaon & Air Port, Dhaka. Payra Sea Port. Rooppur LCL Station.**

লেবুজাতীয় ফসলের সম্প্রসারণ, ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা

প্রকল্পের বাস্তবায়নকালঃ ০১ মার্চ ২০১৯ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩

প্রকল্প এলাকাঃ দেশের ৭ টি বিভাগের ৩০ টি জেলার ১২৩ টি উপজেলা

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- লেবু জাতীয় ফল চাষ নিবিড়করণ ও প্রায় ১০-১৫% ফলন বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।
- প্রকল্প এলাকায় অতিরিক্ত ৪০,০০০ মে.টন মাল্টা ও কমলা উৎপাদনের মাধ্যমে প্রায় ৪০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়।
- মাল্টা ও অন্যান্য লেবু জাতীয় ফল উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রকল্পের এলাকায় বাইরের ২৫% কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা।
- প্রকল্প এলাকার ২০টি সরকারী নার্সারীতে লেবু জাতীয় ফলের মার্তৃবাগান স্থাপন ও চারা উৎপাদনের দক্ষতা প্রায় ২৫% বৃদ্ধি করা।
- প্রদর্শনীভুক্ত কৃষকদের বিশেষ করে মহিলা কৃষকদের সহ অন্যান্য কৃষকদের আয় ১০% বৃদ্ধি করা ও ৮-১০% বেকারত্ব দূর করা।
- সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট ও কমলা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ৫০০০টি পুরাতন বাগানের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফলন ১৫-২০% বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

- ✓ লেবু জাতীয় ফসলের (মাল্টা, কমলা, বাতাবী লেবু ও লেবু) একক/মিশ্র প্রদর্শণী
- ✓ পুরাতন লেবু জাতীয় ফল বাগান পরিচর্যা
- ✓ নার্সারী ব্যবস্থাপনা, চারা উৎপাদন ও উন্নয়ন
- ✓ অফিসার ও কৃষক প্রশিক্ষণ
- ✓ উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমন ও মাঠ দিবস
- ✓ জাতীয় ও আঞ্চলিক কর্মশালা

আজকের সঞ্চয় দুর্দিনের বন্ধু

দি মেট্রোপলিটন হিন্দু কর্মজীবি সমবায় সমিতি লিঃ

মাসিক সঞ্চয় ডিপোজিট (এমএসডি), হাউজিং প্রকল্প, ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প, শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্প, হাসপাতাল প্রকল্প, হোস্টেল প্রকল্প, পরিবহন প্রকল্প, বিশুদ্ধ জল বোতলজাত প্রকল্প, সমবায় বিপণী প্রকল্প, বুটিক শপ প্রকল্প, হোম সার্ভিস প্রকল্প, বৃদ্ধাশ্রম প্রকল্পসহ প্রভৃতি উন্নয়নমূলক কাজ করা।

- ☛ সদিচ্ছাই সঞ্চয়ে সাহস যোগায়।
- ☛ আজকের সঞ্চয় আগামী দিনের ভবিষ্যৎ।
- ☛ মিতব্যয়ী হোন, সঞ্চয় করুন।
- ☛ সঞ্চয় করে যে, উন্নতি করে সে।

দি মেট্রোপলিটন হিন্দু কর্মজীবি সমবায় সমিতি লিঃ-এ সঞ্চয় করুন, স্বাবলম্বী হোন।

সমিতির মূল লক্ষ্য:

সমিতির সদস্যদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অত্র প্রতিষ্ঠানটি একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত করা এবং সদস্যদের আর্থিকভাবে স্বচ্ছল করে তোলা।

উদ্দেশ্যাবলি:

ক. অপেক্ষাকৃত অস্বচ্ছল, নির্যাতিত ও সামাজিকভাবে অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সহযোগিতা করা।
খ. সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করে সঞ্চয়মুখী করার মাধ্যমে তাদেরকে পারিবারিকভাবে ও সামাজিকভাবে উন্নত করা।
গ. প্রতিষ্ঠানের তহবিল বৃদ্ধির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা।
ঘ. সদস্যদের বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে স্ব স্ব পেশায় প্রতিষ্ঠিত করা।
ঙ. সদস্যদের প্রয়োজনে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা।
চ. বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা।
ছ. দরিদ্র ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে ডায়গনোস্টিক সেন্টার/ক্লিনিক/হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা।
জ. সদস্যদের আবাসন সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে হাউজিং প্রকল্প চালু করা।
ঝ. সর্বোৎকৃষ্টমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।
ঞ. মেধাবী ও অস্বচ্ছল ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ ও শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা।

সমিতির বর্তমান কার্যক্রম:

সমিতির সদস্যদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে আর্থিক উন্নতির জন্য

- **ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প:** সমিতির সদস্যদের মাঝে ক্ষুদ্রঋণ চলমান।
- **সমবায় বিপণী প্রকল্প:** তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও-এ সমবায় বিপণী চালু হয়েছে। এই প্রকল্প পর্যায়ক্রমে ঢাকার সর্বত্র চালু হবে। সমবায় বিপণী তেজগাঁও প্রকল্পে মূলধন/বাজেট ৫০ লক্ষ টাকা। মূলধন সংগ্রহের জন্য সমিতির সদস্যদের কাছে শেয়ার বিক্রি শুরু হয়েছে।
- **বুটিক শপ প্রকল্প:** খুব শীঘ্রই বুটিক শপ প্রকল্পটি মহিলা সদস্যাদের নিয়ে চালু হবে।
- **হাউজিং প্রকল্প:** তেজকুনিপাড়া, তেজগাঁওসহ ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকা, ঢাকার উপশহরে সমিতির সদস্যদের আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য সমিতির সদস্যদের মাঝে যৌথ উদ্যোগে জমি ক্রয় করে তাতে এ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণ করে কিস্তি সুবিধার মাধ্যমে ফ্ল্যাট দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে তেজকুনিপাড়া, তেজগাঁও-এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য অপরাজিতা হাউজিং সোসাইটি গঠন করা হয়েছে।
- **হোস্টেল প্রকল্প:** ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য শীঘ্রই হোস্টেল চালু হবে।
- **ডায়গনোস্টিক সেন্টার:** সমিতির সদস্যদের স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা সুবিধা দেওয়ার লক্ষ্যে প্রকল্পটি শীঘ্রই চালু হবে।

সদস্য হওয়ার নিয়মাবলি:

➤ সদস্য ভর্তি ফি ১০০ টাকা।
➤ মাসিক সঞ্চয় ৩০০ টাকা তবে কেউ ইচ্ছা করলে ৬০০/৯০০/১২০০ টাকা বা আরও অধিক সঞ্চয় করতে পারবেন, জমার আনুপাতিক হারে লভ্যাংশ পাবেন। ভর্তির সময় ৪ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র (যদি থাকে) জমা দিতে হবে।

সদস্য হওয়ার যোগ্যতা:

ক. যারা রাষ্ট্রবিরোধী কোনো কাজে লিপ্ত নাই কিংবা রাষ্ট্রীয়ভাবে দণ্ডপ্রাপ্ত নন।
খ. যারা পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববন্ধনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে সমবায়ভিত্তিতে কাজ করতে আগ্রহী।
গ. যারা নিয়মিত ও নির্ধারিত ডিপোজিট/সঞ্চয় প্রদানে সক্ষম।
ঘ. যারা অত্র প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-শৃঙ্খলা ও বিধি-বিধান যথাযথভাবে পালন করবেন।
ঙ. ১৮ বছরের উপরের হিন্দু ধর্মাবলম্বী সকল নারী/পুরুষ। তবে ১৮ বছরের নিচে অর্থাৎ নাবালকের ক্ষেত্রে তার অভিভাবক উক্ত হিসাব পরিচালনা করতে পারবেন।

যোগাযোগ: ০১৭১১ ৯০৫২০৬, ০১৭১১ ৫২৮২২০, ০১৯৭১ ৯৭৪৫৭৯

M/S MAA ENTERPRISE
M/S F.K TRADERS

HAPPY

DURGA PUJA

“Fire Kill” brand is unique in fire fighting.
We import and supply all types of fire extinguishers and spare parts.

Showroom:
M/S F K Traders
Kaptan Bazar Complex, Building # 1
Shop # 206 & 320 Nawabpur Road,
Dhaka -1100.
Mobile : 01712-928532, 01711-192377
E-mail : fk.fire60@gmail.com

Office/Factory:
M/S MAA ENTERPRISE
228/4 Meraznagar, B-Block Main Road
Kadamtali, Dhaka-1362.
Mobile : 01711-192377, 01712-928532
E-mail : maenterprise571@gmail.com

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের উপদেষ্টা পরিষদ

শচীন্দ্র চন্দ্র বর্মন

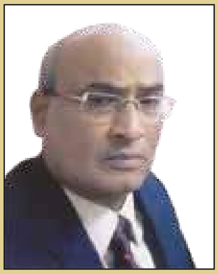
প্রফেসর স্বপন কুমার বনিক

নিতাই চন্দ্র সাহা

ড. রতন চন্দ্র দে

অরুণাভ চক্রবর্তী

প্রণয় কান্তি বিশ্বাস

চন্দন কুমার দে

সঞ্জীব কুমার সাহা

শশাঙ্ক শেখর ভৌমিক

রথীন্দ্র নাথ দত্ত

গৌতম কুমার ঘোষ

আনন্দ মোহন মন্ডল

বাবুল চন্দ্র রায়

অধ্যাপক আরতি দাশ

খোকন কান্তি শর্মা

প্রকৌশলী সনজিত কুমার ঘোষ

বিমল কুমার সাহা

প্রণব সাহা

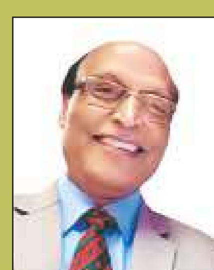
প্রণব কুমার সাহা

অমলেন্দু রায়

ডাঃ চন্দ্র শেখর বোস

ডাঃ রনধীর কুমার কুণ্ডু

ডাঃ সুশংকর কুমার মন্ডল

বিপ্লব কুমার রায়

সঞ্জয় চ্যাটার্জী

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের উপদেষ্টা পরিষদ

মহাদেব ঘোষ

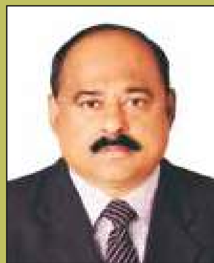
সুজিত চ্যাটার্জী

সুবল চন্দ্র রায়

সপ্তম বিশ্বাস, এফসিএ

ড. নিখিল চন্দ্র সরকার

জীবন কৃষ্ণ মোদক

বিপুল কুমার বিশ্বাস

প্রকৌশলী স্বপন কুমার হালদার

ইঞ্জি. ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ

অনুপ কুমার সাহা

অপূর্ব কুমার রাহুত

বিষ্ণুপদ রায়, এফসিএমএ

গোপাল চন্দ্র দেবনাথ, এফসিএ

দেবাশীষ চক্রবর্তী

বিপ্লব কুমার সরকার

লিটন কুমার দাস

নিতাই চন্দ্র মণ্ডল

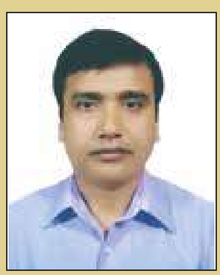
সঞ্জীব কুমার বণিক

ডাঃ মৌসুমী সরকার

চন্দন কুমার সাহা

নৃপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

মধু সূদন মন্ডল

বীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ

অখিল বিশ্বাস

তাপস কুমার সাহা

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের উপদেষ্টা পরিষদ

বিশ্বজিৎ কুমার কর্মকার

রমেশ চন্দ্র ঘোষ

রাহুল রাহা

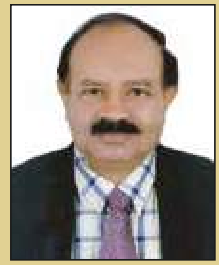
এস. কে. সিকদার

শ্যামল কুমার মুখার্জী

সাত্যকি কবিরাজ

তাপস কুমার দাস

রাজিব দাশ

সুধীর রঞ্জন দাশ

ইঞ্জি. মিহির কান্তি মজুমদার

ডাঃ দেবব্রত হালদার

প্রদীপ কুমার সূত্রধর

কানাই লাল বণিক

স্বাগতম কুমার সাহা

শ্রী দেবল কুমার দাস

Md. Tazul Islam Kazal
Proprietor

শারদীয় শুভেচ্ছা

Prianka Syndicate
Customs Clearing & Forwarding Agent

Oishi Traders
General Importer

Dhaka Office :

Meherba Plaza
33, Topkhana Road
(6th Floor) Suit # L
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone : +88 02 9550027
+88 02 9567416

Chattagram Office :

M. F. Tower (4th Floor)
57/60, Badamtoli Agrabad
Chattagram
Phone : 031-2516772-3
Mobile : +88 01713035961
+88 01711525198
E-mail : oishitraders@yahoo.com
E-mail : prsy1995@gmail.com

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের কার্য নির্বাহী কমিটি (ব্যবস্থাপনা কমিটি)

প্রদীপ কুমার সাহা
সভাপতি

শান্তনু দাস বাপ্পী
সহ-সভাপতি

সঙ্গীত কুমার ঘোষ
সহ-সভাপতি

প্রমোদ রঞ্জন রায়
সহ-সভাপতি

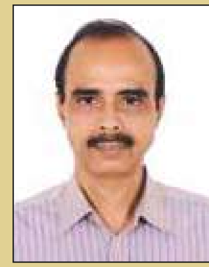
নেপাল দে
সহ-সভাপতি

ভবেশ গোস্বামী
সহ-সভাপতি

শিশির রঞ্জন দাস
সহ-সভাপতি

দীপক লাল কর্মকার
সহ-সভাপতি

সুখলাল নন্দী
সাধারণ সম্পাদক

অশোক ধর
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

অরুন চন্দ্র ভৌমিক
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

হীরালাল বাইন
অর্থ সম্পাদক

ঝন্টু চন্দ্র সাহা
সহ-অর্থ সম্পাদক

মৃত্যুঞ্জয় রায়
সাংগঠনিক সম্পাদক

শ্যামল মিত্র
সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক

বিশ্বজিত রায়
দপ্তর সম্পাদক

প্রবীর কুমার সরকার
প্রচার সম্পাদক

প্রিয়লাল শর্মা
সহ-প্রচার সম্পাদক

এড. বিনয় কৃষ্ণ পোদ্দার
আইন বিষয়ক সম্পাদক

গোপাল চন্দ্র দত্ত
গণ সংযোগ সম্পাদক

প্রকাশ কুমার দাস
গ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক

রতন কুমার রায়
সহ-গ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক

অরুণ চৌধুরী
সাংস্কৃতিক সম্পাদক

প্রদীপ কুমার সাহা
সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক

মানিক লাল দাস
সমাজ কল্যাণ সম্পাদক

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের কার্য নির্বাহী কমিটি (ব্যবস্থাপনা কমিটি)

কেশব সেন
আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক

রনধীর বিশ্বাস
ধর্মীয় বিষয়ক সম্পাদক

কবিতা রাণী পাল
মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক

নমিতা চক্রবর্তী
সহ-মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক

অসীম কুমার দাশ
ছাত্র, যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক

দীপ্তি সাহা
পূজা বিষয়ক সম্পাদক

মিনা ভৌমিক
সহ-পূজা বিষয়ক সম্পাদক

সুবিমল শিকদার
শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক

গৌর চন্দ্র ঘোষ
সদস্য

নারায়ন চন্দ্র দে
সদস্য

বকুল রানী দেবী
সদস্য

লিটন চন্দ্র দাস
সদস্য

মিলন কৃষ্ণ দাস
সদস্য

ইঞ্জি. উত্তম কুমার দাস
সদস্য

সনৎ দত্ত
সদস্য

বাবুল চন্দ্র ঘোষ
সদস্য

মিহির মজুমদার
সদস্য

সুভাষ মজুমদার
সদস্য

যদু নাথ ঘোষ
সদস্য

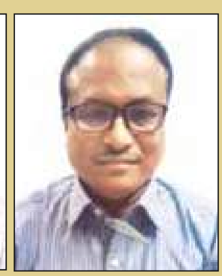

রতন কুমার মজুমদার
সদস্য

অমরেশ চন্দ্র দাস
সদস্য

সুদীপ কুমার ভদ্র
সদস্য

উজ্জ্বল কুমার বৈদ্য
সদস্য

জয়ন্তী রাণী ধর
সদস্য

মিতালী রায় চৌধুরী
সদস্য

মনিকা শর্মা
সদস্য

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের সাধারণ সদস্যবৃন্দ

কনিকা রানী পাল

গৌরী কর্মকার

স্বর্ণা সেন

মিনি রানী কীর্ত্তনীয়

মিনতি শর্মা

রীতা রায়

মাধবী প্রভা দাস

কনিকা শর্মা

টুম্পা দাস

দুলাল দেবনাথ

নারায়ণ চন্দ্র সাহা

চন্দন দেবনাথ

সঞ্জয় কুমার দাস

নির্মল কান্তি ওঝা

বিজন বিশ্বাস

রাম প্রাসাদ

জয়শ্রী শর্মা

রনজিৎ কুমার পাল

সমীর চন্দ্র দত্ত

আলোকা রাণী সরকার

চঞ্চল চৌধুরী

বিমল কৃষ্ণ দেব

স্বপন দাস

চঞ্চলা সরকার

পরিমল চন্দ্র পাল

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের সাধারণ সদস্যবৃন্দ

রনজিৎ কুমার সরকার

উষা রাণী দত্ত

গোবিন্দ হালদার

বিপুল কান্তি রায়

রতন বিশ্বাস

প্রদীপ কুমার বাড়ৈ

প্রদীপ কুমার সেন

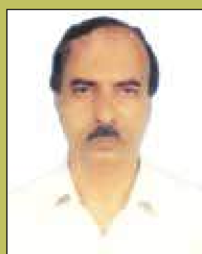
দেবেশ চন্দ্র সরকার

সঞ্জীব মৈত্র

সাগর মজুমদার

তনুশ্রী রাণী পাল

সুপ্রীয়া রাণী সাহা

রতন কুমার মিত্র

ছোটন কুমার দে

সুমন ঘোষ

মৌসুমী রায়

সুমন দে

ভবেশ কুমার শর্মা

নির্মল চন্দ্র নাথ

সঞ্জিত কুমার দেবনাথ

শংকর কর্মকার

প্রণব কুমার রায়

তপন মিত্র

রীতা অধিকারী

বিমল হালদার

ইঞ্জি. সুব্রত দেবনাথ

শিবু কুমার দাস

অসীম কুমার দে

অনন্যা রায় তমা

সুজিত দেবনাথ

তেজগাঁও সনাতন সমাজ উন্নয়ন পরিষদের সাধারণ সদস্যবৃন্দ

রক্তিম সরকার

রঞ্জিত কুমার নাথ

বিনয় কৃষ্ণ বিশ্বাস

রিপন সাহা

দীপক কুমার দাস

প্রদীপ কুমার পাল

গণেশ চন্দ্র বিশ্বাস

নীতিশ কুমার দাশ

তাপসী ঘোষ

বিউটি রাণী ঘোষ

পরিমল কুমার বিশ্বাস

রাজীব দাশ

শ্যামল কুমার দাস

দেবব্রত চক্রবর্তী

রত্না মোদক

লিপি কর্মকার

সংগীতা রায়

রিতা দেবনাথ

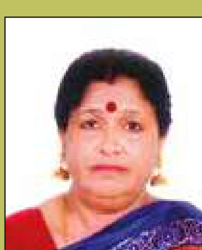
আরতী বসাক

শ্রীমতি পলি বসাক

লিটন কান্তি সুশীল

প্রদীপ কুমার পাল

রূপেন দেবনাথ (লিটন)

সুবর্ণা দাস

নিমাই চন্দ্র দাস

তেজগাঁও সনাতন ছাত্র ও যুব উন্নয়ন পরিষদের কার্যনির্বাহী কমিটি

কমল কান্তি রায়
সভাপতি

সুজিত ঘোষ
সহ সভাপতি

বিক্রম চন্দ্র দাস
সহ সভাপতি

রতন কুমার সরকার
সহ সভাপতি

শুভ্রদেব মিত্র
সহ সভাপতি

অনিন্দ রায়
সহ সভাপতি

অশ্রু রায়
সহ সভাপতি

বিনয় শর্মা
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

পার্থ বাড়ৈ
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

সাগর ঘোষ
আইন বিষয়ক সম্পাদক

শাওন মিত্র
কোষাধ্যক্ষ

দেবব্রত রায় শুভ
সাংগঠনিক সম্পাদক

দীপ্ত রায়
সাংগঠনিক সম্পাদক

রাহুল চন্দ্র দাস
সাংগঠনিক সম্পাদক

মিহির মন্ডল
দপ্তর সম্পাদক

সমীর রায়
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক

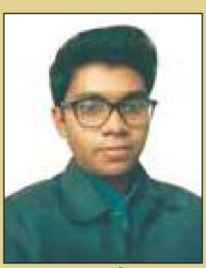
মেঘনাথ বিশ্বাস
সাংস্কৃতিক ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক

সজল দাস
শিশু কিশোর বিষয়ক সম্পাদক

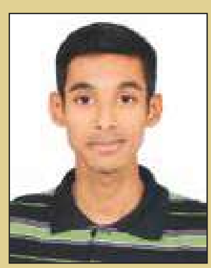
অঞ্জন শর্মা
পুজা ও ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক

আশিষ মল্লিক
সদস্য

সুরঞ্জিত গুপ্ত
সদস্য

শ্রাবণ মজুমদার
সদস্য

হৃদয় সরকার
সদস্য

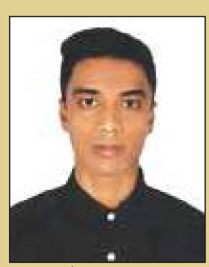
সৌরভ সুর
সদস্য

হৃদয় শর্মা
সদস্য

তেজগাঁও সনাতন ছাত্র ও যুব উন্নয়ন পরিষদের কার্যনির্বাহী কমিটি

সাগর মন্ডল
সদস্য

দুর্জয় চন্দ্র দাস
সদস্য

ভাস্কর পান্ডে
সদস্য

বিবেক রায়
সদস্য

মিলন দত্ত
সদস্য

তেজগাঁও সনাতন ছাত্র ও যুব উন্নয়ন পরিষদের সাধারণ সদস্য

অদ্রি দাশ কথা

প্রিয়াংকা শর্মা

প্রকৃতা বাইন পাপড়ি

তিথি ঋতুপর্ণা দত্ত

অর্পিতা পাল

মিলেনিয়াম রায় পুজা

অদিতি বিশ্বাস

শাশ্বতি বিশ্বাস

অমিত মজুমদার

শিশির মন্ডল

অন্তর চন্দ্র দাস

অসিত মন্ডল

উমেশ চন্দ্র ঘোষ

নিলয় চন্দ্র দাস

সমীরণ কুমার ঘোষ

তেজগাঁও সনাতন ছাত্র ও যুব উন্নয়ন পরিষদের সাধারণ সদস্য

মনোজ ঘোষ

রাহুল কান্তি সরকার

সৈকত চন্দ্র দাস

অভিজিত রায়

ঝন্টু বাগচী

নরোত্তম মল্লিক

অনুপম পাত্র

নয়ন চন্দ্র দাস

নীহার রঞ্জন বাড়ৈ

রানা চন্দ্র দাস

সজল কুমার বিশ্বাস

শুভ চন্দ্র দাস

অপু দাস

দীপ্ত ঘোষ

দীপঙ্কর হালদার

প্রীতম কৃষ্ণ ঘোষ

অনুপম মন্ডল

পংকজ রায়

প্রসেনজিৎ বর্মন

বিধান বাড়ৈ

অজয়

সবুজ বাড়ৈ

সুবীর বাড়ৈ

নান্টু চন্দ্র দাস

সুদাম চন্দ্র দাস

অনুপ হালদার

স্বপন চন্দ্র দাস

তেজগাঁও সনাতন ছাত্র ও যুব উন্নয়ন পরিষদের সাধারণ সদস্য

প্রণব বাড়ৈ

অনিক চন্দ্র দাস

প্রীতম বিশ্বাস (দ্বীপ)

পাপিয়া বাইন

দীনবন্ধু বিশ্বাস

সুকৃতি কুমার রায়

জনি চন্দ্র দাস

সাগর কুমার দে

জয়ন্ত মন্ডল

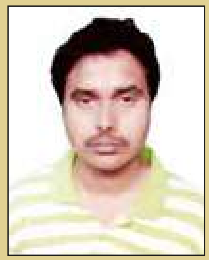
উজ্জ্বল চন্দ্র দাস

মনোজ ঘোষ

উমেশ ঘোষ

রাজীব অধিকারী

প্রমা বালা

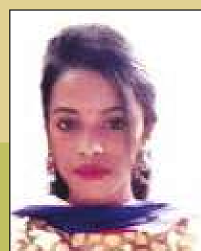
প্রিয়াংকা ঘোষ

জয়িতা মিত্র

অনামিকা রাণী ধর

প্রথমা শর্মা

অংকিতা ধর

অনুপম সরকার

প্রদীপ্ত কুমার দেব

সজল চন্দ্র দাস

সখ্য স্বরূপ সাহা

রত্না বর্মন

বলাই চন্দ্র বসাক

জ্যোতিশ কুমার রায়

মিঠুন চক্রবর্তী

সঞ্জিত সূত্রধর

দীপন হাওলাদার

মনোজ মণ্ডল

দি মেট্রোপলিটন হিন্দু কর্মজীবি সমবায় সমিতি লিঃ এর কার্যকরী কমিটি

১০, খেলাঘর ক্লাব মার্কেট, তেজকুনিপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

শচীন্দ্র চন্দ্র বর্মণ
সভাপতি

সুখলাল নন্দী
সহ-সভাপতি

সান্তনু দাস
সাধারণ সম্পাদক

যদুনাথ ঘোষ
যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক

লিটন চন্দ্র দাস
কোষাধ্যক্ষ

মৃত্যুঞ্জয় রায় তপন
সদস্য

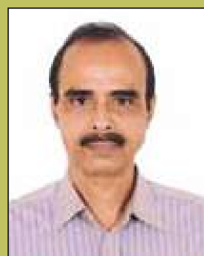

নেপাল দে
সদস্য

নমিতা চক্রবর্তী
সদস্য

গৌর চন্দ্র ঘোষ
সদস্য

বিপুল চন্দ্র বার
সদস্য

এ্যাড: সাগর কুমার ঘোষ
সদস্য

দি মেট্রোপলিটন হিন্দু কর্মজীবি সমবায় সমিতি লিঃ-এর সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যের নাম	ক্রমিক নং	সদস্যের নাম
১.	শ্রী শচীন্দ্র চন্দ্র বর্মন	৩৫.	শ্রী প্রদীপ সেন
২.	শ্রী অরুণ চন্দ্র ভৌমিক	৩৬.	শ্রী গোপাল চন্দ্র দত্ত
৩.	শ্রী সুখলাল নন্দী	৩৭.	শ্রী উজ্জ্বল কুমার বৈদ্য
৪.	শ্রী প্রিয়লাল শর্মা	৩৮.	শ্রী দুলাল দেবনাথ
৫.	শ্রী হিরালাল বাইন	৩৯.	শ্রী অপূর্ব কুমার রাহুত
৬.	শ্রী মৃত্যুঞ্জয় রায় (তপন)	৪০.	শ্রী রনজিৎ কুমার সরকার
৭.	শ্রী শিশির রঞ্জন দাস	৪১.	শ্রীমতি শুক্লা বিষ্ণু
৮.	শ্রী প্রমোদ রঞ্জন রায়	৪২.	শ্রী গৌর চন্দ্র ঘোষ
৯.	শ্রী নেপাল দে	৪৩.	শ্রী চঞ্চল চৌধুরী
১০.	শ্রী সঞ্জীব মৈত্র	৪৪.	শ্রীমতি উষা রানী দত্ত
১১.	শ্রী রনধীর বিশ্বাস	৪৫.	শ্রীমতি নমিতা রায়
১২.	শ্রী প্রবীর কুমার সরকার	৪৬.	শ্রী বিমল হালদার
১৩.	শ্রী প্রদীপ কুমার সাহা	৪৭.	শ্রী গোবিন্দ হালদার
১৪.	শ্রী শ্যামল মিত্র	৪৮.	শ্রী প্রদীপ কুমার বাড়ৈ
১৫.	শ্রী ভবেশ গোস্বামী	৪৯.	শ্রী নারায়ণ চন্দ্র সাহা
১৬.	শ্রী কেশব সেন	৫০.	শ্রী সনৎ দত্ত
১৭.	শ্রী শ্যামল কুমার দাস	৫১.	শ্রী লিটন চন্দ্র দাস
১৮.	শ্রী অশোক কুমার ধর	৫২.	শ্রীমতি বীণা রানী দাস
১৯.	শ্রী বিশ্বজিৎ চন্দ্র শীল	৫৩.	শ্রী বিনয় কৃষ্ণ বিশ্বাস
২০.	শ্রী সংগীত কুমার ঘোষ	৫৪.	শ্রীমতি চঞ্চলা সরকার
২১.	শ্রীমতি কবিতা রানী পাল	৫৫.	শ্রীমতি শাশ্বতী বিশ্বাস
২২.	শ্রীমতি নমিতা চক্রবর্তী	৫৬.	শ্রীমতি অদিতি বিশ্বাস
২৩.	শ্রী বিশ্বজিৎ কুমার পাল	৫৭.	ডাঃ চন্দ্রশেখর বোস
২৪.	শ্রী সান্তনু দাস বাপ্পী	৫৮.	শ্রী বাবুল চন্দ্র ঘোষ
২৫.	শ্রী মানিক লাল দাস	৫৯.	শ্রী নারায়ণ চন্দ্র দে
২৬.	শ্রী বিমল কৃষ্ণ দেব	৬০.	শ্রী রবীন্দ্রনাথ বর্মন
২৭.	শ্রী চন্দন দেবনাথ	৬১.	শ্রী রামপ্রসাদ সরকার
২৮.	শ্রী দীপক লাল কর্মকার	৬২.	শ্রী শিবু কুমার দাস
২৯.	শ্রী মিলন কৃষ্ণ দাস	৬৩.	শ্রী প্রকাশ কুমার দাস
৩০.	শ্রী বিজন কুমার বিশ্বাস	৬৪.	শ্রী নরেশ চন্দ্র দত্ত
৩১.	শ্রী রতন কুমার বিশ্বাস	৬৫.	শ্রী বিশ্বজিৎ কর্মকার
৩২.	শ্রী স্বপন দাস	৬৬.	শ্রী দেবেশ চন্দ্র সরকার
৩৩.	শ্রী গোপাল চন্দ্র দেবনাথ	৬৭.	শ্রীমতি অলকা রানী সরকার
৩৪.	শ্রীমতি বকুল রানী দেবী	৬৮.	এ্যাড. বিনয় কৃষ্ণ পোদ্দার

দি মেট্রোপলিটন হিন্দু কর্মজীবি সমবায় সমিতি লিঃ-এর সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যের নাম	ক্রমিক নং	সদস্যের নাম
৬৯.	শ্রী রতন কুমার রায়	১০৩.	শ্রীমতি অমৃতা রায় জুঁই
৭০.	শ্রী সুভাষ মজুমদার	১০৪.	শ্রীমতি অর্থী রায় জবা
৭১.	শ্রী সমীর চন্দ্র দত্ত	১০৫.	শ্রী রাহুল কান্তি সরকার
৭২.	শ্রী পরিমল চন্দ্র পাল	১০৬.	শ্রীমতি মনিকা রানী দাস
৭৩.	শ্রী অমরেশ চন্দ্র দাস	১০৭.	শ্রী সৈকত মজুমদার (সাগর)
৭৪.	শ্রীমতি মিতালি রায় চৌধুরী	১০৮.	শ্রীমতি সবিতা রানী মন্ডল
৭৫.	শ্রী পরিমল কুমার বিশ্বাস	১০৯.	শ্রী স্বপন মজুমদার
৭৬.	শ্রী ঝন্টু চন্দ্র সাহা	১১০.	শ্রীমতি বন্দনা রানী মজুমদার
৭৭.	শ্রীমতি জয়শ্রী শর্মা	১১১.	ড. নিখিল চন্দ্র সরকার
৭৮.	শ্রী অসীম কুমার দাশ	১১২.	শ্রী খোকন মালাকার
৭৯.	শ্রী সুবিমল সিকদার	১১৩.	শ্রী প্রদীপ কুমার পাল
৮০.	শ্রী উত্তম কুমার দাস	১১৪.	শ্রী অশ্রু রায়
৮১.	শ্রীমতি টুম্পা দাস	১১৫.	শ্রী পরেশ দেবনাথ
৮২.	শ্রীমতি মিনতি শর্মা	১১৬.	শ্রী আশিষ চন্দ্র শর্মা
৮৩.	শ্রী রনজিৎ কুমার পাল	১১৭.	শ্রী শিশির চন্দ্র শর্মা
৮৪.	শ্রী চন্দন কুমার মজুমদার	১১৮.	শ্রী প্রবীর চন্দ্র শর্মা
৮৫.	শ্রীমতি প্রিয়াংকা সরকার	১১৯.	এ্যাড: সাগর কুমার ঘোষ
৮৬.	শ্রীমতি রিতা অধিকারী	১২০.	শ্রী অরুণ কুমার দে
৮৭.	শ্রী অমর চন্দ্র দত্ত	১২১.	শ্রী অসীম কুমার দে
৮৮.	শ্রী জীবন কৃষ্ণ মোদক	১২২.	শ্রী সুদীপ কুমার ভদ্র
৮৯.	ডা: কল্যাণী রানী দত্ত	১২৩.	শ্রী নান্টু চন্দ্র দাস
৯০.	শ্রী স্বপন কুমার কুন্ডু	১২৪.	শ্রী সুমন চন্দ্র দাস
৯১.	শ্রী চন্দন কুমার সাহা	১২৫.	শ্রী সজল চন্দ্র দাস
৯২.	শ্রী মিনি রানী কীর্ত্তনীয়া	১২৬.	শ্রী রতন সরকার
৯৩.	শ্রীমতি মনিকা শর্মা	১২৭.	শ্রী বাসুদেব তালুকদার
৯৪.	শ্রী খোকন শর্মা	১২৮.	শ্রীমতি বিউটি রানী দত্ত
৯৫.	শ্রীমতি কণিকা শর্মা	১২৯.	শ্রীমতি সবিতা রানী দাস
৯৬.	শ্রী বিষ্ণু কুমার রায়	১৩০.	শ্রী সুসেন শর্মা
৯৭.	শ্রী রণজিত কর্মকার	১৩১.	শ্রীমতি পলি রানী শর্মা
৯৮.	শ্রী সঞ্জয় বিশ্বাস (ডন)	১৩২.	শ্রী গণেশ চন্দ্র বিশ্বাস
৯৯.	শ্রী সবুজ দাস	১৩৩.	শ্রী অনিল কৃষ্ণ বিশ্বাস
১০০.	শ্রী বিক্রম চন্দ্র দাস	১৩৪.	শ্রী শচীন্দ্র কুমার সরকার
১০১.	শ্রী সুকৃতি কুমার রায়	১৩৫.	শ্রী সুব্রত কুমার বিশ্বাস
১০২.	শ্রীমতি নিপা গাইন	১৩৬.	শ্রী প্রবীর কুমার বিশ্বাস

দি মেট্রোপলিটন হিন্দু কর্মজীবি সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যের নাম	ক্রমিক নং	সদস্যের নাম
১৩৭.	শ্রীমতি দেবশ্রী দাস	১৭১.	শ্রীমতি পলি বসাক
১৩৮.	শ্রীমতি ঝর্ণা রানী পাল	১৭২.	শ্রীমতি প্রতিমা বসাক
১৩৯.	শ্রী মিহির মজুমদার	১৭৩.	শ্রী বিপুল চন্দ্র বার
১৪০.	শ্রী দীপংকর পাল	১৭৪.	শ্রীমতি মনিকা রানী বার
১৪১.	শ্রী হৃদয় চন্দ্র দাস	১৭৫.	শ্রী এমএম দাস রঞ্জন
১৪২.	শ্রী দীনেশ চন্দ্র দাস	১৭৬.	শ্রীমতি রীতা দেবী
১৪৩.	শ্রী উত্তম চন্দ্র দাস	১৭৭.	শ্রী রিপন সাহা
১৪৪.	শ্রী মনোজ মন্ডল	১৭৮.	শ্রী নৃপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
১৪৫.	শ্রীমতি নীলা রানী রায়	১৭৯.	শ্রীমতি জয়ন্তী রাণী ধর
১৪৬.	শ্রীমতি অদিতি দত্ত	১৮০.	শ্রী রাতুল দাস
১৪৭.	শ্রীমতি আরতি দাশ পোদ্দার	১৮১.	শ্রী রাহুল দাস
১৪৮.	শ্রীমতি অনন্যা রায়	১৮২.	শ্রী জয়ন্ত ঘরামী
১৪৯.	শ্রী রত্নেশ্বর দাস	১৮৩.	শ্রীমতি মাধবী সরকার
১৫০.	শ্রীমতি তাপসী দাস	১৮৪.	শ্রীমতি বিউটি রানী দাস
১৫১.	শ্রী সঞ্জিব কুমার দাস	১৮৫.	শ্রীমতি প্রণতি চক্রবর্তী
১৫২.	শ্রীমতি ইলা রাণী সরকার	১৮৬.	শ্রীমতি মমতা সরকার
১৫৩.	শ্রী বিশ্বনাথ দত্ত	১৮৭.	শ্রী পরেশ নাথ বর্মন
১৫৪.	শ্রী বিভোর চন্দ্র দাস	১৮৮.	শ্রী জিতেন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস
১৫৫.	শ্রী নির্মল চন্দ্র হাওলাদার	১৮৯.	শ্রী মিহির মন্ডল
১৫৬.	শ্রী অজয় মিত্র	১৯০.	শ্রী অনিমেষ সাহা
১৫৭.	শ্রী শেখর দাস	১৯১.	শ্রী ক্ষীতিশ চন্দ্র রায়
১৫৮.	শ্রীমতি রীতা রাণী বর্মন	১৯২.	শ্রীমতি কনিকা রায়
১৫৯.	শ্রী প্রসেনজিৎ বর্মন	১৯৩.	শ্রী অর্জ্জুন কুমার রায়
১৬০.	শ্রী বলাই চন্দ্র উড়াও	১৯৪.	শ্রী প্রীতম কৃষ্ণ ঘোষ
১৬১.	শ্রী ছোটন কুমার দে	১৯৫.	শ্রী রঘুনাথ বাড়ৈ
১৬২.	শ্রী নিহার রঞ্জন মজুমদার	১৯৬.	শ্রী আনন্দ কুমার মজুমদার
১৬৩.	শ্রীমতি শ্যামলী রানী দাস	১৯৭.	শ্রীমতি মৌসুমী মজুমদার
১৬৪.	শ্রী সমীর চন্দ্র সেন	১৯৮.	শ্রী রিংকু করিবাজ রাহুল
১৬৫.	শ্রীমতি শিপ্রা রানী পাল	১৯৯.	শ্রীমতি সুপ্রিয়া রাণী সাহা
১৬৬.	শ্রী উত্তম কুমার দত্ত	২০০.	শ্রী নিমাই চন্দ্র দাস
১৬৭.	শ্রীমতি প্রিয়াংকা দত্ত	২০১.	শ্রীমতি লিপি রাণী রায়
১৬৮.	শ্রী বিমল চৌধুরী	২০২.	শ্রী মাঞ্জীর কুমার দাস
১৬৯.	শ্রী চিরঞ্জীৎ গোস্বামী	২০৩.	শ্রী মৃনাল কান্তি বর্মন
১৭০.	শ্রীমতি আরতি বসাক	২০৪.	শ্রী নির্মল চন্দ্র ঘোষ

দি মেট্রোপলিটন হিন্দু কর্মজীবি সমবায় সমিতি লিঃ-এর সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যের নাম	ক্রমিক নং	সদস্যের নাম
২০৫.	শ্রী পরিতোষ বর্মন	২২৪.	তনিমা দাস
২০৬.	শ্রী কমল কান্তি রায়	২২৫.	জীবন কৃষ্ণ দাস
২০৭.	শ্রী চিত্তরঞ্জন দাস	২২৬.	শ্রী হারাধন বিশ্বাস
২০৮.	শ্রীমতি সীমা রাণী দেবনাথ	২২৭.	অপূর্ব বিশ্বাস
২০৯.	শ্রী মানব কুমার দাস	২২৮.	অঞ্জলী রাণী মল্লিক
২১০.	শ্রীমতি সুনিতী হালদার	২২৯.	তাপস চন্দ্র বিশ্বাস
২১১.	শ্রী জীবিতেশ্বর রায় জীবন	২৩০.	সুধীর কুমার দে
২১২.	শ্রী জ্যোতিশ চন্দ্র	২৩১.	সুব্রত দাস
২১৩.	শ্রী জুয়েল ধর	২৩২.	মিঠুন চক্রবর্তী
২১৪.	শ্রী রতন কুমার সাহা	২৩৩.	শতদল চৌধুরী
২১৫.	শ্রী প্রদীপ কুমার সাহা	২৩৪.	বিথী বিশ্বাস
২১৬.	শ্রী গোপীনাথ নাগ	২৩৫.	প্রদীপ শিখা দেব
২১৭.	শ্রীমতি লিলি বিশ্বাস	২৩৬.	আশোক কুমার সরকার
২১৮.	শ্রীমতি দীপ্তি সাহা	২৩৭.	স্বপন কুমার মন্ডল
২১৯.	শ্রী দোলন কান্তি দত্ত	২৩৮.	সুনীল কুমার বসাক
২২০.	শ্রীমতি মিনা ভৌমিক	২৩৯.	স্বপন কুমার বসাক
২২১.	সুভাশ চন্দ্র দাস	২৪০.	দ্বিজেন্দ্র নাথ সাহা
২২২.	যদুনাথ ঘোষ	২৪১.	অপু দাস
২২৩.	এ্যাড: সুমিত কুমার মন্ডল	২৪২.	নুপুর সাহা

Heartiest wishes in the event of Durga Puja

With the best compliments from

mainstream

SHIPPING & LOGISTICS LTD.

International Freight Forwarder & Logistics Service provider

www.mainstream-bd.com

Corporate Office: House # 288 (3rd Floor), Road # 19/C, New DOHS, Mohakhali
Dhaka-1206, Bangladesh, Tel: +880 2 9859526, 8711714, Fax: +880 2 8711715

Branch Office: 11, Sk. Mujib Road, Chaity Plaza (4th Fl.), Agrabad C/A, Chittagong, Bangladesh
Email: keshab@mainstream-bd.com

Registered Office: 49, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh

“অপরাজিতা”-র বিগত সংখ্যার প্রচ্ছদসমূহ

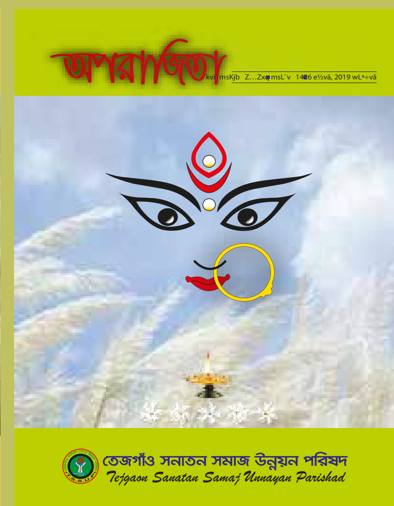

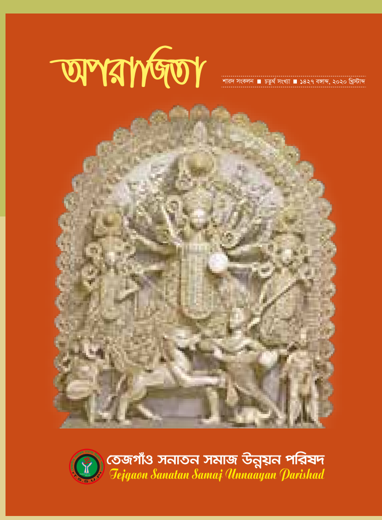

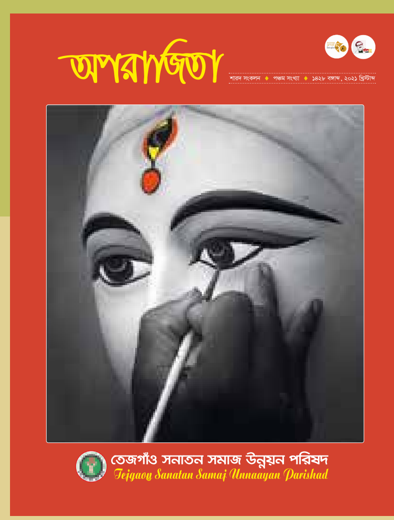

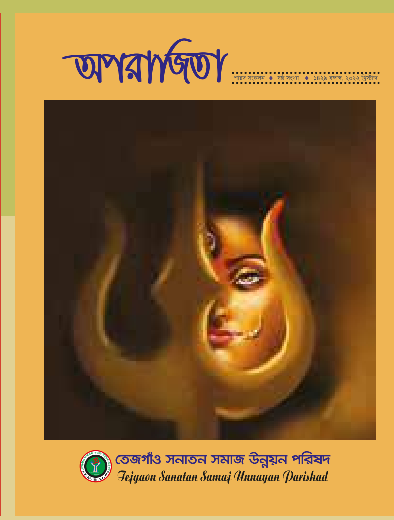

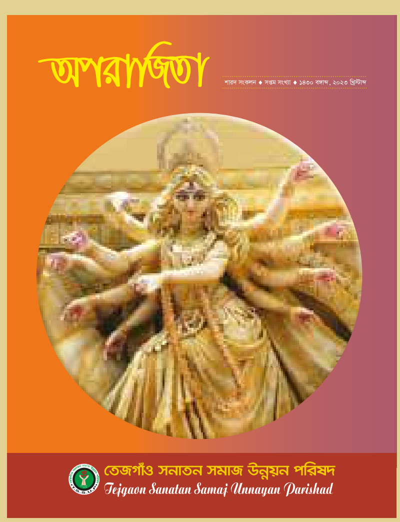

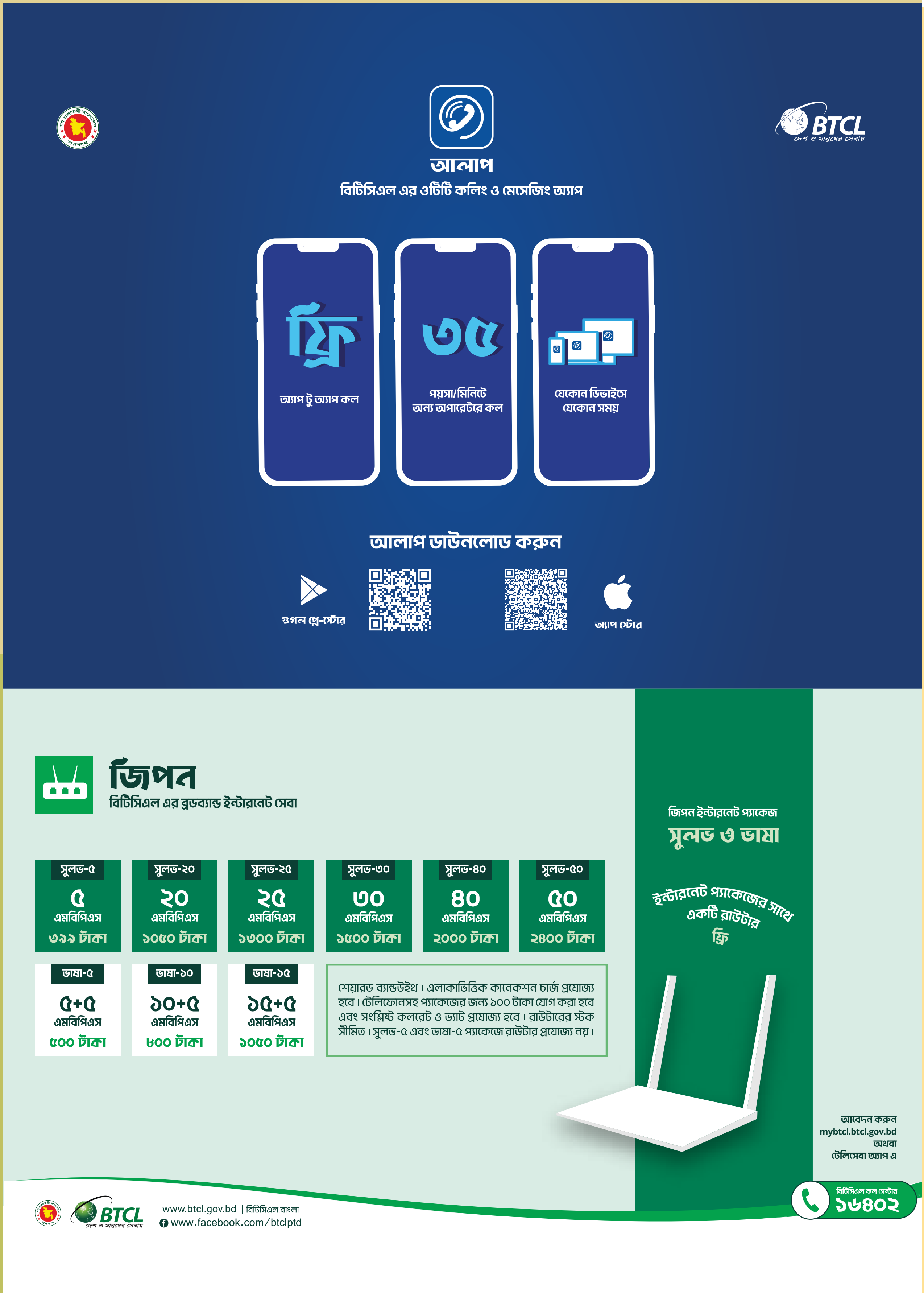

BTCL
দেশ ও মানুষের সেবায়
আলাপ
বিটিসিএল এর ওটিটি কলিং ও মেসেজিং অ্যাপ
ফ্রি
অ্যাপ টু অ্যাপ কল
৩৫
পয়সা/মিনিটে
অন্য অপারেটরে কল
যেকোন ডিভাইসে
যেকোন সময়
আলাপ ডাউনলোড করুন
গুগল প্লে-স্টোর
অ্যাপ স্টোর
জিপন
বিটিসিএল এর ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা
সুলভ-৫
৫
এমবিপিএস
৩৯৯ টাকা
সুলভ-২০
২০
এমবিপিএস
১০৫০ টাকা
সুলভ-২৫
২৫
এমবিপিএস
১৩০০ টাকা
সুলভ-৩০
৩০
এমবিপিএস
১৫০০ টাকা
সুলভ-৪০
৪০
এমবিপিএস
২০০০ টাকা
সুলভ-৫০
৫০
এমবিপিএস
২৪০০ টাকা
ভাষা-৫
৫+৫
এমবিপিএস
৫০০ টাকা
ভাষা-১০
১০+৫
এমবিপিএস
৮০০ টাকা
ভাষা-১৫
১৫+৫
এমবিপিএস
১০৫০ টাকা
শেয়ারড ব্যান্ডউইথ। এলাকাভিত্তিক কানেকশন চার্জ প্রযোজ্য হবে। টেলিফোনসহ প্যাকেজের জন্য ১০০ টাকা যোগ করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট কলরেট ও ভ্যাট প্রযোজ্য হবে। রাউটারের স্টক সীমিত। সুলভ-৫ এবং ভাষা-৫ প্যাকেজে রাউটার প্রযোজ্য নয়।
জিপন ইন্টারনেট প্যাকেজ
সুলভ ও ভাষা
ইন্টারনেট প্যাকেজের সাথে
একটি রাউটার
ফ্রি
আবেদন করুন
mybtcl.btcl.gov.bd
অথবা
টেলিসেবা অ্যাপ এ
বিটিসিএল কল সেন্টার
১৬৪০২
BTCL
দেশ ও মানুষের সেবায়
www.btcl.gov.bd | বিটিসিএল.বাংলা
www.facebook.com/btclptd

আমরা সকলে জানি অটোমোবাইল সেক্টর সারা দুনিয়াতে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর। এই গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরকে গুরুত্ব দিয়ে স্বদেশ মটরস এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ ২০০৫ সাল থেকে আপনাদের গাড়ীর সেবা প্রদান করে আসছে। ইতিমধ্যে এই অটোমোবাইল সার্ভিসকে কাস্টমারদের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বারিধারা ১০০ ফিট রোড, মাদানি এভিনিউ, মতিঝিল এবং ঢাকার বাহিরে চট্টগ্রাম ও খুলনা কার্যক্রম শুরু করে সেবা প্রদান করছে। ভবিষ্যতে দেশের প্রতিটি বিভাগীয় শহরে ও গুরুত্বপূর্ণ জেলা গুলোতে শাখা খোলার সিদ্ধান্ত আছে। ইতিমধ্যে একটি অটোমোবাইল সার্ভিস টিম রয়েছে যা আপনার কলের সাথে সাথে পৌঁছে গাড়ীর সার্ভিস প্রদান করে থাকি, শুধু ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোন থেকে নয় সরকারের সকল আইনকে প্রাধান্য দিয়ে ভবিষ্যতে ছোট বড় সব গাড়ির সব ধরনের সেবার ব্রত নিয়ে স্বদেশের পথ চলা সর্বত্র।

আমাদের স্লোগান - **আমরা ২৪ ঘন্টা আপনার গাড়ীর সেবায় নিয়োজিত।**

বিশেষ করে আমরাঃ মার্সেডিজ বেঞ্জ, বিএমডব্লিউ, অডি, জাগুয়ার, ল্যান্ড রোভার, রেঞ্জ রোভার, প্রাডো, ল্যান্ড ক্রুজার,হামার, পাজেরো,ক্যাডিলাক,ক্রাইসলার, ফোর্ড, হুন্ডাই, টয়োটা ইত্যাদি গাড়ি চ্যালেঞ্জের সাথে মোকাবেলা করে বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করেছে। আমাদের সফল ব্যবস্থাপনা, ফরেন অনলাইন সার্পোট, অত্যাধুনিক টেকনোলজি, দক্ষ প্রকৌশলী, এবং অভিজ্ঞ মেকানিক দ্বারা অতি যত্ন সহকারে কাজ করে থাকি। আমাদের টিম সর্বদাই প্রস্তুত থাকে বাংলাদেশের যে কোন প্রান্ত থেকে আপনার কলের অপেক্ষায় ....।

আমাদের সেবাসমূহ

- কম্পিউটার ডায়াগনোসিস।
- ইঞ্জিন ওভারহোলিং।
- সাসপেনশন সিষ্টেম ওভারহোলিং।
- অটো এন্ড মেনুয়াল ট্রান্সমিশন সিষ্টেম।
- ইলেকট্রিক সিষ্টেম ওয়ার্কস।
- এ/সি সিষ্টেম ওয়ার্কস।
- ট্রেনিং ইনস্টিটিউট।
- জেনারেল সার্ভিসিং।
- সিএনজি সার্ভিসিং।
- ফুয়েল সিষ্টেম সার্ভিসিং।
- এটিএফ/ সিভিটিএফ চেইঞ্জ বাই মেশিন।
- হুইল এ্যালাইনমেন্ট এন্ড ব্যালেন্সিং।
- ডোর টু ডোর মোবাইল/ভ্রাম্যমান সার্ভিস।
- ডেইন্টিং এন্ড পেইন্টিং ওয়ার্কস।
- কার ওয়াশ এন্ড পলিশ।
- ডিজিটাল সিসি ক্যামেরা দ্বারা ১০০% নিরাপত্তা।

SWADESH MOTORS & ENGINEERING WORKSHOP
ASHIS AUTO SOLUTION

Dhaka Baridhara Office:
Road-14, Plot-09, Block-J, Baridhara,
Diplomatic Zone, Dhaka 1212.
Mob: 01818-214751, 01736-210791

Ashis Auto Solution Head Office:
100 Feet Road, Madani Avenue,
Baganban ,Beraid, Dhaka-1212
Mob: 01712-287659, 01678-094899

Dhaka Mothijheel Office:
151,Motijheel,C/A(Behind Wapda
Pretrol Pump, Dhaka-1000,
Mob: 01818-214751, 01923-325285

Khulna Brance Office:
157, M A Bari Sarak,Gullamari Road
Sonadanga,Khulna
Mob: 01715-648703, 01818-214751

Bank Asia
24TH ICAB NATIONAL AWARD
CATEGORY
GOLD
SETTING A NEW BENCHMARK
BANK ASIA PLC. DOMINATES
ICAB NATIONAL AWARDS
WITH 4 PRESTIGIOUS WINS
OVERALL WINNER FOR BANKING EXCELLENCE
JOINT GOLD FOR PRIVATE SECTOR BANKS
GOLD FOR CORPORATE GOVERNANCE
JOINT GOLD FOR INTEGRATED REPORTING

Government of The People's Republic of Bangladesh
Ministry of Agriculture
Department of Agricultural Extension

Program on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship and Resilience in Bangladesh (PARTNER)

The PARTNER program will be accomplishing all over the Bangladesh in 8 division, 14 regions, 64 districts and 495 upazilas for transforming agriculture from subsistence to commercial and enhancing food and nutrition security

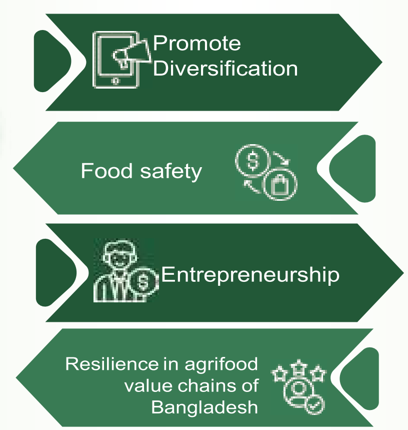

To promote

- Diversification
- Food & Safety
- Entrepreneurship
- Resilience in agrifood value chains of Bangladesh
- Mechanization
- GAP certification
- Export volume
- Accreditation
- Krishak Smart Card
- Digital Extension
- Technology Generation
- Market Linked Activities

WORLD BANK GROUP

Room No. 616, 1st Building, DAE, Khamarbari, Dhaka-1215, pc.partner23@gmail.com

IFAD INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT

IDLC
financing happiness
কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে
দরকার হয় একটু নির্ভরতার!
আপনিও আস্থা রাখুন আইডিএলসি'র চার দশকের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতায়
আপনার দুরন্ত স্বপ্নগুলোকে ডানা মেলার শক্তি দিতে চাই দূরদর্শিতা, দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা, সুশাসন, স্বচ্ছতা ও আন্তরিক সেবা নিয়ে দেশের সর্ববৃহৎ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইডিএলসি লাখ লাখ মানুষের পাশে আছে আস্থা ও ভরসা হয়ে।
চার দশক ধরে
আপনার ফাইন্যান্সিয়াল
পার্টনার
16409
www.idlc.com

TVS
টিভিএস অটো বাংলাদেশ এর
পক্ষ থেকে
শারদীয় শুভেচ্ছা
TVS RAIDER
THE WICKED RIDE
TVS NTORQ 125
PLAY SMART
TVS Auto Bangladesh
www.tvsabl.com
TVS Bangladesh
01919194222, 01919189111
know more
Scan to

Aarong Dairy
Milk for Good
a BRAC social enterprise
/AarongDairyBRAC
09613 456 456

SQ GROUP
Total Power Solution
বাড়ি ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের
নিরাপত্তায় শতভাগ নিশ্চয়তা
7 YEARS WARRANTY
SQ LIGHTS
Speaks Safety & Quality
SQ CABLES
Speaks Safety & Quality
SQ FAN
Speaks Safety & Quality
SKIN
COATED
CABLES
Certification
KEMA Labs
BSTI
BUET
ANAB
UKAS
www.sq-bd.com | info@sq-bd.com | Hotline: +8801755-661166 | / sqgroupbd